এইবার আশা পূর্ণ করুন।

[illegible] আপনাদের গ্রাহকের আগ্রহে আবার এ সুলভ, বেশী দিন থাকিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

[illegible] ২৮ [illegible] প্রকাশিত হইল। বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিতে হয় না, নূতন অক্ষরে ভাল কাগজে সুন্দর করিয়া ছাপা হইল।

একত্র তিন ভাগের মূল্য

কেবল পাঁচ শত নূতন গ্রাহকের জন্য

৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল, ডাঃ মাঃ ১৲ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ; ৪০৲ মূল্যের ২৬ খানি গ্রন্থ।

প্রথম ভাগের পুস্তক—

	পুস্তকের নাম	মূল্য		পুস্তকের নাম	মূল্য
১।	দুর্গেশনন্দিনী	২৲	৬।	সীতারাম	২৲
২।	মৃণালিনী	১৸০	৭।	যুগলাঙ্গুরীয়	।০
৩।	কৃষ্ণকান্তের উইল	১৷০	৮।	রাধারাণী	।৶০
৪।	রজনী	১৶০	৯।	কমলাকান্ত	১৷০
৫।	দেবী চৌধুরাণী	২৲	১০।	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)	১৷০
১১।	ধর্ম্মতত্ত্ব	২৲			

মোট ১১ খানি পুস্তকে প্রথম ভাগ, মোট মূল্য ১৬৲ টাকা।

পৃথক্ লইলে ৩৲ তিন টাকায় পাইবেন। ডাঃ মাঃ ৷০ আনা। বাঁধাই ৩৷০ টাকা।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

বিধাতা ত্রিভুবন নির্মাণ করিলেন। বিধাতার পুত্র দক্ষ। দক্ষের কন্যা হইয়া চণ্ডী সতীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া সতী গিরিরাজমহিষী মেনকার কন্যা হইলেন। গৌরীর সহিত হরের বিবাহ, পার্বতীর পুতুল-খেলায় গণেশের উৎপত্তি, এবং পরে তাঁহার গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম হইল। এত দিন হর হিমালয়ে ঘরজামাই ছিলেন। একদিন মেনকা কন্যাকে বলিলেন, দেখ,

প্রভাতে খাইতে চাহে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়া সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাসবাস।
অন্ন বস্ত্র কত্তেক যোগাব বারমাস॥
নিরন্তর আমি দুঃখ সহিব উৎপাত।
রাজ্যে বাজ্যে দিতে মোর কপাল হৈল খাক॥
দুধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি।
পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী॥

মা যেমন, ঝিও তেমন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন কেন,

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।
তথি কলে মসুর কাপাস মায় ধান॥
রাজ্যো বাড়ো দেও বলে কত দেও খোঁটা।
এব ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাঁটা॥

ইহার পর হিমালয়ে আর থাকা চলে না। হরপার্বতী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিন্তু সম্বল কিছুমাত্র নাই। হর ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, গৌরী রাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে একটি দিন গেল। পরদিন হর বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিন্তু বিশ্রামের সময়েও ক্ষুধা পাইল। হর গৌরীকে ঘাটে স্নান করিয়া রন্ধন চড়াইতে বলিলেন। নানাবিধ ব্যঞ্জনের আদেশ করিলেন। কিন্তু রন্ধনের কথা শুনিয়া গৌরীর চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন,

রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই।

কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অবশেষ যাহা ছিল রন্ধন করিনু॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥

তখন পশুপতি সক্রোধে বলিলেন, "আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।" পার্বতীও খেদ করিতে লাগিলেন,

কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর॥
উন্মত্ত ন্যাঙ্গটা হর চিতাধূলি গায়।
ছাড়িলে শিরের জটা অবনী লোটায়॥
একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছালবাসে॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥

গৌরী বাপের বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু পদ্মা গৌরীকে ভবিষ্য কথা শুনাইয়া সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তাঁহার অর্চনা প্রচার করিতে বলিলেন; ফলে গৌরীর অন্নবস্ত্রের অভাব আর থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমে চণ্ডিকা দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গরাজার দেশে, বিশ্বকর্ম্মাকে এক দেউল নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। এবং রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন, "করি বহু পরামর্শ, আইনু ভারতবর্ষ, লইব তোমার পূজা আগে।" সুতরাং রাজা হৈমবতীর পূজা করিলেন। পূজার পরে চণ্ডিকা ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে বিন্ধ্যগিরির পশুগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, এবং বনফুল আম জাম শেহাকুল কাল চিতাফল দিয়া পূজা করিল।

যখন ভবানী কলিঙ্গদেশে গেলেন, তখন মহেশের দিন চলা ভার হইল। তিনিও মর্ত্ত্যের পূজা-সংগ্রহে বাহির হইলেন। পরে হরপার্ব্বতী উভয়ে কৈলাসে আবার একত্র হইলেন। এবার উভয়ের মধ্যে যুক্তি হইল যে, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্তলোকে পাঠাইতে হইবে। "তবে যে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।" নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। শিশুপুত্র নীলাম্বরের উপর নন্দনকাননে ফুল তুলিয়া আনিবার

আদেশ হইল। এখন সন্ধ্যা নীলাম্বরের মাথার উপরে শকুনি ডাকিল, এবং সে জেঠির ডাকও শুনিতে পাইল। মস্তকের উপরে বাধা পড়িল, সে ফুল তুলিতে যাইতে চায় না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য বিষয়ে অনেক পুরাণ প্রমাণ শুনাইলেন।

নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত অসুর সনে,
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ।
সবে চারি দণ্ড যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে,
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ।
বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়,
এ নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে, উঠিতে না হবে গাছে,
আরাধনা করিব শঙ্করে।

অগত্যা নীলাম্বর 'পান' লইল', এবং হরপার্বতীর যুক্তিজালে পড়িয়া ব্যাধ কালকেতু রূপে মর্ত্ত্যে চণ্ডিকার পূজা প্রচার করিল। কালকেতুকে চণ্ডিকা অনেক ধন দিলেন। সে কলিঙ্গদেশের নিকটে গুজরাট নামে এক নগর নির্ম্মাণ করাইল, অনেক প্রজা বসাইল। বিপদের সময় চণ্ডিকা তাহার সহায় থাকিতেন; কেন না, চণ্ডিকা তাঁহার মন্দিরে পূজা পাইতেন। কলিঙ্গ-রাজও বেশ শিক্ষা পাইলেন। তিনিও চণ্ডিকার ভক্ত হইলেন। "গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা। আর যত ভুঞা রাজা করে তাঁর পূজা।"

কিন্তু এইরূপে কতকাল চলে? নীলাম্বরের শাপের কাল ফুরাইল। সে জায়া সঙ্গে পুষ্পক বিমানে চাপিয়া ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া গেল। কাজেই পার্ব্বতী আবার পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিলেন। শঙ্করও অবশ্য যোগ দিলেন। এবার রত্নমালা নামে ইন্দ্রের এক নর্ত্তকী অভিশপ্ত হইল। ইছানি নগরে লক্ষপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিক্ ছিল। তাহার স্ত্রীর গর্ভে খুল্লনা নামে রত্নমালা জন্মগ্রহণ করিল। উজানি নগরে ধনপতি নামে এক সাধু (সওদাগর) ছিল। লহনা তাহার প্রথম বনিতা ছিল। খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয় বনিতা হইল।

খুল্লনাকে চণ্ডী দেখা দিয়াছিলেন, এবং নানা কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে চণ্ডিকার ভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু খুল্লনার স্বামী ধনপতি 'মেয়ে দেব' দেখিতে পারিত না। এমন কি, যখন ধনপতি উজানি নগরের রাজার আজ্ঞায় সিংহলে সাত ডিঙ্গা ভরিয়া বাণিজ্য করিতে যায়, খুল্লনার

ভাষায় তাঁহার কি অতুলনীয় অধিকার ছিল! গর্ভবতী নারী কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অন্নকষ্টকাতর ব্যক্তির ভোজনলালসার সীমা কি,—ইহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই সন্তানপ্রসবের পর কি কি কার্য্য করিতে হয়, বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবশ্যক, তাহাও তিনি তেমনই জানিতেন। বন্য জন্তু পক্ষী সর্পের নাম চান, কবিকঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করুন; সুন্দর নাম, আরণ্য বৃক্ষের নাম, অষ্ট অলঙ্কার, বাত্রিশ ব্যঞ্জন, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র জানিতে চান, কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীকে ধরুন। অভাগী নারী পতিসোহাগ-কামনায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কি গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে, হাটে কি দ্রব্যের কি দর, কি দ্রব্যসংযোগে কি ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়, পাড়া-পড়শীর সঙ্গে লইয়া কেমন দলাদলি হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি জাতি চরিত্রই বা কি, ইত্যাদি এমন কোনও গ্রাম্য ব্যাপার নাই, যাহা চক্রবর্ত্তী সুকুমারূপে জানিতেন না, এবং সুযোগমত আমাদিগকে বলেন নাই। গ্রাম্য শ্রোতা এই সকল কথা যেমন বুঝে, তেমন কি প্রকৃতির শোভা কি মূর্ত্তি-বিশেষ দেখিয়া কবির কবিত্বোচ্ছ্বাস বুঝিতে সমর্থ?

কিন্তু যে লেখক লিখিয়াছেন,—"কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ নয়; ইহার অনেক স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যে, তাহাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটে।"

এ কথা সত্য যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু ইহাও সত্য যে সকল শব্দ সত্ত্বেও গ্রাম্য শ্রোতা রসভঙ্গ দোষ বুঝিতে পারে না। কবিকঙ্কণ কি সে সকল শব্দের পরিবর্ত্তে গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না? কবিকে কি অক্ষর মিলের ভাবনা করিতে হয়? আমাদের বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই এবং কবিত্বের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুকুন্দরাম স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা সকল শব্দ নাই বুঝুক, কিন্তু শব্দের ঝঙ্কার অনুভব করিতে পারে। স্বর্ণগোধিকা-রূপিণী অভয়ার নিজমূর্ত্তি-ধারণ পড়ুন।—

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ী, পরিবা পাটের শাড়ী,
ষোড়শ বৎসরের হৈলা রামা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
দিবা দিন রূপের উপমা॥

আছে কি? আর কবিকল্পিত কাব্যে কি ভূগোলপরিচয় করিতে হইবে? অদ্যাপি দেখ, কবি, আগ্রা হইতে গোলাহাট বেশী দূরে নহে, গুজরাট আর গুর্জর এক স্থান নহে। কালকেতু ব্যাধে আমরা কোল সাঁওতাল দেখিতে পাই, কালকেতুর বন কাটাইয়া নগর-স্থাপনে বনবিষ্ণুপুরের ন্যায় কোনও রাজ্যের নগর-নির্মাণ দেখিতে পাই। কালকেতু ভুঞাদের আদি-পুরুষের রাজা হইয়াছিল। অদ্যাপি উড়িষ্যার কেওঝড়-অধিপতি ভুঞাদের রাজা আছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম অজয়নদতীরবর্ত্তী উজানী নগরে কেন গিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি; হয় ত তিনি তাঁহার প্রতিপালক রঘুনাথ রায়ের সহিত গিয়াছিলেন, হয় ত তাঁহারই সঙ্গে গঙ্গা দিয়া সাগর-সঙ্গমে ও শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। যে গড়মান্দারণ গ্রাম দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন, যাহার উচ্চ মৃৎপ্রাকার ভেদ করিয়া ক্ষীণস্রোত আমোদর প্রাচীন প্রস্তর অট্টালিকা ভগ্নস্তূপ ধৌত করিয়া প্রবাহিত আছে, যে মান্দারণে যাহার গড় ছিল বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধি আছে, সেই মান্দারণের তুল্য [illegible] রাজদুর্গের চিহ্ন হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ হইতে মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে অতীত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর মৃত সাক্ষ্য রূপে বর্ত্তমান আছে, এবং ভবিষ্য অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল গড়ের কোনও কোনটি নিশ্চয়ই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এত উপকরণ থাকিতে কবিকঙ্কণকে, বোধ হয়, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই।

কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব অনেকে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। তিনি তাঁহার কাব্যে একই প্রকার ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দারিদ্র্যের কথা, ঘরোয়া কোন্দলের কথা, ভোজনের কথা, গর্ভবতীর সাধ খাওয়ার কথা, বিবাহের কথা, যুদ্ধের কথা, সিংহল-যাত্রার-কথা একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভাষাও প্রায় একরূপ, এমন কি, কোনও কোনও স্থলে একই কবিতা বাহির হইয়াছে। হঠাৎ পড়িবার সময় পুনরুক্তিদোষ মনে পড়ে। মনে হয়, কবিকঙ্কণের বৈচিত্র্যজ্ঞান ছিল না, হয় ত কবিত্বরচনা তাঁহার সহজ ছিল না। কিন্তু যখন মনে করি, তাঁহার [illegible] পালায় গাহিবার গান, যখন মনে করি, বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ চণ্ডী গায়ক জগাই সেকরা একই ভাবের গান, একই কবিতা

পান্থশালায় যাইয়া বেশপরিবর্ত্তনের পর ব্যবসার কথা [illegible] লিখিলাম; তাহার পর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

২

[illegible]ত কথা মনে পড়িতে লাগিল!—

আমার পিতা এলাহাবাদে ওকালতী করিতেন। আমাদের আদিবাস হুগলী জিলায়। মা'র স্বাস্থ্য স্বভাবতঃ ভাল ছিল না, তাই বাবা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে লইয়া এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে মার শরীর ভাল হইল দেখিয়া তিনি এলাহাবাদে ওকালতি পরীক্ষা দিয়া সেই স্থানেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ[illegible] দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়াছিল। বিধবা পিতামহী এলাহাবাদে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পর বাবা দেশের বাটী জ্ঞাতিদের দান করিয়া [illegible] হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, এবং এলাহাবাদবাসী হইয়া পড়েন।

এলাহাবাদে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের চারি বৎসর পরে আমার ভগিনী সুরমা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে আমার এক[illegible] জন্ম হয়। সে বিকল যকৃৎ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। [illegible] চিকিৎসার ও [illegible] তাহাকে মাতৃবক্ষে রক্ষা করা যায় নাই। তাহার মৃত্যু হইতেই মার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়; বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে এক দিন তাঁহার [illegible] হৃদয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া গেল। তিনি আপনিও [illegible] বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে মৃত্যু সন্তানশোকতপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের সকল বেদনা দূর করিয়া দিল। নয় বৎসর বয়সে আমি মাতৃহীন হইলাম।

মা [illegible]ন পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, [illegible] সুরমা [illegible] আমার কাছে থাকিত। আমরা দুই জনে খেলা করিতাম, বেড়াইতাম, বাবার কাছে ঘুরিতাম। এখন সুরমার [illegible] ও সুখ-দুঃখের ভাগী আমি ছাড়া আর কেহ রহিল না। আর [illegible] উভয়ের—মাতৃহীন সন্তানদ্বয়ের পিতা ব্যতীত আর কেহ [illegible] না। আমরা যেমন বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না, বাবাও তেমনই আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল, বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও [illegible] ঘটিল না। চতুর্থ বর্ষে বাবার এক জন বন্ধুর বিধবা পত্নী একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, তীর্থভ্রমণব্যপদেশে এলাহাবাদে আসিলেন। আমাদের [illegible] উঠিলেন।

স্বভাবতঃ পিতার কিছু আদরের হয় ; তিনি শেষে আমার … হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার … অবাধ্য …—তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি বেদনাই দিয়াছিলাম, … তখন যদি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতাম, সে বেদনা দূর করিবার অবসর … জীবনে আর পাইব না !

অংশী হইয়া সোৎসাহে কাজ করিতে লাগিলাম। … হইতে লাগিল। কাজ বাড়াইতে … লাম। দুই বৎসর বাড়ী যাওয়া হইল না। তাহার পর বিভূতির পত্র পাইলাম ;—মফঃস্বলে মোকর্দ্দমায় যাইয়া জ্বর লইয়া বাবা গৃহে ফিরেন,—তিন দিনের জ্বরে সব ফুরাইয়াছে। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিভূতি এলাহাবাদে যাইতে লিখিয়াছিল। আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টায় দ্বিগুণ শ্রম করিতে লাগিলাম। কারবারের শাখা-সংস্থাপনের জন্য করাচি বন্দরে গমন করিলাম। তিন বৎসরে সে স্থানে কারবার ফলাও করিয়া ব্রহ্মে শাখা সংস্থাপন করিতে যাইলাম। সাত বৎসরে ব্রহ্মের শাখা মূলকে অতিক্রম করিয়াছে। সেই ব্যবসায়ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়াছি। এখন আমি কারবারে … ।

আজ একে একে সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। সুরমার শেষ পত্রখানি নিকটে ছিল ; আবার পাঠ করিলাম। মন বড় চঞ্চল হইল। স্থির করিলাম, ব্রহ্মে ফিরিবার পূর্ব্বে একবার এলাহাবাদে যাইব। জগতে আমার আপনার বলিতে যাহারা আছে, তাহাদের দেখিয়া যাইব। এ দশ বৎসরে সুরমা কতবার আমাকে যাইতে লিখিয়াছে !

৩

পর দিন যথাকালে ব্রজেশের গৃহে উপনীত হইলাম। ব্রজেশ গৃহে ছিল না ; ভ্রাতাকে লইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। সে … দিনই তাহার জননীকে আমার কথা বলিয়াছিল ; আমি গিয়াছি সংবাদ পাইয়াই তিনি আসিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কত খুঁটিনাটি, সুরমার কথা, বিভূতির কথা, তাহাদের ছেলেদের কথা প্রভৃতি। আমি বিবাহ করি নাই শুনিয়া অনেক দুঃখ করিলেন। ব্রজেশের ছেলে মেয়েরা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল।

আমার পরামর্শে অনেক চেষ্টা করিলে ব্রজেশ আফিসে [illegible] ছুটী পাইল। উভয়ে এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম।

৫

এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া সুরমার আনন্দ ও যত্ন, বিভূতির আপ্যায়ন, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের উল্লাস; এই সকলের ধাক্কা সামলাইতেই এক দিন কাটিয়া গেল। সুরমার সে আনন্দে আমার হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বালকবালিকাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, আমারও ঠিক সংসার মরুভূমি নহে।

পরদিন বিভূতিকে গোপনে ব্রজেশের কথা ও আমার সঙ্কল্প জানাইলাম। বিভূতি হিসাবের কাগজপত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিল। আমি বলিলাম, "ভাই, এই বার বৎসর ঐ সব লইয়াই আছি। যে দুই দিন এখানে থাকি, ও দায় হইতে অব্যাহতি দাও। ব্যাপারটা কি, বল।"

বিভূতি জানাইল,—আমার পিতৃত্যক্ত অর্থ তাহার চেষ্টায় দ্বিগুণ হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে আমার নামে একটা সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে। সহস্রাধিক নগদ টাকা হাতে নাই।

আমি বলিলাম, "ভাল। তাহাই দেওয়া যাউক। কি বল?"

তাহাই স্থির হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবশিষ্ট টাকাটার কি করি?

আমি এলাহাবাদে আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের আর এক জন বাল্যবন্ধু সেই দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ভগবানদাস এলাহাবাদের উকীল, এবং অতি প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল; লোকে বলাবলি করিত, তাঁহার কাছে যে একবার টাকা ধার করিত, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়াইয়া তিনি তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেন। রামশরণ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আমাদের বাড়ী পাশাপাশি, এবং আমরা সহপাঠী, তাই রামশরণের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আজ রামশরণকে দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহার নিকট আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার করিয়া ব্রজেশকে দিব, এবং যাইবার সময় টাকা শোধ করিবার ভার বিভূতির স্কন্ধে চাপাইয়া যাইব।

সেই দিন অপরাহ্নে আমি রামশরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সব কথা বলিয়া আমি স্বয়ং আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার চাহিলাম। রামশরণ

কয় মিনিট ইতস্ততঃ করিল ; আমি ভাবিলাম, বেনে-বুদ্ধি প্রবল হইতেছে। তাহার পর সে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে আমাকে হাজার টাকার একখানি চেক আনিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "তোমার খাতা আন ; লিখিয়া দিব। একটা লেখা পড়া থাকা ভাল।"

রামশরণ বলিল, "আমি কেবল তোমার অনুরোধে ও আর এক জন বাল্যবন্ধুর উপকারের জন্য এ টাকা দিলাম। কিছু লিখিতে হইবে না। ব্রজেশের যদি সুবিধা হয়, টাকা শোধ করিবে। আমি দাদনের কাজ তুলিয়া দিয়াছি।"

অত বড় কাজ তুলিয়া দিয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন ?"

"বাবার এক জন খাতক যে ভাবে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল, তাহাতে আর কাজ চালাইতে পারিলাম না।"

আমি ভাবিলাম, একটা মোটা লোকসান হইয়া গিয়াছে ; জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি ?"

৬

রামশরণ বলিতে লাগিল,—আমাদের বিদ্যালয়ের পথে মুন্সী নন্দকিশোরের সেই বড় বাড়ী তোমার মনে আছে ?—সেই হরিণ, ময়ূর ও পারাবত দেখিতে আমরা যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতাম ? নন্দকিশোর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহাদের সরিকে সরিকে মোকদ্দমা বাধে। বাবাই নন্দকিশোরের উকীল ছিলেন। কয় বৎসর মোকদ্দমা চলিল ;—জলের মত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। মুন্সীজীর সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গেল। বাবা প্রথম অমনই, ক্রমে সম্পত্তি ও বাড়ী আবদ্ধ রাখিয়া, টাকা ধার দিতে লাগিলেন। কয় বৎসরে সুদে আসলে টাকা আসলের দ্বিগুণ হইয়া গেল। এই সময় মোকদ্দমাও শেষ হইল, মুন্সীজীরও মৃত্যু হইল।

বাবা নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলেন। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া আপনি কিনিয়া লইলেন। গৃহমাত্র অবশিষ্ট রহিল, টাকাও পাওনা রহিল। অল্প দিন পরে বাবা বাড়ীখানিও বিক্রয় করাইয়া কিনিলেন। কিন্তু বাড়ী দখল লইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংসারের বাস উঠাইতে হইল।

আদালতে সেলামী দিয়া পিতৃসম্পত্তির ব্যবহারের আদেশ পাইলাম। আমি

[illegible] বাড়ী দখল লইতে হইবে। মুন্সীজীর সন্তান ছিল না। অবস্থা [illegible] তাঁহার বিধবা সেই গৃহে কোনওরূপে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কেমন করিয়া গৃহ অধিকার করি?

কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া উকীলের পরামর্শ লইলাম। উকীল বলিলেন, দখল না লইলে সব বৃথা। আর অধিক সময় না[illegible] ইহার মধ্যে দখল না লইলে সব বিফল হইবে। আমি মুন্সীজীর পত্নীর নিকট সংবাদ পাঠাই[illegible]। সুখদিনসহচর দাস দাসীরা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। কেবল জগতে অন্য কোনও আকর্ষণহীনা এক বৃদ্ধা দাসী পুরাতন প্রভুপত্নীকে ত্যাগ করে নাই। সে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিল, বিধবাকে ভিটা হইতে তাড়াইলে তাঁহাকে পথে মরিতে হইবে। আমার অভাব নাই। তিনি যে কয় দিন আছেন, আমি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে ভিটাচ্যুত না করি। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সব শুনিয়া আমি কিছু টাকা ছাড়িয়া দিতে চাহিলাম। দাসী বলিল, "তাঁহার দিবার ক্ষমতা থাকিলে সব টাকাই দিতেন। ক্ষমতা নাই। সকল দিন আহার জুটাও কষ্টসাধ্য হইয়াছে।"

আরও এক মাস গেল। আর চার দিন মাত্র সময় আছে। আমি আবার সংবাদ পাঠাইলাম; আবার সেই দাসী আসিল। আবার সেই কথা। কিন্তু আমি ত আর অপেক্ষা করিতে পারি না!

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমি সংবাদ পাঠাইলাম, পর দিন প্রভাতে যাইয়া বাড়ী দখল করিব।

পর দিন প্রভাতে পেয়াদা ও লোক লইয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। দ্বার মুক্ত। আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহিরের মহল [illegible],—অপরিচ্ছন্ন; ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত আমাদের অপরিচিত পদধ্বনিতে শঙ্কিত হইয়া উড়িতে লাগিল।

আমরা সে মহল অতিক্রম করিলাম।

অন্দর-মহলের দ্বারে সেই দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নয়নে কি পৈশাচিক দীপ্তি! সে বলিল, "আইস; তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।"

আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কয়টি কক্ষ অতিক্রম করিয়া আমরা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে উপনীত হইলাম।

দাসী প্রাঙ্গনমধ্যস্থলে তুলসীবেদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—সেই বেদীমূলে মরণাহতা রমণী,—মৃত্যু[illegible] চঞ্চল। বুঝিলাম, সৌভাগ্যগৌরবচ্যুতা রমণী ভিখারিণীর লাঞ্ছিত [illegible]নের বাতনা-ভোগ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। গৃহ-অধিকারের প্রমাণ কাগজপত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত চিকিৎসকের সন্ধানে বাহির হইলাম।

[illegible]ক্ষণ পরে চিকিৎসক লইয়া ফিরিলাম।

তখন রমণীর মৃত্যুচাঞ্চল্য শেষ হইয়াছে; তিনি দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশার সকল যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

* * * * * * *

আমি রমণীর সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই ঋণ-পরিশোধের পর আমি দাদনের কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। বিস্তৃত জাল ক্রমে গুটাইয়া তুলিলাম।

সে গৃহ অধিকৃত হইল। কিন্তু হায়!—সে গৃহ লইয়া আমি কি করিব? অনেক ভাবিয়া পিতার নামে একটি অনাথ-আশ্রম সংস্থাপন করা স্থির করিলাম। সে আশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়াছি। অনাথ-আশ্রম সেই গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে।

যদি আর কোথাও যাইবার না থাকে, চল, সে আশ্রম দেখিয়া আসি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভাষা ও আদিরস।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাধারণতঃ যে সকল জীবের কাম-ভাব নাই, তাহারা মূক; এবং যে সকল জীবের কাম ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা শব্দায়মান। [illegible] প্রাণিগণের মধ্যে [illegible]কেই কেবল কাম-কালে মুখর, অন্য সময়ে নহে। [illegible] কামজ দৈহিক উত্তেজনা হইতেই প্রথমে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, পরে উহার উপকারিতা অনুভূত হইলে মস্তিষ্কের [illegible]তি সহ উহা ক্রমে ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ভাষার বিকাশের নিমিত্ত মস্তিষ্কে অন্ততঃ

তিনটি মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের উৎপত্তি আবশ্যক হইয়াছিল;—শব্দ-কেন্দ্র, ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র। শব্দ-কেন্দ্র ও ভঙ্গী-কেন্দ্রের সাহায্যে ভাষা উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধি-কেন্দ্রের সাহায্যে উহা উন্নত হইয়াছে। বুদ্ধির উন্নতির সহ ভাষার উন্নতি জড়িত। শিশুরও যেমন, মানবজাতিরও তেমনই,—বুদ্ধির যতই উন্নতি হইয়াছে, ভাষারও ততই উন্নতি হইয়াছে। উচ্চারণের সমস্ত যন্ত্র থাকিতেও নিম্নপ্রাণিগণ কেবল বুদ্ধিহীনতাবশতঃই ভাষার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু মানবীয় ভাষা বংশপরম্পরাগত বৃত্তি নহে। পশু, পক্ষিগণ স্বভাবতঃই স্বীয় ভাষা উচ্চারণ করে। যদিও সঙ্গীতের [illegible] তাহারাও মাতার নিকট শিক্ষা করে, তথাপি কেহ শিক্ষা না দিলেও, গৃহপালিত একটিমাত্র পক্ষী আপনা হইতে, স্বীয় জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে। কামজ উত্তেজনা ও বংশপরম্পরাগত কামিক নির্ব্বাচন (sexual selection) প্রভাবে উহা তাহার জীবনের একাংশরূপে পরিণত হইয়াছে।* কিন্তু মানব-শিশুর তদ্রূপ নহে। সে এরূপ একটিমাত্র মানব-শিশু এক স্থানে থাকিলে মানবীয় ভাষা উচ্চারণ করিতে শিখিবে না। সে মানবসমাজে প্রতিপালিত হয় বলিয়াই মানবীয় ভাষা শিক্ষা করে। একজাতীয় মানব-শিশু অন্যজাতীয় মানবসমাজে বাস করিলে, অনায়াসে সেই লোকের ভাষাই শিক্ষা করে। জাপানী [illegible] বাঙ্গালীসমাজে পালিত হইলে বাঙ্গালাই শিখিবে। এই সকল হইতেই বুঝা যায় যে, মানবীয় ভাষা বংশগত নহে। উহা আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত হয় না। উহা অন্য বিদ্যার ন্যায় [illegible] তাহা শিক্ষা করিতে হয়। উহা বুদ্ধিসাপেক্ষ। বুদ্ধি যেমন এক এক জাতির (Race) এক এক ভাবে গঠিত হইয়াছে, এক এক জাতির ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা

---

* The bird speaks, even when untaught, the language of its species, Sexual Selection, as we may suppose, has made this language, an essential part of its being

Wiesmann on Heridity vol. II. p. 47—50.

† His (man's) language does not Exist as a perfected faculty * * but only as a possible expression of it, which only becomes actual when the individual preserves Communication with those who preceded him. Viz. when he is taught to speak Hence it is that every human child can learn any language; hence it is that there is not one single human language, but hundreds of them. Wiesmann on Heridity, vol. II. 150

যেন এক-এক স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাই মানবীয় ভাষাও পৃথক পৃথক। পশু পক্ষিগণেরও ভিন্ন ভি[illegible] [illegible] ভাষায় কিছু-কিছু ইতর-বিশেষ আছে; ইহা এক্ষণে প্রতিপন্ন [illegible] তছে। মানবীয় ভাষা সহজ বৃত্তি নহে, উহা শিক্ষালব্ধ। কিন্তু যে শি[illegible] করিবে, তাহার শিক্ষণীয়তা না থাকিলে শিখিতে পারে না। এই শিক্ষণীয়তা তাহার মস্তিষ্কের ও বাক্‌যন্ত্রের অবস্থারই নামান্তরমাত্র। বাক্‌যন্ত্রের কি মস্তি[illegible] কোনও অংশে অনুপযোগিতা থাকিলে, শিক্ষার সেই পরিমাণ বিঘ্ন হ[illegible] [illegible]এতদুভয়ের উপযোগিতা বংশপরম্পরাগত হয়। উপযোগিতা ও শিক্ষণীয়তা,—ইহারা [illegible] ধর্ম্ম, অবশিষ্ট সকলই চেষ্টালব্ধ। যাহা বংশাগত ধর্ম্ম, তাহা মানব অতি প্রাথমিক জীবগণ হইতে বিবর্তন-প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব-রাজ্যে যখনই প্রথমে ধ্বনির উদয় হইয়াছে, সেই হইতে ক্রমে বংশপরম্পরাগত নিয়মানুসারে মানব ভাষার অধিকারী হইয়াছে। নিম্ন প্রাণিগণের কামজ উত্তেজনাই ধ্বন্যাত্মক ভাষার মূল ছিল; ইহার চরম উৎকর্ষ বিহঙ্গ-সঙ্গীত। আর মানবের ভাষা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার চরম উৎকর্ষ বুদ্ধির উৎকর্ষের সহিত জড়িত।

আদিকাল হইতে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষার ইতিহাস এইরূপেই গঠিত হইয়াছে। দেহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে ভাষা [illegible] বিবর্দ্ধিত হইতেছে। দৈহিক উত্তেজনা * হইতে ধ্বনির উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি হইলেই তাহা ভাবগত হইয়াছে। তখন মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরে ক্রমে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া ভাষা এক্ষণে বহু পল্লবিত হইয়াছে। ভাষার দ্বিতীয় [illegible] সঙ্গী[illegible], ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত। তৃতীয় অবস্থা বর্ণাত্মক, সুতরাং এ অ[illegible] সঙ্গীত[illegible] তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ পক্ষীতে; অ[illegible] তৃতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ মানবে। সঙ্গীত মানবীয় ভাষার আদি [illegible] শেষ বিবর্তন। এই ভাবে ভাষার ইতিহাসের আলোচনা করিলে সমস্ত জীবজগৎ এক অপূর্ব্ব নিকট সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া যায়। ভাষাও বিবর্তনবাদের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

---

* কামজ।

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি।

—:•:—

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ সভার এক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় ... নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিবিধ যুক্তিপ্রয়োগে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার লক্ষণগুলি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভাষাকে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে রাজেন্দ্র দাস, যদুনন্দন দাস, লোচন দাস, রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি অনেকেই 'প্রাকৃত ভাষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে যে উচ্চাঙ্গের কোনও ভাব লিপিবদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। "সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়', 'পাঁচালীতে নহে যোগ্য ...' প্রভৃতি ... উক্তি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের রচনায় অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এখন বিচার্য্য এই যে, কোন্ সময় বাঙ্গালা ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইল? গঙ্গার উৎপত্তিস্থল এবং ভাষার উদ্ভব—উভয়ই দুর্জ্ঞেয়, তাহার বৃথা সন্ধান করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কি কারণে কোন সময়ে এই দেশের কথিত, পণ্ডিতগণের উপেক্ষিত, পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালা ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং পূর্ব্বে সাহিত্যগঠনোপযোগী ইহার কি কি উপকরণ বিদ্যমান ছিল, ইহাই প্রথমে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত উপকরণগুলি বাঙ্গালা ভাষার আদিকালে বিদ্যমান ছিল।—

(১) বৌদ্ধধর্ম্মসূত্র ও বৌদ্ধরাজন্যস্তুতিগাথা।

(২) ডাক ও খনার বচন।

(৩) পল্লীর প্রেম-গীতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যগুলি প্রথমতঃ বৌদ্ধ প্রভাবেই রচিত হয়; উহাতে বৌদ্ধ-ভাব সুস্পষ্ট। এই কথা এখন নানাপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলি ...শ্রেণীর মুখে মুখে চলিত ছিল, কিংবা স্থলবিশেষে লিখিত আকারেও বিদ্যমান ছিল, জানা যায় না। যে ভাবেই থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার আদি যুগে উহারা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই।

...কালে ময়ূরভট্টের ... রামাই পণ্ডিত একখানি ... পদ্ধতি ... প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, রমাই বারুই-জাতীয় ছিলেন, কিন্তু ... প্রধান বিদ্যোৎসাহী ... নির্ণয় করিয়াছেন, রমাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ... যোগ দান করিবার জন্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ... পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়; উহাতে 'ওঁ বুদ্ধায় নমঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার' এবং 'সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান' প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক অকাট্য তত্ত্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মসূচক আরও অনেক কথার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে' এ কথা যখন রমাই পণ্ডিত রচনা করেন, তখন বোধ হয় জয়দেবের জন্মগ্রহণ ... নাই। এই সকল পুঁথিতে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ ... ও হাড়ি পা, কালু পা প্রভৃতি ডোমাচার্য্য ও 'নিরঞ্জন', 'শূন্যমূর্ত্তি' প্রভৃতি ধর্ম্মরাজের বিশেষণ,—এই সকলের উল্লেখও বৌদ্ধভাব-সূচক। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজা তদীয় গুরু ডোম-বংশ-তিলক হাড়ি পাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"হাড়ি পা বলেন বাছা শুন গোবিন্দাই,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই।"

যোগী পাল, গোপী পাল, মহী পাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিগাথা সম্ভবতঃ ঐ সকল সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল; তৎকালে উহারা যে আকারে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে উহাদিগকে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত না করিয়া উহার উপকরণ বলিয়াই পরিচয় দেওয়া উচিত। এই সকল গানের ভাষা ক্রমে ক্রমে অনেক পরিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি উহারা যে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ব সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মাণিকচাঁদের গানে কড়ি দ্বারা রাজকর দিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। উহা হিন্দুরাজত্বের সময়-সূচক। মাণিকচাঁদের স্ত্রীর শুভ্র দশনপংক্তির সঙ্গে কবি সোনার উপমা দিয়াছেন। যে কালে পল্লীকবি দাড়িম্ব-বীজ ও মুক্তাফলের উপমা অবগত ছিলেন না, তাহা নিতান্ত আধুনিক সময় নহে। পাল রাজগণের স্তুতি-গান এখনও রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এককালে ঐ গান বঙ্গদেশের

[illegible] এত অধিক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত "চৈতন্যভাগবত" নামক পুস্তকে গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, হরি-কথার কোনও আদরই নাই; কিন্তু

"যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি পূর্ব্বে ডোম, যুগী প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণের করায়ত্ত ছিল। এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পুস্তক হাতে লইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইতেন, কিন্তু যখন তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, জনসাধারণ এই সকল গান ও পূজার নিতান্ত অনুরাগী, তখন এই ব্যাপারটা নীচ জাতির হাতে ফেলিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিতে তাঁহারা অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতেন। ঐ সময়ে মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে যাইয়া প্রাণে গুরুতর আশঙ্কা অনুভব করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশকারী ঠাকুরের নিকট তিনি যুক্তকরে বলিয়াছিলেন,—

"জাতি যায় প্রভু যদি ইহা করি গান।"

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। তাহাতে অজস্র সংস্কৃত শব্দ, এমন কি, চৈতন্য-বন্দনা পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কোনও কোনও মসজিদের পশ্চাৎ দিকের আস্তর উঠাইয়া ফেলিলে অনেক সময় হিন্দু দেব দেবীর চিত্রযুক্ত ইষ্টক দৃষ্ট হয়। তখন মন্দির ভাঙ্গিয়া যে মসজিদ গঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিগুলিরও সম্মুখের দিকটা ফিরাইয়া দেখিলে লুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন গোচরীভূত হয়।

(২) ডাক ও খনার বচন বহু প্রাচীন রচনার নিদর্শন। শেষোক্ত বচনগুলির সর্ব্বত্র অধিক প্রচলন নিবন্ধন উহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়াছে। ডাকের বচনের দুরূহতা অনেক স্থলে এখনও লক্ষিত হয়। 'আদি অন্ত নেহ পুজসি', 'মরণের যদি ডর বাসনি', [illegible] বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুও। আগল হইলে নিবারিব ভুও" প্রভৃতি রচনা স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ। এই সকল বচন বহুকাল যাবৎ পল্লীর বেদস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মানিয়া আসিয়াছে। ইহাতে কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রন্ধন-নীতি, স্ত্রীচরিত্র প্রভৃতি পল্লীজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তত্ত্ব সঙ্কলিত আছে।

উহারা সংক্ষিপ্ত, সরল ও সত্য। দুই এক স্থলে ডাকের বচনে চাণক্যের নীতিও প্রচারিত দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ডাকার্ণব নামক বহু প্রাচীন বৌদ্ধ-তন্ত্র তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ডাকের বচনের অনেক কথা কঠিনতর ভাষায় তন্মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মতে ডাকিনী-তন্ত্র, যোগিনী-তন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় ডাকার্ণবও একখানি তন্ত্র; এবং ডাক শব্দ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ-বাচক।

(৩) সঙ্গীতে প্রেম-গীতি। মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্রই প্রেমের গান প্রচলিত হইয়াছে। কৃষকেরা মেঠো সুরে এ দেশে সেইরূপ গান অনেক গাহিয়াছে। ভাটদিগের মুখে, কথকদিগের মুখে শত শত বৎসর এই সকল কথা উচ্চারিত হইয়াছে, এ দেশের প্রতি রাখালের সুরে তাহার রেশ পাওয়া যাইত। জয়দেবের সংস্কৃত গানের ভাব এ দেশ মাতাইয়া রাখিয়াছিল; নতুবা গোবিন্দচন্দ্রের বিরহের গানে উচ্চ অঙ্গের ভাবুকতা কেমন করিয়া আসিল? উহার অজ্ঞাত-নামা রচক সংস্কৃত কিংবা অন্য কোনও বিদ্যার ধার ধারিতেন না। রাজা সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া মহিষী উদনা 'রাজার চরণে পড়ে জড়্যাগে কুন্তল।' তাঁহার আর্ত্তনাদে পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল, অশ্বশালে অশ্বগুলি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের চক্ষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িয়াছিল। শারী ও শুক আহার ছাড়িয়া দিয়াছিল। মাণিকচাঁদের স্ত্রী স্বামীর পাদ-পদ্ম বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল,—

"তুমি হব বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালায়্যা যাবু কোথা।"

এই শোক-মুহ্যমানা বিরহিণীর কথা কৃষকেরা হলকর্ষণের সময় শস্যশ্যামল ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়া যাইত। পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ এই সকল গানের ভাষা ও ভাব নবরসসম্পন্ন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব গীতাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় বঙ্গদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

ছিল। ইহারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আদরণীয় হইয়া উঠিল, তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

(১) বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে পালী (পল্লী শব্দের অপভ্রংশ) ও অপরাপর প্রাকৃত ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। এই সকল প্রাকৃত বিশেষরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল; ইহাদের নিয়ম-প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশ হইতে প্রাকৃতভাষার চর্চ্চা তিরোহিত হইল। সংস্কৃত ও উক্ত প্রাকৃত—এই উভয়বিধ ভাষাই সাধারণে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত সংস্কৃতাপেক্ষা অনেকপরিমাণে সহজ থাকাতে, উহাই অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতে ডুলি বাঁধিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রস্থান করিলেন। মধ্যবর্ত্তী ভাষার আসন শূন্য হইল। সুতরাং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর কথিত প্রাকৃতকে (বাঙ্গালা) লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া লোকশিক্ষার উপযোগী করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল।

(২) নবোত্থিত হিন্দুধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপের পরে নবোত্থিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতাদিগের সংক্ষিপ্ত ব্রত-কথা এই ভাষায় রচিত হইল। সাহিত্যের হিসাবে সেই আদি যুগে [illegible]দের স্থান অতি নগণ্য ছিল, কিন্তু কালসহকারে এই সামান্য ব্রত কথা [illegible]গুলি বিচিত্র শোভাসম্পংযুক্ত কাব্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

(৩) মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়।

কিন্তু বঙ্গভাষা যে সহসা শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আদরণীয় হইয়া উঠিল, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ই তাহার একটি সর্ব্বপ্রধান কারণ।

হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে বঙ্গভাষাকে বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকিতে হইত। পাল ও সেন রাজগণের যুগে এই ভাষার কোনও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এই পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালা ভাষাকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পূজার যে ব্রত-কথা রচিত হইত, তাহা অনেক সময় যাজনশীল ব্রাহ্মণ নিজে পাঠ করিতেন না; গৃহস্থ তাহা

নিজে পড়িতেন। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করিয়া চলিয়া যাইতেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু জমীদারগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরের ন্যায় পদাবলী প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার-রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি-মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত ছিলেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষার প্রবেশলাভ অসম্ভব কল্পনা। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা পরবর্ত্তী কালের শ্লোক ও প্রবাদবাক্যে সূচিত হইতেছে। একটি প্রবাদ এই,—'কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁষে। এই তিন সর্ব্বনেশে॥' একটি শ্লোক এই,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এ প্রকার উপেক্ষিতার রাজ-সম্মানলাভ অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু মুসলমান সম্রাটগণের অনুগ্রহে এই অসম্ভব সম্ভব হইল।

গৌড়ে পাঠান মুসলমান সম্রাটগণ আসীন হইলেন। তাঁহারা ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে এ দেশীয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এ দিকে দীর্ঘকাল এ দেশে বাস নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্য-কাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনুদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* কবি বিদ্যাপতিও এই নসির শাহ† এবং গৌড়েশ্বর প্রভু

* "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিধান।"—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

† "সে যে নসিরা সাহ জানে। যারে হানিল মদন বাণে।
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।"

...উদ্দিন সুলতানের প্রশংসা করিয়াছেন। ... খাঁ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন, কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। হুসেন শাহ কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন শাহের প্রশংসাসূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে দৃষ্ট হওয়া যায়। * হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন, এবং নোয়াখালী জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটি খাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

এই সকল অনুবাদ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ দেখাইতেন। কবি আলওয়াল আরাকান-রাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ

---

* (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইহাকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের এক জন ভক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) "সনাতন ... সাহ নৃপতিতিলক।"—বিজয় গুপ্ত।

(৪) "সাহ হুসেন ... ভূপ, সেই এহি রস জানে।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে।"

রচনা করেন। যাগন ঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং বলা উচিত, যাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। সোলেমান নামক অপর অনেক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গ্রন্থ-পুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। দৌলত কাজি নামক অপর এক জন কবি পূর্ব্বোক্ত ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই দীনা হীনা বঙ্গভাষায় রাজদ্বারে প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমীদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ভাষা এই ভাবে হিন্দু রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন। সুতরাং আমরা রাজা রঘুনাথ রায়ের ও বাঁকুড়া রায়ের সঙ্গে মুকুন্দরাম কবির, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে রামেশ্বরের, বর্দ্ধমানাধিপ কীর্ত্তিচন্দ্রের সঙ্গে কবি ঘনরামের, কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নাম একত্র জড়িত পাইতেছি। রাজমালায় উল্লিখিত আছে যে, ত্রিপুরার দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে সমগ্র মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছিল। চলিত একটি শ্লোকে আছে, 'বিনাশ্রয়ে ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই কোন না কোন আশ্রয়দাতা রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ধারণা এই যে, মুসলমান দরবার হইতেই এই প্রথা দেশময় সংক্রামিত হইয়াছিল; নতুবা বাঙ্গালা ভাষা প্রকাণ্ড সংস্কৃত শাস্ত্রকে ঠেলিয়া এবং পণ্ডিতগণের প্রাচীরপ্রমাণ নস্যাধারের বাধা অতিক্রম করিয়া কত কালে যে রাজধানীতে প্রবেশলাভ করিত, তাহা বলা যায় না।

শুধু কয়েকখানি ব্রতকথা ও মুসলমান সম্রাটগণের এই সামান্য আদর,—ইহাই কি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল? কোনও অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে তদুপযোগী আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তি চাই। বঙ্গভাষার

একটা স্থানে সেই ... হইয়াছিল। ... অপূর্ব ...-সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়া ...
... বঙ্গদেশে প্রেম-লীলার ... করিবেন, ... শুভ সংবাদের আভাষ চণ্ডীদাস শুনাইলেন। অশিক্ষিত পল্লীকবি প্রেম-বীণার যে উচ্চ তন্ত্রীতে করস্পর্শ করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব বা বিদ্যাপতি তাহা পারেন নাই। তাঁহার কবিত্বের উৎস,—রজকিনী রামীর প্রেম। তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—'এই প্রেম নিকষিত হেমতুল ... নাই—ইহা তাঁহার "উপাসনা-রস"।' পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ ও গায়ত্রীর পবিত্রতা * তিনি এক তীর্থে মিলাইয়াছিলেন, ... রজকিনীর গৃহে। ... জন্মিয়াছে বলিয়া পঙ্কজ অশুদ্ধ হইয়া যায় ... বরং পঙ্কের নামেই পদ্ম নিজের পরিচয় দিতেছে। চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমের কথায় আপনার পরিচয় দিয়াছেন; সেরূপ লেখা আর কোন ... কবির সাহসে কুলাইত কি না সন্দেহ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম তিনি ভাবের যে উচ্চ গ্রামে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভাব-সম্মিলনের পদে একমাত্র বিদ্যাপতি তত ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনাকালে আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুসলমান সম্রাট ও যাজনশীল পুরোহিতদিগের উপেক্ষা-মিশ্র সামান্য আদরই বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নহে। ইহার এক নিভৃত কক্ষে রাজভাণ্ডার প্রোথিত ছিল। আকরের সমল অমূল্য হীরক-খণ্ডের ন্যায় পল্লীর অমার্জ্জিত ভাষায় রচিত চণ্ডীদাসের পদ এ দেশকে সেই রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিল। বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম কবি; ইহাতে বুঝা যায়, সংস্কৃত-চর্চ্চা এ দেশকে যত বড় করিয়াছে, ইহার স্বকীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি ইহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে পৌঁছাইয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, বাঙ্গালা ভাষা পণ্ডিত ও ধনী মুরুব্বীর আশ্রয় পাইলেও, কেহ ইহাকে পায়ে পড়িয়া বড় করিতে পারে নাই। ইহা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় ললাটে সৌভাগ্যচিহ্ন লইয়া পল্লী হইতে নগরে আসিবার জন্য যান বাহনের প্রতীক্ষা করিতেছিল মাত্র।

---

* তুমি রজকিনী......
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন।
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

প্রাচীন বঙ্গ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬২৯-৪৫ খৃঃ) চিরখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎকালে বঙ্গ নামে কোনও দেশ বা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশ বঙ্গ দেশ নামে পরিচিত, তাহা হুয়েনসাঙের সময়ে পাঁচটি স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

১। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন;—বর্ত্তমান মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যভুক্ত ছিল।

২। কামরূপ রাজ্য;—এই রাজ্য করতোয়া নদীর তীর হইতে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মণিপুর, জন্তিয়া, কাছাড়, পশ্চিম আসাম ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কামরূপ রাজ্যের রাজধানীর নাম প্রাগ্-জ্যোতিষ ছিল।

৩। সমতট;—সমতট শব্দের অর্থ তীরবর্ত্তী, বা সমতল দেশ। পূর্ব্ববঙ্গ। বরাহমিহিরের গ্রন্থে সমতটের নাম-উল্লেখ দেখা যায়।

৪। তাম্রলিপ্তি;—বর্ত্তমান মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল।

৫। কর্ণসুবর্ণ;—পশ্চিম বঙ্গ। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

হুয়েনসাঙ এই সকল রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ কৌতুকাবহ, এবং তৎকালের অবস্থার সুন্দর চিত্রপট। আমরা উক্ত বিবরণের সারসঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য চক্রাকারে ৮ শত মাইল (৪০০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৬ মাইল (৩০ লি)। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জনাকীর্ণ দেশ। রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্য্যালয় ও পুষ্পোদ্যান সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবি-

[illegible]। পৌণ্ড্র ব[illegible] রাজ্যের [illegible]সমতল, চিক্কণ ও উর্ব্বরা ; এখানে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সর্ব্ববিধ শস্য উৎপন্ন [illegible]। পনস ফল যথেষ্ট পাওয়া যায় ; এবং এই ফল অতিশয় লোক[illegible]। দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জনমণ্ডলী বিদ্যানুরাগী। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রায় বিংশতিসংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক তিন সহস্র আচার্য্য অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে শতাধিক দেব-মন্দির দেখা যায় ; এই সকল দেব-মন্দিরে নানা-সম্প্রদায়-ভুক্ত শাস্ত্রবিদ্‌গণ মিলিত হন। অসংখ্য উলঙ্গ নির্গ্রন্থ এই রাজ্যে বাস করেন।

রাজধানী হইতে পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে রাশিভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। বিদ্যালয়-ভবন আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত ; চূড়া ও মণ্ডপসমূহ অত্যুচ্চ। এই বিদ্যালয়ে আচার্য্যের সংখ্যা সাত শত। পূর্ব্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্য্য এইখানে বাস করেন।

এই বিদ্যালয়ের অনতিদূরে অশোক-রাজ-নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে তথাগত (বুদ্ধদেব) পুরাকালে তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সময় সময় উপবাসদিনে ইহার চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়।

ঐ স্থানের পার্শ্বেই আর একটি স্থান। এই স্থানে প্রাচীন বুদ্ধ-চতুষ্টয় পরিভ্রমণ ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সকলের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইহার অল্প দূরে একটি বিহারে বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার দৈবজ্ঞতার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নহে ; তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রমিতি ভ্রমশূন্য। দূর ও নিকট, নানা স্থানের লোক সকল আসিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশলাভের জন্য হত্যা দিয়া থাকে।

হুয়েনসাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল। হুয়েনসাঙ পথিমধ্যে একটি সুবৃহৎ নদী (সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামরূপ।

কামরূপ রাজ্য চক্রাকারে ২ হাজার মাইল (১০ হাজার লি)। রাজধানীর পরিমাণ চক্রাকারে ৬ মাইল। কামরূপের ভূমি নিম্ন, উর্ব্বরা ও [illegible]তিমত কর্ষিত। কামরূপে পনস ও নারিকেল ফল জন্মে। এই সকল বৃক্ষের

সংখ্যা বহু তথাপি উহার মূল্য অনেক। নগরের পার্শ্বে নদী বা কৃত্রিম জলাশয় বহমান। জলবায়ু অতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। কামরূপবাসিগণের আচার ব্যবহার সরল ও ভদ্রতা-সম্পন্ন। তাহারা খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ। তাহাদের স্বভাব উগ্র ও রুক্ষ। তাহাদের স্মৃতি-শক্তি তীক্ষ; তাহারা বিদ্যার্জ্জনে যত্নশীল।

কামরূপবাসীরা দেব দেবীর উপাসক। তাহারা উপাস্য দেবতার প্রীত্যর্থ বলি প্রদান করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহাদের আস্থা নাই। এ কারণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের মিলন জন্য কোনও সঙ্ঘারাম এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মে বিশ্বাসী, তাঁহারা গোপনে প্রার্থনা করেন। এক শত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল দেব-মন্দিরে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র শাস্ত্রবিদ্ বাস করেন। কামরূপের বর্ত্তমান অধিপতি ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। এই বংশের আদিপুরুষের নাম নারায়ণ দেব। বর্ত্তমান রাজার নাম ভাস্কর বর্ম্মণ। তাঁহার উপাধি কুমার। অদ্য পর্য্যন্ত নারায়ণি বংশের এক সহস্র (?) পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। কামরূপের অধিপতি জ্ঞানানুরাগী; তাঁহার আদর্শে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। দূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে তীক্ষ্নদর্শী বিচক্ষণ লোক সকল রাজকার্য্য অন্বেষণে অপরিচিতের ন্যায় রাজধানীতে উপনীত হন। যদিও রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তথাপি বিদ্বান্ শ্রমণগণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। সুদূর চীন হইতে বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য এক জন পরিব্রাজক (হুয়েনসাঙ) নালন্দের সঙ্ঘারামে আগমন করিয়াছেন, কামরূপের অধিপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন। কামরূপ রাজ্যে গমন জন্য তিনি রাজদূত কর্ত্তৃক তিন-বার অনুরুদ্ধ হয়েন; কিন্তু তথাপি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। তখন শীল-ভদ্র তাঁহাকে বলেন, "আপনি বুদ্ধ দেবকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে অভিলাষী, অতএব সত্য ধর্ম্ম প্রচার করাই আপনার কর্ত্তব্য। পথ সুদীর্ঘ বলিয়া আপনি ভীত হইবেন না। কুমার রাজপরিবার অপধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) বিশ্বাসী, এখন তাঁহারা এক জন শ্রমণকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহা সুলক্ষণ। আমাদের অনুমিত হইতেছে যে, কামরূপের অধিপতি মত-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এবং জনসাধারণের হিতার্থ নিজে পুণ্যসঞ্চয় করিতে

[illegible] হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে [illegible] অন্তঃকরণ ছিল; আপনি [illegible] তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলকল্পে শাস্ত্র-অন্বেষণের জন্য নানা দেশে [illegible] করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশ ভুলিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত [illegible] থাকিবেন; প্রশংসা বা নিন্দা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) বিস্তৃতির জন্য পথ পরিষ্কার, মিথ্যা শিক্ষায় ভ্রান্ত জনমণ্ডলীকে [illegible] পরিচালন ও পরহিতে আত্মহিত বিসর্জ্জন করিবার জন্য পরিশ্রম করা আপনার কর্ত্তব্য। যশের চিন্তা বিমুক্ত হইয়া কেবল ধর্ম্মবিষয়ে নিরত থাকিবেন।" ইহা শুনিয়া ঐ শ্রমণ [illegible] কোনও আপত্তি না করিয়া রাজদূত সহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎকার [illegible] করিয়া কুমাররাজ বলিলেন, "আমি নিজে বিদ্যাবুদ্ধিহীন, তথাপি খ্যাতনামা বিদ্বজ্জনের অনুরাগী; এই কারণ আপনার যশঃ ও প্রতিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকে আগমনের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি।" শ্রমণ উত্তর করিলেন, "আমার বিদ্যা বুদ্ধি পরিমিত, আমার এই সামান্য খ্যাতির বিষয় মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে, ইহাতে আমি লজ্জিত হইলাম।" কুমাররাজ বলিলেন, "এখন শিলাদিত্য (ইনি দ্বিতীয় শিলাদিত্য; শিলাদিত্য উপাধিমাত্র; প্রকৃত নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রথম শিলাদিতের রাজত্বকাল হুয়েনসাঙের আগমনের ষাট বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই কান্যকুব্জ দেশের অধিপতি ছিলেন।) কাজুখির দেশে বাস করিতেছেন। তিনি সত্য, জ্ঞান ও পুণ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিপুল [illegible] করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; পঞ্চনদ প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ অবশ্যই এক সঙ্গে মিলিত হইবেন। শিলাদিত্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি প্রার্থনা করি, আপনি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিবেন।" অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গে যাত্রা করেন।

কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই রাজ্যে কোনও সুবৃহৎ নগর দেখিতে পাওয়া যায় না। সীমান্তে চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশবাসী অসভ্য জাতির বাস। এই সকল অসভ্যের আচার ব্যবহার, [illegible] জাতির তুল্য। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই স্থান হইতে দুই মাসে (চীনের) সুহ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, পঁহুছিতে পারি। কিন্তু পর্ব্বত ও নদী এই পথের বিঘ্ন; এবং দূষিত বায়ু, বিষাক্ত বাষ্প, [illegible] সর্প ও বিনাশকর [illegible] গাছ গাছড়া প্রভৃতি মৃত্যুর কারণসমূহ [illegible]।

এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দলে দলে হস্তী পাওয়া যায়। এই হস্তী বিশেষভাবে যুদ্ধকালে নিয়োজিত হয়।

১২৫০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট রাজ্য অবস্থিত।

সমতট।

সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল (৩০০০ লি) এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী; সকলে যত্নসহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) উভয় ধর্ম্মের আচার্য্যগণই বাস করেন। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইঁহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই নানা-সম্প্রদায়-ভুক্ত শাস্ত্রবিদ্‌গণ বাস করেন। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

নগর হইতে অনতিদূরে অশোকনির্ম্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারি জন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান।

ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সঙ্ঘারামে হরিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি আট ফিট উচ্চ।

সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

তাম্রলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তি চক্রাকারে ৩০০ মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); ইহার রাজধানীর পরিমাণ মাত্র দুই বর্গমাইল। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং নানাবিধ ফল ফুল যথেষ্টপরিমাণে জন্মে। তাম্রলিপ্তি গ্রীষ্মপ্রধান। লোক সকল ক্ষিপ্রকারী ও চঞ্চল। তাহারা

[illegible] ও সাহসী। এখানে সত্যধর্ম ও অপধর্ম, উভয়বিধ ধর্মাবলম্বী [illegible] বাস। সমতট রাজ্যে প্রায় দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। [illegible] সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক [illegible] আচার্য্য বাস করেন। দেব-[illegible] সংখ্যা ৫০; দেবমন্দিরগুলিতে নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত শাস্ত্রবিদ্গণ [illegible] করিতেছেন। তাম্রলিপ্তি রাজ্যের তটভূমি সমুদ্রের সহিত মিলিত; [illegible] তাম্রলিপ্তি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে যথেষ্টপরিমাণে [illegible] সংগৃহীত হয়; এবং এই কারণে তাম্রলিপ্তিবাসীরা সাধারণতঃ [illegible]শালী।

তাম্রলিপ্তির রাজধানীর পার্শ্বে অশোক-রাজ-নির্ম্মিত স্তূপ। ইহার পার্শ্বে চারি জন প্রাচীন বুদ্ধের অবস্থান ও ভ্রমণের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাম্রলিপ্তির সাত শত লি উত্তর-পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ রাজ্য চক্রাকারে ৩ শত মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। কর্ণসুবর্ণ জনাকীর্ণ দেশ। অধিবাসীরা ধনশালী ও সুখী। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে ফুল ও নানাজাতীয় মূল্যবান পদার্থ জন্মে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; লোকের আচার ব্যবহার মনোরম ও সাধুতাসম্পন্ন। তাহারা অতিশয় জ্ঞানানুরাগী, এবং অভিনিবেশসহকারে জ্ঞানার্জ্জনে নিরত। এই দেশে সত্যধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, উভয় শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। এখানে ন্যূনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। প্রায় দুই হাজার আচার্য্য এই দশটি সঙ্ঘারামে অবস্থিতি করেন। এখানে পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। কর্ণসুবর্ণ দেশে অপধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য।

রাজধানীর পার্শ্বে রক্তভিত্তি নামক সঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামের কক্ষ সকল আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত; দ্বিতল চূড়া সমুচ্চ। এই স্থানে রাজ্যের সমস্ত খ্যাতনামা বিদ্বান্ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পরস্পরের উন্নতিসাধন ও চরিত্রের পূর্ণতা-বিধানে যত্ন করেন। প্রথমতঃ কর্ণসুবর্ণবাসীরা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৎকালে দক্ষিণ-ভারতের এক জন অপধর্ম্মাবলম্বী উদরের উপর তাম্রপাত্র ও মস্তকে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিতেন। এই ব্যক্তি দণ্ডহস্তে সগর্ব্বে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষের সহিত তর্ক করিবেন বলিয়া ঘোষণা

প্রচার করিলেন। এক জন লোক তাঁহাকে বলিল, "আপনার [illegible] মস্তক এরূপ অদ্ভুত ভাবে সজ্জিত কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার জ্ঞান অপরিমিত; তাহার ভরে আমার উদর বিদীর্ণ হইতে পারে, [illegible] আশঙ্কা করি। আমি অজ্ঞান ব্যক্তি সকলের দুঃখে বিচলিত হইয়াছি, ইহারা অন্ধকারে রহিয়াছে, এই জন্য আমি মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছি।"

দশ দিনের মধ্যেও কেহ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইল না। সমস্ত জ্ঞানী ও বিদ্বৎকুলে এরূপ ব্যক্তি এক জনও মিলিল না, যিনি তাঁহার সহিত তর্ক করেন। ইহাতে রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "হায়! আমার রাজ্যে অজ্ঞানান্ধকার এত দূর পরিব্যাপ্ত যে, এক জন লোকেও এই আগন্তুকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। ইহা আমার রাজ্যের পক্ষে বড়ই অযশের বিষয়। কোনও উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা অতি নগণ্য স্থানেও সন্ধান করিয়া দেখিব।"

তখন এক জন লোক বলিল, "মহারাজ! নিকটবর্তী বনে এক জন শ্রমণ বাস করেন। তিনি অধ্যয়নে অতিশয় যত্নপর। তিনি এখন নির্জনে গোপনে বাস করিতেছেন। তিনি দীর্ঘ[illegible]; তিনি আপন উৎকর্ষ বলে ইহার ন্যায় অধার্মিকের সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রমণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য নিজে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শ্রমণ উত্তর করিলেন; "দক্ষিণ-ভারতে আমার নিবাস; আমি দেশভ্রমণোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়া কিছু দিনের জন্য অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতেছি। আমার ক্ষমতা সামান্য ও সাধারণ। আমার বিশ্বাস যে, মহাশয় ইহা অবগত নহেন। যাহা হউক, যদিও কোন্ বিষয়ে তর্ক করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু অবগত নহি, তথাপি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে গমন করিব। যদি আমি তর্কে অপরাজিত থাকি, তবে মহারাজকে একটি সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্মের গৌরববর্দ্ধনের জন্য প্রচারকগণকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিব।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। আমি আপনার গুণবত্তা বিস্মৃত হইতে অসমর্থ।"

অতঃপর শ্রমণ রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক বিচারক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। অপধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত স্বীয় শাস্ত্র হইতে ত্রিশ হাজার শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

[illegible] যুক্তি [illegible] ও [illegible] এতদূর [illegible] সমস্ত বিচারপদ্ধতি মনোহর হইয়াছিল।

শ্রমণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিলেন; কোনও তর্ক বা শব্দ তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিল না। তিনি কয়েক শত শব্দের সাহায্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন; এবং তার পর পণ্ডিতকে তদীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতের বাক্য-স্ফূর্ত্তি রুদ্ধ হয়, এবং তর্কসমূহ অসার হইয়া পড়ে। তিনি উত্তর দিতে অসমর্থ হন। এইরূপে তাঁহার যশঃপ্রভা মলিন হইয়া যায়; এবং তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন।

অতঃপর রাজা শ্রমণকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই রাজ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

ঐ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে অনতিদূরে অশোক রাজার নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানে উপদেশ প্রদান করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই একটি বৌদ্ধ বিহার। এই-খানে চারি জন বৌদ্ধের ভ্রমণ ও অবস্থানের চিহ্ন দেখা যায়। নানা স্থানে আরও অনেকগুলি স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল স্থানে বুদ্ধদেব প্রকৃষ্ট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত স্তূপও অশোক রাজার নির্ম্মিত।

কর্ণসুবর্ণ দেশের ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে উড্র (উড়িষ্যা) রাজ্য।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

উপমা।

অনেকের যেন একটা ধোঁয়াটে রকম বিশ্বাস আছে যে, অনেকগুলি লাগসৈ উপমা দিতে পারলেই কবিতা হয়। তা হয় না।

এরূপ বিশ্বাস থাকবার কারণ যে একেবারে নাই, তা আমি বলতে প্রস্তুত নই। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস একটি উপমার সাগর। সেক্সপিয়রের নাটকেও উপমার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় মাইকেলও

এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যদি এই কবিগণ কেবল উপমা-সর্ব্বস্বই হতেন, তা' হ'লে তাঁরা কবি হতেন না।

তবে কবিতায় উপমার সার্থকতা কি? কেন কবিগণ এত উপমাপ্রিয়? অথচ প্রবন্ধ-রচয়িতারা সেরূপ ন'ন। অন্ততঃ যাঁরা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক, (যেমন এমার্সন, স্পেন্সার, মিল, রস্কিন ইত্যাদি; কার্লাইল গদ্যে কবি ছিলেন।) তাঁরা মোটেই উপমাপ্রিয় ন'ন। আমাদের দেশে দুই এক জন প্রবন্ধ-রচয়িতা প্রবন্ধে বড়ই অধিক উপমা ব্যবহার করেন। তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, তর্কে উপমা লেখককে পদে পদে প্রমাদপূর্ণ যুক্তিতে টেনে নিয়ে ফেলে; আর এই উপমাপূর্ণ যুক্তি বালককেই বোঝাতে পারে, বিজ্ঞকে বোঝাতে পারে না। উপমা প্রায় কখনই একটা যুক্তিস্বরূপ গ্রাহ্য হ'তে পারে না। অতএব প্রবন্ধে যত উপমা বর্জ্জন করা যায়, তত তার নিষ্প্রমাদ হ'বার সম্ভাবনা। কথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। উপমার কাজ তিন রকমের ঃ—

প্রথমতঃ, উপমা ভাব-প্রকাশের একটি অন্যতম উপায়। কথাবার্ত্তায়ও যখন সোজা কথায় ভাবটা সম্যক প্রকাশ করতে পারছি না, তখন আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন, যখন আমরা বলি যে, অমুকের মুখখানি পদ্মফুলের মত, তখন আমার মানে এই যে, তার মুখখানি দেখতে অতি সুন্দর,—কিংবা যখন বলি যে, সে যখন গান গায়, সে গাধার মত চীৎকার করে, তখন তার মানে যে, তার স্বর তখন অত্যন্ত কর্কশ শোনায়;— উভয় স্থানেই একটা সকলের জানা জিনিস দিয়ে—মনের ভাবটা বুঝিয়ে দিলাম। তবে উপমা মনের ভাবটা ভালো করে' প্রকাশ করবার একটা উপায়। অর্থাৎ, উপমা অনেকটা উদাহরণের কাজ করে। মনের ভাবটা স্পষ্ট-তর করে। এই উদ্দেশ্যে উপমা গদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হয়। তবে পদ্যেও এরূপ উপমা ব্যবহৃত হয়; আমরা প্রচলিত ভাষায় সাধারণতঃ এত বেশী ছোটখাটো উপমা ব্যবহার করি যে, তা ভেবে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। 'মাথা ধরা', 'পা কামড়ানো', 'গা বা মেজাজ আগুন হওয়া', 'কথা ওজোন করে' নেওয়া', 'হুকুম চালানো', 'ঘুমিয়ে পড়া',— এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উপমা বর্জ্জন করে' কথা বলার যদি একটা আইন প্রচলিত হয়,—তা হলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হয়। কারণ, পদ্যের ভাষার মূল ঐ গদ্যেরই ভাষা।

উপমার আর একটি কাজ হচ্ছে,—প্রাকৃতিক নিয়মের একটা সামঞ্জস্য

দেখানো। এর উদ্দেশ্য দেখানো যে, প্রাকৃতিক নিয়ম সব জায়গায়ই এক রকম ধারায় কাজ করছে। যেমন, যদি বলি, "রমণীর রূপের মোহে পড়ে পুরুষজাতি মারা যায়, যেমন বহ্নিতে পতঙ্গ পুড়ে মরে ;" এ উপমা এ স্থানে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে একটা সম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়। একটা প্রাকৃতিক সত্য উভয় জায়গায়ই আছে ; সেটা হচ্ছে এই যে, একটা বড় রকম আকর্ষণ আছে, যার ক্রিয়ায় মানুষ ফলাফল বিবেচনা না করে' তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ; ভাববার অবসর পায় না, অথবা তখন ভাববার শক্তি থাকে না। এ রকম উপমার পদ্যেই অধিক ব্যবহার হয়, গদ্যে কম ব্যবহার হয়। প্রবন্ধে প্রায়ই যুক্তি দিয়ে এ সব প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করে। উপমা তা'তে সামান্য সাহায্য করে মাত্র।

আর এক রকম স্থানে উপমার ব্যবহার হয়,—অর্থাৎ শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হিসাবে। একটা সুন্দর বিষয় বর্ণনা কর্‌তে কর্‌তে আর একটা সুন্দর বিষয় মনে এসে পড়্‌লো। এক রকমের দুটি বা ততোধিক সৌন্দর্য্য এক জায়গায় এনে ফেলে একটা সৌন্দর্য্য-রাজ্যের সৃষ্টি করা গেল। যেমন অমুক শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো ; কেমন, না, যেমন বায়ুর উচ্ছ্বাস দমকে দমকে এসে শেষে মিলিয়ে যায় ;—কি বাঁশীর তান পুনঃ পুনঃ আরোহণের পরে স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে প্রধান উদ্দেশ্য,—এক রকম কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একটা সমষ্টির সৃষ্টি করা। এরূপ উপমার স্থান কেবলমাত্র কবিতায়।

কবিতায় অবশ্য তিন রকমের উপমারই সার্থকতা আছে। তবে শেষোক্তরূপ উপমাই, কবিতাকে সমধিক সুন্দর করে। Shelleyর Skylark, বা শিবনাথ শাস্ত্রীর "পুষ্প" বোধ হয় অনেকেই পড়েছেন। উভয় কবিতারই উপমার পর উপমা কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একটি গুচ্ছ তৈরি করে দিয়েছে। তার উপর আরো একটি ভাব এর মধ্যে আছে যে, কবির ঐ গানটি বা ফুলটি এতই ভালো লেগেছে যে, কি দিয়ে যে তাকে বোঝাবেন, তিনি বল্‌তে পাচ্ছেন না। উপমার উপর উপমা দিয়েও তৃপ্তি হচ্ছে না। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে, আসল জিনিসটি এতই সুন্দর যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু বিনা উপমায়—অন্ততঃ গদ্যে ব্যবহার্য্য কেবলমাত্র সাধারণ উপমার নামতঃ সাহায্যে অতি উচ্চদরের কবিতা হ'তে পারে।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। [illegible] কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য অনুভূতিকে জাগ্রত করা। এই উপমাবিরহিত [illegible] এক বড় কবির হাতে পড়ে' একটা বড় কবিতায় [illegible] হয়। কবি যদি বিনা উপমায় সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা [illegible] উপমার সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করতে পারেন না, তাতেও বরং পূর্ব্বোক্ত কবির অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এবং তাঁর সে কবিতাটির মানের মূল্য সেখানে অনেক অধিক।

আর একটি কথা হচ্ছে, রূপক। রূপকের ঠিক সংস্কৃত অর্থ না ধরে' আমি এক অর্থ ধরছি এই যে, যে কবিতা সমস্তটাই উপমা, তাহাই রূপক। যেমন, একটা ঘটনা বর্ণনা করে' তা থেকে একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় মানে বোঝানো। এটার মূল্য তত অধিক নহে। একটা ধারণা মনে ধরে' নিয়ে তা গল্পচ্ছলে বল্‌লে প্রায় সেটা ইসফের গল্প বা হিতোপদেশ হয়ে দাঁড়ায়,—কবিতা হয় না। তার উপর অনেক সময়েই সে কবিতাটার মানে দুর্ব্বোধ্য হয়ে সে প্রায় একটা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়ায়। তাতে অনুভূতির উদ্রেক করার ব্যাঘাত হয়। উপরন্তু এরূপ কবিতা থেকে আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করায় অনেক সময়ে কবির বাহাদুরী অপেক্ষা ব্যাখ্যাকারের বাহাদুরী অধিক প্রকাশ পায়। শুনতে পাই যে, ব্রাউনিং এই ধরণের কবি। শেলীর এলেষ্টর ইত্যাদি এই ধরণের কবিতা (সৌভাগ্যের বিষয়, শেলী এলেষ্টরের দুর্ব্বোধ্যতা বুঝে নিজেই তার মানে করে' ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।)

কাব্যে উপমার একটি প্রয়োজনীয়তা এই যে, উপমা কবির মনের ভাব-প্রকাশের সহায়তা করে, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হয়েছে। রূপক যদি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় ত অধিকাংশ সময় সে নিজের উদ্দেশ্যকে নিজে ব্যর্থ করে। উপমায় বক্তব্যটি জানি;—তা'র এক রকম, অর্থাৎ বিনা উপমায় যত দূর সম্ভব তত দূর, বর্ণনাও পেয়েছি; যেটুকু অসম্পূর্ণ রইল, উপমা সেটুকু পূর্ণ করে মাত্র। কিন্তু রূপকে বক্তব্যটি আমাকে বাহির করতে হবে সেই রূপক থেকেই, তার উপর সেই রূপক ভিন্ন তার অন্য বর্ণনা পাই নাই। কাজেই রূপক বক্তব্যটি স্পষ্টতর করা দূরে থাকুক, সে নিজেই একটা হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়ায়। আর পাঠকগণের মধ্যে তার অর্থ বিষয়ে অনেক বিবাদ বিসংবাদ হ'তেও দেখা যায়।

অনেক ব্রাউনিংএর শিষ্য এই রূপক লিখবার জন্য বড় ব্যস্ত। [illegible]

[illegible] কথার [illegible] প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু করলেন না। [illegible] হৃদয়ে [illegible] একটা [illegible] উপভোগ করেন। এমন কি, কবিতার নামটিও তার [illegible] নাম দিবেন না, পাছে টক্ করে' পাঠক তার অর্থ ধরে' ফেলে। তার নামও দেবেন এমনি যে, নামের সঙ্গে তার সংমিশ্রণটা মিলিয়ে নেওয়া পাঠকের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা যা রূপক (যা ব্রাহ্মকন্যার ঘোমটার মত শাঁসটিকে সযত্নে ঢেকে রাখে) লিখতে বেশী চাইবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, সেক্সপীয়র কালিদাস, বাইরণ, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইত্যাদি মহাকবিগণ একেবারে রূপক না লিখেও এমন কবি হয়েছিলেন, ব্রাউনিং যাঁদের কাছে দাঁড়াবার বা যাঁদের ছায়া মাড়াবারও যোগ্য হন নি।

তবে রূপক যদি সুবোধ্য হয়, তা হ'লে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য দেখাবার হিসাবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, উপমা আংশিক সামঞ্জস্য দেখায়, আর রূপক পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখায়। সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি আর একটা অনুরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেও তার একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সে সাধন করে কখন?—যখন মূলভাবটি বোঝা গিয়েছে;—আর তা যত শীঘ্র বোঝা যায়, ততই ভালো।

তবে এটি নিশ্চিত যে, একটা নিখুঁত রূপকের সৃষ্টি করতে পারলেই কবিতা হয় না। সে বিজ্ঞান হ'তে পারে, দর্শন হতে পারে, কিন্তু কবিতা হয় না। মাইকেল একটা জায়গায় ঝড়ের সঙ্গে শোকের দীর্ঘ উপমা দিয়ে প্রায় তাকে রূপকের মত করে' ফেলেছিলেন; সে জায়গাটার উপমাটি বাদ দিলে মেঘনাদবধ কাব্যের কোনও সৌন্দর্য্যহানি হোত না।

সাধারণতঃ এইটি বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, কবিতা যত সহজ ততই মর্ম্মস্পর্শী হয়, আর যে নিজে সুন্দরী তার তত আভরণের দরকার হয় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বীণা

—:০:—

"ঘোমটার ভঙ্গি দেখ !"

শাশুড়ী ঠাকুরাণীর জলন্ত তীব্র দৃষ্টিপাতে বীণা জলসিয়া গেল। বীণা নববধূ; দ্বাদশ বৎসরের মেয়ে। বীণা সভয়ে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

গহন বনের মত শ্বশুরালয়। অরণ্যচারী শার্দ্দূলের মত শ্বশুরালয়ের লোক। জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায় বীণা চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া সভয়ে চক্ষু মুদিয়া থাকিত। চক্ষু মুদিয়া বীণা অন্ধকার দেখিত।

বীণা পিতামাতার সাধের কন্যা। পিতা বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া শান্ত-চিত্তে সংসারধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীণা তার পর আর আবদার করে নাই। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে বীণা তাঁহার আদরের মাত্রায় আবদার করিত।

বীণা রাগ অভিমান শিখিয়াছিল। বীণা জানিত, রাগ ও অভিমান করিলে সকলে সাধিবে; কাঁদিলে কোলে লইবে। বীণার পুতুল রাগ অভিমান করিত, কাঁদিত। বীণা সাধিত, সাধ করিয়া চুম্বন করিত।

কিন্তু শ্বশুরালয়ের তীব্র কুঠারাঘাতে সে পুতুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বীণা ভাবিত, "কোথায় গিয়াছে ? বোধ হয় পিতার সহিত পরলোকে গিয়াছে।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী আবার বলিলেন, "মেয়েটা বড় বেহায়া। বাস্তবিকই বেহায়া। প্রাতঃকাল হইলেই জলখাবার চায়, সন্ধ্যা হইলেই ছাতে উঠে। সকলের মুখের দিকে চায়। গুরুজন বলিয়া জ্ঞান নাই। আমাদের বংশে এমন মেয়ে আসে নাই।"

দাসী মাতঙ্গিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ছোট ঘরে বিয়ে দিলে এই রকমই হয়ে থাকে।"

বড় ননদ আসিয়া বলিল, "হিঁদুর ঘরে ত এমন মেয়ে থাকা ভাল নয়, ওর চুলের মুঠী ধরিয়া মার।"

দাসী মাতঙ্গিনী বলিল, "আর ভাঁড়ারঘরে বন্ধ কর।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহা অনুমোদন করিলেন না।—"ভাঁড়ারঘরে বন্ধ করিলে সব খাইয়া ফেলিবে।"

[illegible] বলিল, "[illegible]"

বীণা সকলের দিকে সজল [illegible]। বুদ্ধির দৌড়টা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী আজিনার [illegible] উঠিলেন, "মা, মেয়েটার কোনও পদার্থ নাই।"

ননদ নগেন্দ্রবালা বলিল, "বাস্তবিকই বেয়াড়া, বেহায়া। ওকে মারা বৃথা; ওর খাওয়া বন্ধ কর।"

[illegible] যথাক্রমে জারি হইল। খাইবার সময় কেহ বীণাকে ডাকিল না। সাত বৎসরের বালক ননী বীণার ছোট দেবর। সে বীণাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বৌদিদি খেতে আস্‌বে না?"

বড়দিদির বিরাট চাপড় খাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

বীণার শ্বশুর মহা ধনী। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বহু দাস দাসী। বীণার স্বামী নরেন্দ্র সখ করিয়া কলেজে বি. এ. পড়ে। বংশের প্রথাক্রমে এখনও তাহার নববধূর সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার দাবী দাওয়া জন্মে নাই। নরেন্দ্র সকালে সকালে খায়। সকালে সকালে কলেজে যায়। মধ্যে মধ্যে ননী আসিয়া 'বৌদিদি'র সংবাদ দেয়। আজ কিন্তু ননী আসিল না।

গভীর রাত্রি। আকাশ ভরা মেঘ। প্রকাণ্ড অট্টালিকায় সকলে সুখ-নিদ্রায় সুষুপ্ত। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দাসী, দরওয়ান, ঘোড়ার সহিস, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল,—সকলেই পেট ভরিয়া খাইয়াছে। কেবল বীণা ক্ষুধাতুরা। উচ্চ ছাতের কার্নিশে বসিয়া পেচক ডাকিতেছে।

বীণা একটি ঘরে একাকিনী। দানের খাট, মশারি ও কোমল শয্যা; পুতুল ভরা আলমারি, তোরঙ্গ ভরা শাটী, গহনা ভরা বাক্স। তবে কিসের অভাব? তথাপি বড়ই নির্জ্জন। তথাপি কোমল দেহলতা অবসন্ন। বীণা ভয় পাইয়াছে, কাঁদিয়াছে। কেহ নাই। সহায়হীনা, পিতৃহীনা, [illegible]হীনা। বীণা বড়ই অন্ধকার দেখিল। ভয়স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

তখন [illegible] চোরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিতেছিল।

২

সে ননী। ননীর হাতে একটি ঠোঙা, তার মধ্যে দুটি সন্দেশ।

কেন না, [illegible] অন্ধকারময়ী মায়ার সঙ্গে [illegible] কখনও আলোকময়ী

মায়াও দেখা দেয়। ঘাতকের [illegible] করুণা থাকে, দস্যুর মধ্যেও দুঃখকাতরতা থাকে।

ননী ঘুমায় নাই। সে অনেক বুদ্ধি খেলাইয়া, মাতার অঞ্চল হইতে চাবি চুরি করিয়া, চেয়ারের উপর টুল রাখিয়া, অন্ধকারে নানাবিধ আঘাত খাইয়া, বিলক্ষণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রকাশ করিয়া, ভাঁড়ার-ঘর হইতে দুইটি সন্দেশ সংগ্রহ করিয়াছিল।

কি সুন্দর দুইটি মূর্ত্তি! যেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট কুমার আসিয়া স্তিমিত তারকার নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতি রুদ্ধ করিল;—"তুমি নিভিও না।"

"বৌদিদি, কেঁদ না; আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি।"

পুরস্কারের দাবী স্বরূপ ননী কোলে বসিল। বীণা ধীরে ধীরে ননীকে বুকে টানিয়া লইল, কিন্তু সন্দেশ খাইল না। বীণা বলিল, "ছি! শ্বশুর-বাড়ী চুরি করিয়া সন্দেশ খাব? তাহা কখনই হইবে না; না হয় মরিব।"

আবার সেই অভিমান! যেখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, যত্ন নাই, মমতা নাই, সেখানে রমণীর স্থান নাই। সেখানে জীবনের কোনও অর্থ নাই।

ননীর চক্ষু বহিয়া জল আসিল।

ননী বলিল, "কেন খাবে না?"

বীণা বলিল, "তুমি যখন স্বাধীন হইবে, তখন তোমার দাসী হইয়া দুই মুষ্টি খাইব, কিন্তু এ সন্দেশ ত তোমার নয়, কি করিয়া খাই?"

ননী বলিল, "অর্দ্ধেক আমার।"

বীণা। তবে আর অর্দ্ধেক কা'র?

ননী। দাদার। সে দিন বাবা বলেছিলেন, অর্দ্ধেক সংসার আমার।

বীণা। তবে একটা সন্দেশ ফেলিয়া দাও।

ননী গম্ভীরভাবে ভাবিয়া দেখিল, সে নিজেও পেট ভরিয়া খায় নাই। একটি সন্দেশ নিজে খাইল। অন্যটি বীণার মুখে তুলিয়া দিল।

ননী বলিল, "এটা আমার।" বীণা খাইল।

উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

দুঃখ-কীট বালিকার হৃদয় আক্রমণ করিয়াছিল। জীবনের বৃন্ত ভাঙ্গিতে-ছিল। বীণার সুন্দর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। মুখের হাসি আঁখি-জলে ভাসিয়া গেল। শরীর শীর্ণ হইল। বীণার জ্বর হইল।

অর ছাড়িতে চাহে না।

বিষয়-রত কর্ত্তা ও গৃহিণী ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার হুকুম দিলেন।

ননদ নগেন্দ্রবালা বলিল, "ম্যালেরিয়ার দেশের মেয়ে, বোধ হয় পিলে হয়েছে। চিরকাল্‌টা জ্বালিয়ে খাবে।"

ক্ষুধা পাইলে সাবুদানার বাটী হস্তে নদী আসিত। কিন্তু যে খাইবে, সে বীণাকে ছাড়িতে বসিয়াছিল।

কথাটা নরেন্দ্রনাথের কর্ণে গেল। কলেজ ফেরতা নরেন্দ্রনাথ দীনু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে স্বদেশী সিগারেট্‌ টানিতেছিল। কম্পাউণ্ডার যদুনাথ ধীরে ধীরে নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "বড় বাবু! তোমার কঠিন ব্যায়রাম।"

নরেন্দ্র। কে বলিল?

যদুনাথ। আজিকার প্রেস্ক্রিপ্সনটা একটু নূতন ধরণের। বোধ হয়, শরীর বড় ক্ষীণ। ষ্টিমুল্যাণ্ট অনেকটা আছে। একটু যত্নের দরকার।

নরেন্দ্র এ বিষয় পূর্ব্বে বড় ভাবে নাই। যত্ন? এত টাকা যাহার, তার যত্নের অভাব কি? দাস দাসী কি করিতে?

নরেন্দ্র চিন্তাযুক্ত হইয়া বাটীতে গেল। ইচ্ছা হইল, একবার লুকাইয়া দেখিয়া আসে, কিন্তু তাহা প্রথা-বিরুদ্ধ। সকলে বলিবে কি? হিন্দু-শ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী বংশে ইহা নূতন।

তবে উপায় কি?

ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্র স্থির করিল যে, বীণার দাদাকে এ সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। নরেন্দ্র লিখিল, "প্রিয় সুরেশচন্দ্র! বোধ হয়, তোমার ভগ্নীর জ্বরটা কিছু কঠিন; একবার দেখিয়া যাও। আমার ভরসা ছাড়িয়া দাও, কেন না, আমি বাহিরেই বসিয়া থাকি, অন্দর-মহলে বড় একটা যাই না।"

৪

বীণার পিত্রালয় কলিকাতায়। বীণার পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাতা পুত্র সুরেশচন্দ্রকে লইয়া সেই বাটীতে থাকিতেন।

বিধবা চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই মানস-পটে আঁকিয়া সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব লইয়া আলোচনা করিতেন।

বীণার পিতা বীণাকে একটি ছোট ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহস্থের কিছুরই অনাটন ছিল না। কিন্তু সে ক্ষুদ্র গৃহ এখন শূন্য। তাহার মধ্যে এখন আবদার অভিমান, খেলা ধূলা কিছুই নাই। কেবল বীণার একটি

ছোট ফটো আছে। স্নান করিয়া প্রত্যহ সেই ফোটো [illegible] [illegible] দেখিতে চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু বীণাকে তাহার মধ্যে না পাইয়া [illegible]। সংসারের চির-অজ্ঞাত পথ দিয়া চারিটি পথিক ক্রমে ক্রমে সেই গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল। পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যা ; একটি [illegible] [illegible] সতী তাহার অনুসরণ করিবেন। কিন্তু পুত্র কন্যা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ; সে কয় দিনের জন্য ? কন্যাকে একটি পথে বিদায় দিয়া পুরাতন গৃহে বিধবা মাতা পুত্র ও স্মৃতি লইয়া দিনযাপন করিতেন।

সুরেশচন্দ্র এম. এ. পড়ে। স্বদেশীর মহা আন্দোলনে যোগ দিয়া অবধি তাহার গৃহ সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিল না।

পিতার শেষ বাক্য স্মরণ করিয়া সুরেশ মধ্যে মধ্যে বীণার সংবাদ লইত। কিন্তু বীণা আর পত্র লেখে নাই। বিধবা মাতা প্রত্যহ বেলা দশটার সময় একখানি পত্র পাইবার প্রত্যাশায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পিয়ন কেবল বলিয়া যাইত, "পত্র নাই।"

সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত সুরেশচন্দ্রের নিকট বিধবা আর একবার গেলেন ; "বাবা ! একখানা টেলিগ্রাম কর।"

সুরেশচন্দ্র রাগে জ্বলিয়া উঠিল, "তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই মা। বুদ্ধি থাকিলে বড়লোকের ঘরে বিবাহ দিতে না। সেই দূর দেশে যখন তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছ, তখন তাহার ফল ভুগিতে হইবে। তবে সেখানে ভাত কাপড়ের ভাবনা নাই ; রোগ হইলে ডাক্তার দেখিবে, কাঁদিলে গহনা গড়াইয়া দিবে। ভাবনা কি ?"

মাতা। বাবা ! গহনা, ভাত, কাপড়ে কি কচি মেয়ে বাঁচে ?

সুরেশ। তবে কি দুধে বাঁচে ? যদি দুধেই বাঁচে, তবে বনবাস দিলে কেন ?

এই রূপে মাতাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া সুরেশচন্দ্র লাঠি ও চাদর লইয়া মিটিং করিতে গেল।

সভায় খুব জমাট বাঁধিয়াছে। বঙ্গের বত্রিশটা জেলা অদ্ভুতভাবে বয়কট বজায় রাখিয়াছে। উৎপীড়িত প্রজাগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সংবাদপত্র উচ্চ স্তম্ভে উচ্চৈঃস্বরে নবা বঙ্গের জীবন-ইতিহাস প্রচার করিয়াছে।

কলিকাতা উদ্দীপনায় ; জাতীয় জীবন খরস্রোতে প্রবাহমান ;

... বক্তার বক্তব্য অনেকে স্থিরীকৃত হইল। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ আলোচিত হইল। দেশের টাকা দেশে রাখিবার নূতন বন্দোবস্ত স্থির হইল। সকলেই উৎসাহপূর্ণ, সকলেরই নূতন আশা।

চারি জন বন্ধু লইয়া সুরেশচন্দ্র গোলদিঘীর দিকে গেল। সেখানে পোষ্ট-পিয়ন আসিয়া সুরেশের হস্তে দুইখানি পত্র দিল। একখানা নরেন্দ্রের, অন্য পত্র বীণার।

বীণা লিখিতেছে, "দাদা! আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন বাবার কাছে যাই। তোমাদের ছাড়িয়া এক দেশে আসিয়াছি; আবার বোধ হয়, অন্য দেশে যাইব। সেখানে যেন বাবাকে দেখিতে পাই। সেই আমার স্বদেশ।"

সুরেশ স্তম্ভিতভাবে আবার পাঠ করিল। নরেন্দ্রের পত্রখানিও পড়িল। তাহা বুঝিতে বেশী সময় লাগিল না।

৫

ধীরভাবে সুরেশচন্দ্র বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ গোপাল! বিবাহ ব্যাপারটা বড় বিরক্তিজনক।"

গোপাল। ভয় কি, তোমার ত হয় নাই।

সুরেশ। কিন্তু আমার ভগিনীপতির হইয়াছে। সে গাধা। তাহার দ্বারা স্বদেশের কোনও উপকার হইবে না।

গোপাল। তাহার টাকার দ্বারা হইবে।

সুরেশ। কিন্তু ভবিষ্যতের বাঙ্গালা দেশ টাকার দ্বারা উদ্ধার হইবে না। বয়কট্ একটা নক্সা। নক্সা পুরাতন হইয়া গেলে, স্বদেশ আবার মুখে কালি মাখিবে।

গোপাল। আমাদিগের বংশধর?

সুরেশচন্দ্র। সে বংশধরের মা কই? মা কি সিগারেটের ধূমে উড়িয়া আসে, মা স্বদেশী কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধা থাকে? যেখানে স্বামী নাই, সেখানে সতী নাই; যেখানে স্নেহ নাই, সে দেশে শক্তি নাই।

গোপাল। এই শত কোটী সন্তানের মা কোথায়?

সুরেশচন্দ্র তীব্রভাবে বলিল, "তিনি পদদলিতা। কল্পিত মূর্ত্তিকে আবাহন করিয়া আমরা অসুর দলিতে চাই, কিন্তু আমরাই অসুর। ইহার ফলে আমরাই চূর্ণ হইয়া যাইব। এ দেশে রমণী পীড়িতা, রুগ্না ও পদদলিতা। তাহার দেহ হইতে বীর সম্ভবে না। শত কোটী সন্তানের মাতা, কন্যা ও

স্ত্রী এখনও অতল জলে, গভীর অন্ধকারে। এ বাক্যসার দেশের [illegible] অনেক দুর্দশা আছে।

"সুরেশ চলিয়া গেল। বন্ধুগণ সুরেশের এই অসাধারণ পরিবর্তনের [illegible] সমালোচনা করিতে লাগিল।

বাড়ী গিয়া সুরেশচন্দ্র মাতাকে ডাকিল। "মা! বীণার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন" বিধবা পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন।

"বাবা! তুমি দেখ; আমার ভাবিবার শক্তি নাই।"

মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৬

বীণা! বীণা! আমার পিতার সাধের বীণা! যাহাকে দশ বৎসর ধরিয়া কোলে করিয়াছি, কখনও মুখ তুলিয়া ভৎর্সনা করিতে পাই নাই; যাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট আমি লজ্জা পাইতাম; যাহাকে অনেক সময় গৌরীর সহিত তুলনা করিয়াছি;—তাহার এই দশা?

কি কঠিন মায়া! মায়া এড়াইতে গেলে দেশ উচ্ছিন্ন যায়। মায়াতে অধীর হইলেও দেশ থাকে না। এক দিক [illegible] শূন্য, অন্য দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইহার মধ্যে কর্তব্য কি?

সুরেশচন্দ্র রাত্রিতে ঘুমাইল না। অনেক বিভীষিকা [illegible] আর নাই। বীণা যথার্থই কি স্বদেশে গিয়াছে? [illegible] স্নেহ না থাকিলে তুমি আমি যাইতে পারিব কি? কি বলি[illegible]ইব?

মোহে ভুলিও না। সবই মায়া। যাহাতে দুইটি হৃদয় একত্র হয়, তাহা মায়া নহে। যে রাখি দুইটি হাত বাঁধে, সেই রাখিই কোটী হাত বাঁধে।

নরেন্দ্রের সহিত বীণার হাত বাঁধিয়াছিলাম। বীণার হাত ফিরিয়া আসিয়াছে। অবলম্বন না পাইয়া সে হাত শূন্যে পূর্বস্মৃতি আশ্রয় করিতে চাহিতেছে।

এইরূপ অনেক হাত ফিরিয়া যাইবে; অনেক রাখি টুটিবে।

তবে করিলাম কি?

সুরেশচন্দ্র রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া [illegible] বাঁধিল। মাতাকে ডাকিয়া বলিল, "মা! আমি আজই এলা[illegible]দ চলিলাম। তুমি ভাবিও না। আমি গেলেই বীণা ভাল হইয়া যাইবে।"

মাতা ধীরভাবে বলিলেন, "সাবধানে যাইও; আমি যাহা ভাবিয়াছ, তাহা ভাবিয়া পূর্বেই স্থির করিয়াছি।"

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি সুরেশ আসিল না দেখিয়া নরেন্দ্র চিন্তিত হইল।

নরেন্দ্র দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ কেমন আছে?"

মাতঙ্গিনী দাসী বলিল, "বোধ হয় ভাল আছে।"

নরেন্দ্র। বোধ হয়? কেন, তুমি কি জান না?

মাতঙ্গিনী। সকালে দেখিয়াছিলাম।

নরেন্দ্র। সমস্ত দিন কে দেখিয়াছে?

মাতঙ্গিনী। খোকা বাবু।

নরেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গের শোণিত উষ্ণ হইল। চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিল।—"কি? এত বড় সংসারে আমার স্ত্রীকে রুগ্ন শয্যায় দেখিবার জন্য খোকাবাবু ছাড়া আর কেহই নাই। আচ্ছা, তুমি চলিয়া যাও।"

মাতঙ্গিনী অন্দর-মহলে গিয়া বড় বাবুর অভিনব উচ্ছ্বাসটা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা ও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট বিশেষ নিপুণতাসহকারে প্রকাশ করিয়া দিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তুই সদরের দিকের দুয়ার বন্ধ করিয়া দে।"

বীণা যে ঘরে শুইয়াছিল, তাহার সম্মুখেই বৃহৎ বাগান। বাগানের উপর আকাশ। সেটা পূর্ব্ব দিক। পূর্ব্ব দিকে কলিকাতা, তাই বীণা সেই দিকে চাহিয়া থাকিত।

বীণার সব তারই ছিন্ন হইয়াছিল। কেবল একটি তার ক্ষীণভাবে তাহাকে ইহলোকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

"ননী! তোমার দাদা ঘুমাইয়াছেন?" ননী দাদার নাম শুনিয়া একটু আনন্দিত হইল।

"বৌদিদি! তাঁকে ডেকে দেব?"

বীণা। না—না—না। আমি তা বলি নাই। ননী! তুই ভুল বুঝিয়াছিস।

ননী কিন্তু ভুল বুঝে নাই। নরেন্দ্র অন্দর-মহলের কবাট বন্ধ দেখিয়া মনে করিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় বাগানের দিক। বড় আম্রবৃক্ষের ডাল হইতে ছাতের উপর উঠা যাইত। সেই পথ অনুসরণ করিয়া নরেন্দ্র বীণার শয়নগৃহের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তবে অনেক প্রেমের লক্ষণ আফিং, গাঁজা, কিংবা সিদ্ধির মত দেখা গিয়াছে। এ সকল অসাধারণ।

কাহারও মতে প্রেম তিন ভাগে বিভক্ত ;—

১। দেহের প্রেম—(মদের মত)।

২। মানসিক প্রেম—(আফিংএর মত)।

৩। আধ্যাত্মিক প্রেম—(গাঁজা প্রভৃতির মত)।

এ সকল মত কত দূর সত্য, তাহা দেখা উচিত। কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেহের প্রেমকে হঠাৎ 'কাম' বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারও তথ্য অনুসন্ধান করা উচিত। মদ চোলাই করিতে গেলে তিনটি ক্রিয়া আবশ্যক ;—

১। রস-পরিপাক। (Brewing)

২। রসোদ্গার, অথবা মাদকতা প্রাপ্তি (Fermentation)

৩। রস-সংশোধন বা চোলাই (Distellation)

শর্করা কিংবা শর্করা-বিশিষ্ট পদার্থ,—যেমন মহুয়া ('মধ্ব' চরক-সংহিতা দেখ) কিংবা ধান্য, গোধূম, ব্রীহি প্রভৃতি মদের 'গোড়া'। মিষ্ট কিংবা মধু-বিশিষ্ট না হইলে তাহা হইতে মদ হয় না। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু কিংবা গুড় একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহা মাতিয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাহা পাক হইয়া গিয়াছে, এবং চোলাই করিবার উপযুক্ত হইয়াছে।

পাক কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্র উদ্গার উঠিতে আরম্ভ হয়। গুড়ের জালা হইতে অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid gas) উঠিতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু মাদকতা-সঞ্চার 'ইয়েষ্ট' (Yeast) নামক জীবাণুর দ্বারা হয়। ইহারা বায়ুতে থাকে, এবং রস পরিপাকযোগ্য হইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। ভাঁটি-খানার রসের জালার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে রস-পাকের সময় ফেনসদৃশ একটা আবরণ দৃষ্টিগোচর হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে জীবাণু আছে।

পরিপক্ক ও মাদকতা-প্রাপ্ত রস সময়মত চোলাই না করিলে তাহার বিকার উপস্থিত হয়, এবং টক হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, পশুদিগের প্রেমের সঞ্চার আবশ্যক বোধ হইলে, তাহারা পরস্পরের গাত্রলেহন করে, অর্থাৎ সাধু ভাষায় গা চাটিয়া থাকে। মনুষ্য

জাতি ঠিক গাত্রলেহন করে না, কিন্তু (অনেকটা তাহারই অনুরূপ) চুম্বনাদি করে। সন্দেহ হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা পরস্পরের দেহ হইতে 'ইয়েষ্ট' নামক পদার্থের কিংবা জীবাণুর সঞ্চার হইয়া পরস্পরের দেহস্থ রসকে মাতাইয়া তুলে। ইহা আদি-রস, মধ্য-রস, কিংবা অন্ত-রস, তাহা ঠিক বুঝা যায় না; কিন্তু রস হইতে প্রেম হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। রস হইতেই মাদকতা, মাদকতা হইতে রসোদ্গার, এবং কখন কখন প্রেমের বিকারও দেখা গিয়াছে।

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় দেহ-তত্ত্বের বিশ্লেষণে চোলাইয়ের রহস্যটা বুঝিবার একটা সোজা পথ করিয়া দিয়াছেন।

১। ভাণ্ড-দেহে রসের পাক হয়।

২। কাম-দেহে সেটা ভাঁটিতে (Still) বোঝাই হইয়া অগ্নির সংযোগে চোলাই হয়।

৩। মন-দেহে সেটা সঞ্চিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুদামজাত হয়। ইহা দোবারা চোলাইয়ের নিমিত্ত। অর্থাৎ, ভাণ্ড-দেহ জালার মত; সেখানে রস পরিপক্ক হইলে কাম-দেহের ভাঁটির মধ্যে প্রবেশ করে। খুব সম্ভবতঃ 'ইয়েষ্ট' কাম-লোক (astral plane) বাহিয়া আইসে। কাম-দেহে অগ্নির তাপে চোলাই আরম্ভ হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভাঁটির মাথায় একটা আবরণ আছে (Still head)। সেটা নরকপাল, অর্থাৎ তান্ত্রিকগণের খুলির মত। তাহার উপর আবগারী বিভাগের দেবতাগণ ক্রমাগত শীতল জল সেচন করিতেছেন। উদ্দেশ্য যে, মাদক রস বাষ্পাকারে উঠিলে, দৈব-শীতলতা-সংস্পর্শে জমাট বাঁধিয়া মদ্য-রূপে পার্শ্বস্থিত চোঙ্গ দিয়া বাহির হইবে। চোঙ্গটা টিকীর মত।

চোঙ্গের মধ্যে মহিমা আছে। যাহারা স্থূল-রসগ্রাহী, অর্থাৎ, চারি আনা বোতল ব্যবহার করেন, তাঁহারা কাম-দেহেই মদ্যের প্রথম ধার সংগ্রহ করিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ উচ্চ-দরের খাঁটি—অর্থাৎ নং ১ কিংবা ২ ব্যবহার করেন, তাঁহারা উক্ত মদ্যকে অন্য একটা চোঙ্গ দ্বারা মন-দেহে লইয়া যান; এবং দোবারা চোলাই করিয়া অভিলষিত ফল লাভ করেন। তাহারও উপর উঠিতে গেলে, বিজ্ঞান-দেহ ও আনন্দ-দেহ প্রভৃতিতে চোঙ্গ লাগাইতে হয়, এবং মদ্যটা 'রেক্টিফায়েড্' অর্থাৎ ক্রমাগত সংশোধিত হইয়া শেষটা অতি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র আকার ধারণ করে।

তন্ত্রে ইহার নাম 'শোধন'। ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে যে, প্রেমের নানাবিধ স্তর আছে। যেমন,—

প্রথম (চারি আনা বোতল হইতে আট আনা)—দৈহিক কিংবা পাশবিক প্রেম।

খাঁটি। নং ২। অশুদ্ধ প্রণয় প্রভৃতি।

ঐ। নং ১। বিশুদ্ধ প্রণয়।

অতিশয় খাঁটি। (Rectified spirit) ভক্তি, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি।

তাহারও উপর আর জ্ঞান থাকে না।

বেদান্তের কোষের মধ্যে রস পরিপূর্ণ করিয়া মধ্বাচার্য্য উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজ স্বামী নং ½ পান করিতেন। আমরা নং ২ কিংবা সুবিধা না হইলে আট আনা বোতলের প্রার্থী। তান্ত্রিকগণ অতিশয় খাঁটিরও উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ভক্তিমার্গটা মধুর উপর সংস্থাপিত। ওঁ মধু।

প্রেমের মাদকতার অন্য একটা প্রমাণ এই যে, ইহার উপর কর ধার্য্য হইয়াছে। বোধ হয়, প্রেমের বহুল প্রচার বিশ্বের কোনও বিধানের বিরুদ্ধ। তথাপি প্রাণ পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া লোকে প্রেম করিয়া থাকে। ঘটি, বাটি, বস্ত্রাদিতে চারি আনা বোতলের মূল্যও কুলায় না। মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিকাইয়া দিলে হয় ত আট আনা বোতল পর্য্যন্ত। সব ছাড়িয়া মস্তকমুণ্ডন করতঃ, কিংবা জানু পাতিয়া অনিমেষনয়নে,—

"মম শিরসি মুণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং"

ইহাতে নং ১ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, উত্তরোত্তর প্রেমের কর (Duty) বাড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে অনেক মহাজন ইহার ঠিকা লইয়াছিলেন, কিন্তু ফেল মারিয়াছেন। ইতিহাস, বিশেষতঃ বঙ্গের ইতিহাস, ইহার সাক্ষ্য দিবে। প্রেমে Distillery System চলে না। রসের গুদামের মত নদীয়ায় একটা প্রকাণ্ড গুদাম খোলা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহা পরিত্যক্ত হইল। খোলা ভাঁটিই প্রেমের পক্ষে প্রশস্ত।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেমন মদ্য পান করিতে করিতে সর্ব্বস্বহারা হইয়া লোকের জ্ঞানের উদয় হয়, প্রেমেও তাহাই হয়। প্রেমের অনেক দুরবস্থা ইতিহাস প্রতিপাদন করিয়া থাকে। রাজ্যনাশ, বনবাস, ঘোর যুদ্ধ, খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি ইহাতে সচরাচর ঘটে। অনেকে কানা, খোঁড়া

হইয়া গিয়াছে, মূক বধির হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের তৃষ্ণা মিটে নাই।

পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারে বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনীবেশে প্রেম-সুধা বণ্টন করিয়াছিলেন।

পুরাণ, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিলে দেখা যায় যে, প্রেমের মাদকতাশক্তি পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনে হয়। থিয়সফির টীকা অনুসারে, এবং বৈষ্ণবী মতে, পুরুষের 'আনন্দ' নামক অংশ জড়-প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া পরমাণুবর্গের মধ্যে এরূপ একটা গতির উৎপত্তি করে, যাহাতে জীব নামক পদার্থ মাতোয়ারা হন; অনুভব হয় যে, 'ইষ্টে' (yeast) নামক তত্ত্ব আত্মা হইতে আসে।

ধর্ম্ম-ইতিহাসে ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়াবশে, অর্থাৎ উপরি-উক্ত নেশার চোটে, জীব নামক যে দ্বিতীয় পদার্থ অনুভূত হয়, তাহা মায়ারই বিকার মাত্র।

ভক্তগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, এরূপ তর্কও নেশার দ্বারা হয়; কিন্তু সেটা গাঁজার। জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদ ও দ্বৈতবাদকে মাতলামি বলিয়া থাকেন। ভক্তগণ অদ্বৈতবাদকে গাঁজাখুরী বলিয়া থাকেন। গাঁজা তিন প্রকার,— চুর, গোল ও চ্যাপ্টা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মদ ও গাঁজার সংমিশ্রণ, কেবল নেশার তারতম্যমাত্র। ইহার সামঞ্জস্যে ... ভাব কালাচাঁদ, অর্থাৎ অহিফেন। আমাদিগের নবগোপাল দা' তিনটাকে গুলিয়া খাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাস্তবিক নেশা নামক অবস্থা একই; কিন্তু ইহার চরনস্থা বহু। নেশার কালে জ্ঞান হয়, ইহা সত্য। অতএব নেশা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

সকলের পক্ষে এক নেশা খাটে না। সকল পদার্থ হইতে মদ হয় না। ক্যাট্‌খোট্টাগণ গাঁজা খায়। রসিক জীব মদে বিহ্বল হয়। আহ্‌কেন চল্লিশের পর প্রশস্ত। ইহা 'অধিকারী' বিভাগের অন্তর্গত।

তবে নেশা হয় কেন? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, নেশাতে যখন জ্ঞানের সিংহাসন টলিয়া উঠে, তখন আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে ঠিক রাখা পুরুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। নেশার আনন্দ ভাল, নিরানন্দ ভাল নয়। প্রেমেতে যেন বিরহ না ঘটে, জ্ঞানে যেন অহঙ্কার না ঘটে।

টিয়া।

—:•:—

[লা ফঁটেন হইতে।]

টিয়া বলে, গাইতে কেহই—কিছুই না জানে।
দোয়েল কোকিল শ্যামা ঘুঘু যখন ধরে তানে,
টিয়া কাছে গিয়ে করে বিষম কিচিমিচি,
এবং দুটো ডানা তুলে, তারে বলে,—"ছি ছি!"
একদিন পাখীরে দলে মিলে, অনেকখানি ভেবে,
কাছে গিয়ে করযোড়ে কহে শুকদেবে,—
"প্রভুর আলোচনা যেরূপ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদরের গায়ক;
প্রভু একবার দয়া করে' গেয়ে দেখান দিখি
আমরা অধম শিষ্য হয়ে শুনে একটু শিখি।"
টিয়া মাথা চুল্‌কে, ভেবে পায় না বল্‌বে কি যে;—
শেষে বল্লে,—"মহাশয়গণ! আমি—অর্থাৎ—নিজে
বড় একটা গাইনে; তবে—বলতেই বা কি হানি—
মহাশয়গণ।—আমি শুধু 'ছি ছি' কর্ত্তে জানি।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

——:o:——

ভারতীয় উপকথা।

মায়া-পালক।

বাঙ্গালী ভলণ্টিয়ারের বীরদর্পে ভয়-কম্পিত, বিদ্রোহ-বিভীষিকায় উন্মত্ত 'ইংলিশম্যান' পত্রের কার্যালয় হইতে 'জর্ণ্যাল' নামক একখানি পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। Magic Feather—যাহাকে আমরা 'মায়া-পালক' নামে অভিহিত করিতেছি,—ইতিনামধেয় একটি ভারতীয় উপকথা এই পত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন, গল্পটি তিনি এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছেন। ভারত-গবমেণ্টের শাসন-পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ না কি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, গবমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী,—ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিচারে সমভাবে শিক্ষা-বিস্তার। এই শিক্ষার ফলে অধুনা যাহারা গবমেণ্টের বিশ্বাসভাজন ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষ নয়,—বিবেক-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত পশু। এই উক্তির সমর্থনের জন্য বক্ষ্যমাণ গল্পের অবতারণা।

ব্রাহ্মণের উক্তির সমীচীনতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শীলভদ্রের অধ্যাপনায়, ঋষির বনাশ্রমে, অধ্যাপকের টোলে, এমন কি, গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাততাড়ির মধ্যে যে শিক্ষার বীজ নিহিত ছিল, তাহাতে মনুষ্যত্বের মহীরুহ জন্মিতে পারিত,—জন্মিত; কিন্তু ইংরেজের প্রবর্ত্তিত গোলামখানার শিক্ষার বীজে যে পাদপ জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহার বিষে আজ ভারত জর্জ্জরিত, অবসন্ন। ইংরেজের শিক্ষাবিতরণের ব্যবস্থা দেখিয়া আজ আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, 'ভিক্ষা সে বাজ আয়া কুত্তিয়া বোলাও।' যে শিক্ষায় স্বদেশ স্বধর্ম্ম জানিবার চিনিবার অবকাশ নাই, যে শিক্ষা জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় গৌরব, জাতীয় মর্য্যাদা সযত্নে সংগোপন করিয়া রাখিতে কৃতসঙ্কল্প, যে শিক্ষা শক্তি সংবর্দ্ধিত করে না, শক্তির সংহার করে, সে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন কি? শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের জন্য,—বিক্রয়ের জন্য নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং আমরা উপকথাটিকে ভাষান্তরিত করিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিতেছি।

কোনও এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সচরাচর যেমন বিদ্যাদায়িনী বাণীর বরপুত্রেরা কমলার করুণায় বঞ্চিত থাকেন, এই ব্রাহ্মণের ভাগ্যেও সেই সনাতন সত্যের অন্যথা হয় নাই। মনুষ্যত্বের যে মহাবীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাহা আর বিকাশের অবকাশ পাইল না। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর ব্রাহ্মণ ভিক্ষাই আপনার জীবনোপায়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে ভিক্ষা মিলাও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। 'অর্থ-প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ'—ঘটকর্পরের এই উক্তির সার্থকতা ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করিতে লাগিলেন। নিরুপায়, ব্যথিত ব্রাহ্মণ অবশেষে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জনসমাগমশূন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। সেই বৃক্ষের শাখায় এক চকা, আর এক চকী বসিয়া ছিল।

চকা বলিল, 'দেখ চকী! এই যে ব্রাহ্মণ,—এ পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ। আজ অন্নের অভাবে এখানে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।'

চকী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, 'তাই ত, তুমি ইহার কোনও প্রতিকার করিতে পার না?'

চকা বলিল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করিয়া দেখি।'

এই বলিয়া চকা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে বলিল, 'হে ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এখানে এমন ভাবে পড়িয়া আছ?'

সেই জনহীন অরণ্যমধ্যে এই করুণ সম্ভাষণ শুনিয়া ব্রাহ্মণ চকিতদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বৃক্ষোপরি দুইটি পাখী বসিয়া আছে।

এমন সময়ে চকা বলিল, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে ডাকিয়াছি; দেখ, এই পালকটি

তুমি নাও। এই পালকের সাহায্যে তুমি তোমার সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।' এই বলিয়া স্বীয় পক্ষ হইতে একটি পালক উৎপাটন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফেলিয়া দিল।

এত দিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তিনি যে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই, আজ সামান্য একটা পাখীর পালকের সাহায্যে সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, ইহা ব্রাহ্মণের প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া চকা বলিল,—'তুমি কি জান, কেন সংসার তোমার প্রতি এত বিমুখ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, বোধ হয় অদৃষ্ট আমার প্রতি অপ্রসন্ন।'

চকা বলিল,—'তা নয়; সংসারে তুমি যাহাদের দেখিয়াছ, তাহারা মনুষ্যাকার বটে, কিন্তু মানুষ নহে। প্রকৃত মনুষ্যের সংখ্যা সংসারে অতি অল্প। তুমি প্রকৃত মানুষের কাছে গেলে সাহায্য পাইতে পারিবে।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'এই মানুষ ও পশুর প্রভেদ আমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব?'

'এই পালক তোমাকে সেই পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে, এই পালকটি তুমি দক্ষিণ কর্ণে গুঁজিয়া রাখিও, তাহা হইলেই তুমি সব দেখিতে পাইবে।' এই বলিয়া পাখী দুইটি উড়িয়া গেল।

বিস্ময়বিহ্বল ব্রাহ্মণ পাখীর বাক্যের সত্যতা-পরীক্ষা-মানসে ধীরপদে জনপদাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক সভার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তোরণদ্বারে দ্বারী বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ পালকটি দক্ষিণ কর্ণে স্থাপিত করিলেন। অমনই তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, দ্বারপালের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দেহ মানুষের মত, কেবলমাত্র মুখটি শৃগালের অনুরূপ। বহু লোক নগরে যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কাহারও মুখ কুকুরের ন্যায়, কাহারও বা মার্জ্জার, শৃগাল, শার্দ্দূলাদির ন্যায়। বিস্ময়ে অভিভূত ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, হয় তাঁহার মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ ঘটিয়াছে, অথবা তিনি কোনও অতিপ্রাকৃত জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্তে শঙ্কার সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ কান হইতে পালকটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, সকলেই মনুষ্যাকৃতি।

পালকটি পুনরায় কর্ণোপরি স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সেখানেও সব ঐ রকম। কাহারও সাপের মত মুখ, কাহারও কাক, চিল, হাঁস, পায়রার মত, কাহারও বা শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর মত। কিন্তু মানুষের মত মুখশ্রী তাহাদের কাহারও নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতূহলী ব্রাহ্মণ নগর-প্রান্তে এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে তিনি এক জন প্রকৃত মানুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। সে ব্যক্তি এক জন চর্ম্মকার। এক জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ করিতেছে।

বিস্ময়ে আনন্দে ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আঃ! এতক্ষণে এক জন মানুষ দেখিতে পাইলাম।' আগন্তুকের কথা শুনিয়া চর্ম্মকার কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং ব্রাহ্মণের এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, জিজ্ঞাসা করিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'দেখ, আমি এক জন ব্রাহ্মণসন্তান। পেটের দায়ে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আশা ছিল, এখানে নিশ্চয়ই কোনও একটা কাজ করে অন্ন যোগাড় করিতে

পারিব। কিন্তু কাজ কর্ম্ম দূরের কথা, সামান্য কিছু ভিক্ষাও আমি কাহারও কাছে পাই নাই। এক্ষণে ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি যদিও নীচজাতীয়, তথাপি এই অবস্থায় তোমার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমি গত্যন্তর দেখিতেছি না।'

ঠাকুর! আমি গরীব মুচী; ঘরে স্ত্রী আছে, চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। রোজ দুই আনা পয়সা পাই; তাতেই কোনও রকমে আধপেটা চলে। তা হ'লেও আপনি যখন আমার কাছে এসেছেন, তখন—আমার ত বেশী সাধ্য নাই,—দুই আনার পয়সা আমি আপনাকে দিতে পারি। আর, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব, যাহাতে আপনার কোনও একটা কাজ কর্ম্মের যোগাড় হয়।'

ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারের বদান্যতার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, এবং সেই দুই আনার পয়সা আপনার জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করিলেন।

চর্ম্মকার সেইখানকার রাজার জন্য এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিয়াছিল। সে পর দিন প্রাতে সেই জুতাজোড়াটি লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা সেই সূচীকশিল্প-খচিত পাদুকা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং চর্ম্মকারকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিতে আদেশ করিলেন।

চর্ম্মকার সবিনয়ে সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল যে, তাহার একটি প্রার্থনা আছে। মহারাজ তাহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করিলে সে আপনাকে সমধিক পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত মনে করিবে।

রাজা তাহার প্রার্থনা অবগত হইতে চাহিলেন। চর্ম্মকার তখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুরবস্থার কাহিনী রাজসকাশে নিবেদন করিল; এবং রাজসরকারে তাঁহাকে কোনও একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিল। রাজা দরিদ্র চর্ম্মকারের এই পরোপকারপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন।

পর দিন ব্রাহ্মণ পালকটি কানে গুঁজিয়া চর্ম্মকারের সঙ্গে রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! স্বয়ং রাজার মুখটিই শৃগালের মত। রাজপারিষদদিগের মুখও বিভিন্ন প্রকার ইতর প্রাণীর ন্যায়! মানুষের মুখ তাহাদের এক জনেরও নাই।

রাজা ব্রাহ্মণের শিক্ষার পরিচয় লইয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ হিসাবপত্রে বিলক্ষণ পটু। তিনি তাঁহাকে খাতাঞ্চিখানার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণও এই সৌভাগ্যলাভে অতিশয় পুলকিত হইলেন, এবং উপকারী চর্ম্মকারকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দিলেন।

ব্রাহ্মণ পরিশ্রমী, কর্ম্মপটু ও সুচতুর। অল্প দিনেই তিনি রাজার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কিছু দিন এই ভাবে কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার অত্যধিক অনুগ্রহ দেখিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ব্রাহ্মণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত করিবার ষড়যন্ত্র করিল।

রাজার নিয়ম ছিল, প্রতি মাসেই তিনি স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণের শত্রুরা ইতোবসরে কতকগুলি অপ্রকৃত খরচ হিসাবপত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিল।

পর মাসে নিকাশের সময় সেই সমস্ত অপ্রকৃত খরচের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

রাজা ব্রাহ্মণকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করিলেন। হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কোনও সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষে চকা চকীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, চকা চকী শাখায় উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'হে ধীমান্! আজ আমি বড় বিপন্ন হইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি।'

চকা বলিল, 'আবার কি বিপদ? তুমি উচ্চপদ পাইয়াছ, রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছ, তোমার আবার বিপদ কি?'

ব্রাহ্মণ আপনার বিপদের কাহিনী বিবৃত করিলেন। শুনিয়া চকা বলিল, 'আচ্ছা, এইবার যদি কেহ তোমাকে বিপন্ন করিবার জন্য উক্তরূপ উপায় অবলম্বন করে, তবে তুমি রাজাকে বলিও যে, তাঁহার কর্ম্মচারীরা সকলেই পশু। তোমার প্রতি রাজার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি আছে বলিয়া তোমার সততা ও সুনাম কলঙ্কিত করিবার জন্য তাহারা হিসাবপত্রে ঐ সকল অপ্রকৃত ব্যয় সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ ঐ পালকটি রাজাকে তাঁহার দক্ষিণ কর্ণোপরি স্থাপন করিতে বলিও।'

পর মাসে রাজা পুনরায় যখন হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখনও সেই সকল ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল। ক্রুদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণকে অকৃতজ্ঞ, তালিয়াৎ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে তহবিল তছরূপাতের অভিযোগ আরোপিত করিলেন।

ব্রাহ্মণ সভয়ে বিনীতভাবে চকার নির্দ্দেশমত সমস্ত কথা রাজসমীপে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন,—'কি! আমার কর্ম্মচারী সকলেই পশু!'

ব্রাহ্মণ সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ! আপনার কর্ম্মচারীরা সকলেই পশু। এমন কি, মহারাজের মুখটিও শৃগালের অনুরূপ।'

বিস্ময়ে, ক্রোধে, অপমানে কম্পিতকলেবর রাজা রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, 'যদি তোমার উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতে তুমি অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার কি শাস্তি হইবে, জানো? ঘাতকের কুঠারাঘাতে তোমার মস্তক দেহচ্যুত হইবে।'

ব্রাহ্মণ কম্পিতহস্তে পালকটি রাজ-করে অর্পণ করিয়া, দক্ষিণ কর্ণোপরি তাহা স্থাপন করিতে বলিলেন। স্থাপন করিবামাত্র বিস্ময়-বিমূঢ় রাজা দেখিলেন, রাজমন্ত্রীর মুখশ্রী কুকুরের ন্যায়। দর্পণের প্রতি চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার নিজের মুখটিও শৃগালের অনুরূপ, এবং তাঁহার পারিষদবর্গের মুখাবয়বও বিভিন্ন ইতর প্রাণীর ন্যায়। রাজার বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইল। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ করিয়া রাজা উঠিয়া গেলেন; এবং শীঘ্রই তীর্থযাত্রা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাহাতে আমি মনুষ্যের মুখশ্রী পাইতে পারি, তাহার কোনও উপায় কি তুমি করিতে পার না?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি স্বয়ং ইহার কোনও প্রতীকার করিতে পারিব না; কিন্তু যে চকা চকীর অনুগ্রহে আমি এই অদ্ভুত তথ্য জানিয়াছি, সেই চকা চকীর নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।'

গভীর রাত্রে যখন সমস্ত নগরবাসী সুপ্তির অঙ্কে শায়িত, মন্দভাগ্য রাজা তখন ব্রাহ্মণকে

সঙ্গে লইয়া সেই নির্জ্জন বনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই পবিত্র বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষোপরি পাখী দুইটি বসিয়া আছে।

আগন্তুকদ্বয়কে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার অবকাশ না দিয়াই চকা বলিল, 'আমরা তোমাদের আগমনের কারণ অবগত আছি।' রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'যাও, তোমার সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে দূর করিয়া দাও, এবং এই ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মানিত ও পুরস্কৃত কর। তাহা হইলেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।'

পর দিন রাজতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইলেন, এবং রাজপুরে গণদেবতার অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইল। রাজার ক্ষোভের বা আক্ষেপের কোনও কারণ রহিল না।

বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান।

বিগত ১৫ই জুন দার্জ্জিলিঙ্গের 'লুইস্ স্যানিটেরিয়মে' 'ভারতীয় অনুসন্ধান-সমিতি'র এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে রায় শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর 'বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান' শীর্ষক একটী উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা নিম্নে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মতে, পুরুষ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে রমণীরত্ন লাভ করিয়াছে। রমণী স্বর্গের দান। বিধাতা প্রথমে পুরুষকে গড়িয়াছিলেন। তার পর পুরুষের বক্ষঃপঞ্জর লইয়া রমণীর সৃষ্টি করেন। নারী হইতেই আবার পুরুষের অধঃপতন সংঘটিত হয়।

হিন্দুর পুরাণে মানবজাতির উৎপত্তি-রহস্য সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুর কল্পনা হিব্রুজাতির কল্পনা অপেক্ষা বহু উচ্চ। প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবের আদি জনক-জননীকে এক-দেহাত্মক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষিণাংশ জনক বা পুরুষ, বামভাগ জননী, বা নারী। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা বামভাগ গৌরবর্ণ ছিল। এই যুগলমূর্ত্তির নাম 'গৌরী-শঙ্কর'। স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করেন। 'গৌরী-শঙ্কর' রূপক। কিন্তু জীব-সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় সত্য এই রূপকে নিহিত আছে। 'গৌরী' অর্থে প্রকৃতি, বা জননী; 'শঙ্কর অর্থে পুরুষ, বা জনক। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মানবজাতির অভ্যুদয়। এই 'গৌরী-শঙ্করে'র রূপক-কল্পনায় পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের কি সুন্দর বিশ্লেষণ! কিন্তু পরিণয় ব্যাপার ত্রিদিবধামে সংঘটিত হয় নাই, মর্ত্ত্যলোকেই সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত হইতে [illegible] বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে নর-নারীর আত্মায় আত্মায় যে মিলন হয়, স্বর্গলোকে গমনের পর তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। তখন উভয়ের একই দেহ, একই আত্মা। স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পায়। খৃষ্টানের বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান প্রথমে পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সুখ ও সুবিধার জন্য পরে নারীর উৎপত্তি। কিন্তু হিন্দু তাহা বলেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা একই সময়ে নর-নারীর সৃষ্টি করেন। তাই তিনি উভয়কে স্বামী স্ত্রী রূপে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীর সখা, স্ত্রী স্বামীর সখী।

বিস্ময়ের বিষয় এই, নারীজাতি সম্বন্ধে হিন্দুর এই মতের সহিত ইংরাজের মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অর্দ্ধাঙ্গের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না করিয়াও ইংরেজ পত্নীকে শ্রেষ্ঠার্দ্ধ (better

half) সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শঙ্করের শ্রেষ্ঠার্দ্ধ অর্থাৎ সুন্দরতর অংশ গৌরী (সুন্দরী)। আর্য্যগণ রমণীর মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্য বিরাট আর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা হইতে যে যে জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সকলেই রমণীকে সম্মান করিতেন, এবং তাহাকে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আদিমকালের মিশরবাসী, গ্রীক্, রোমক, ইরাণী ও ভারতবাসী, সকলেই জাতীয় উন্নতির যুগে রমণীকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। ইরাণী জাতির বর্ত্তমান বংশধরগণ এখনও রমণীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জাতীয় অধঃপতনের যুগে ভারতবাসী বৌদ্ধদিগের সংস্কার ও সেমিটিক জাতির ভাবরাশির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।* তাহার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইলেন, নারীকে পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নারী যে পুরুষের সমকক্ষ, তাহা বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে যে আদর্শের কল্পনা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর মস্তিষ্কে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন। নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে, অর্থাৎ তাহার কোমল সুন্দর প্রকৃতির উৎকর্ষ-সাধনে ভারতবাসী ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যসমাজ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম রমণীকে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিদান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের মতে নারীসংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে প্রসববেদনাক্লিষ্ট অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। বুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি, পুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, এই মত প্রচার করেন। নির্ব্বাণ মানবের চরম লক্ষ্য, উহা লাভ করিতে হইবে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ পত্নী ও সন্তানে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক, স্ত্রী পুত্রের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, সে বিষয়ে কাহারও চিন্তা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ৪৬ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধ এই মত জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

রমণীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল ও দুর্ব্বল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে নারী পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব জন্মান্তরে পুরুষ-দেহ-প্রাপ্তির জন্য তাহাকে তপস্যা অর্থাৎ পুরুষোচিত গুণের অনুশীলন করিতে হইবে। নারীজন্মে সে কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে [illegible] না। সুতরাং নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইবার তাহার কোনও অধিকার নাই। যদি সে নির্ব্বাণ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে পরজন্মে পুরুষ হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে। নহিলে নির্ব্বাণের পথ তাহার পক্ষে রুদ্ধ। এই কারণে প্রথমতঃ বুদ্ধ রমণীকে ভিক্ষু-সম্প্রদায়-ভুক্ত করিতে চাহেন নাই; কেবল পুরুষকে ভিক্ষু হইবার অধিকার দান করিয়াছিলেন।

মগধ রাজ্যের জনসাধারণ ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধের প্রচারিত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পরে তিনি মঠ বা সন্ন্যাসাশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগরে গমন করেন। তখন তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী ও ধাত্রী মহাপ্রজাপতি ভিক্ষু-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব প্রথমতঃ তাঁহাদের এই সানুনয় প্রার্থনা

পূর্ণ করিতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু পরিশেষে আনন্দের অনুরোধে নারীদিগকে মঠে বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন। রমণীর পক্ষে মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনীদিগের পক্ষে কঠোরতম নিয়মপালনের ব্যবস্থা হইল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর আনন্দকে এই জন্য বহু নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। আনন্দের অনুরোধেই বুদ্ধদেব নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বনের অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, মহাকাশ্যপ প্রকাশ্যভাবে আনন্দকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি কয়েক বৎসরের জন্য অর্হত-পদ-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। বৌদ্ধ নারীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রম কোনও কালে উন্নতিলাভ করে নাই। অতীত যুগে ভারতবর্ষে বা অন্য কোনও স্থলে এই প্রথা আদৃত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তীর্থস্থল। এখানে অসংখ্য মঠ বিদ্যমান ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যাও গণনাতীত ; কিন্তু এখানেও সংসারত্যাগিনী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা সহস্রাধিক নহে। চীন, জাপান, ব্রহ্ম, বা শ্যাম সিংহলেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীজাতির অস্তিত্বলোপই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল লক্ষ্য, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান দেশে সন্ন্যাসিনী নারীর সংখ্যা অতি সামান্য হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ! ভারতীয় আর্য্যগণ বুদ্ধের প্রচারিত এই মত গ্রহণে সম্মত হন নাই। নারী যে পুরুষের অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, নিকৃষ্ট,—ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। নারীর প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিতৃষ্ণা দেখিয়া আর্য্যগণ উহা পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিল, সুতরাং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থায়ী হইতে পারিল না। নিম্নশ্রেণীর লোক এই ধর্ম্ম বিশেষ সুবিধাজনক দেখিয়া উহা বরণ করিয়া লইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকগণের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশেও তাহাদের কুণ্ঠার উদয় হইল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত কিছুকাল নিষ্ফল প্রতিযোগিতা করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে কতিপয় বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজক ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক প্রকার নূতন মত ও সাধনপদ্ধতি ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা এই সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভিত্তির উপর মহাযান প্রতিষ্ঠিত হইলেও, এই সংস্কৃত ধর্ম্মমতের মূলে নিষ্কাম পরোপকার প্রচ্ছন্ন ছিল। নূতন মতের আবরণে বৌদ্ধধর্ম্ম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মাবলীর কঠোরতার হ্রাস হওয়ায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দুর্নীতি সংক্রামিত হইতে লাগিল। ইহাতে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিতে দিতেন না।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকগণ অবশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। নিম্নশ্রেণীর লোক অলৌকিক ব্যাপারের পক্ষপাতী। বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আবরণে তান্ত্রিক মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক মতে অসাধ্য সাধন করা যায়, ইত্যাদি মিথ্যা আশায় তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের মতে রমণী সঙ্গই নির্ব্বাণলাভের প্রধান উপায়। সাধনকালে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে (কাপালিক) সুরাপান ও নারীসঙ্গ করিতেই হইবে। নহিলে সাধনা ব্যর্থ ; নির্ব্বাণলাভ অত্যন্ত অসম্ভব। তান্ত্রিকের মতে এই উপায়ে অতি সহজে ও অল্পকালমধ্যে নির্ব্বাণলাভ হইয়া থাকে। অধুনা বৌদ্ধ ঋষিগণ অবিদ্যা ও শৌণ্ডিকের আলয় যোগসাধন করিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য স্থানে স্থানে তাহারা তাড়িখানা স্থাপন করিয়াছেন। উহার ভারও এক একটি অবিদ্যার হস্তে ন্যস্ত। তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইলে, হাড়ি, ডাম ও শবর প্রভৃতি অতি নীচ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্য হইতে দলে দলে অলৌকিক শক্তিশালী ঋষির আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাহাদের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-

কলাপে অনেকে মুক্ত হইল। বৌদ্ধধর্মের পতনে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে ইস্লাম্ ধর্ম একেশ্বরবাদের প্রচার করিতে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়। তাহার ফলে, অসংখ্য অধঃপতিত ভারতবাসী,—তপগার্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ যাহাদিগকে পদধূলিদানেও কৃপণতা প্রকাশ করিতেন,—ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের এক বিন্দু পদরেণু পাইলে ধন্য হইত; তাহাদের তখন বিশ্বাস ছিল, উহাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

——:•:——

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ "বয়কট" প্রবন্ধে সঙ্ক্ষেপে 'বয়কটে'র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে 'অবাধ-বাণিজ্যে'র মূলসূত্রের আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে, 'বয়কট' ন্যায়সঙ্গত,—ভারতবর্ষের পক্ষে আবশ্যক। স্বাধীন দেশে স্বদেশী বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য 'প্রোটেক্শন' প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে 'বয়কট' সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন,—"আমেরিকা অস্ত্রবলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে তাহা করিবে না, কে বলিতে পারে?" কিন্তু এ দেশের রাজশক্তি বয়কট চূর্ণ করিবার জন্য বজ্র উদ্যত করিয়াছেন। আমরা যদি সেই বজ্রে চূর্ণ না হই, স্বয়ং মথিত হইয়াও বয়কট রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে কালে বয়কটের ফল ফলিতে পারে। অস্ত্রবল অতিক্রম করিবার শক্তি নিরস্ত্র বয়কটের নাই। আমেরিকাও অস্ত্রবলে বয়কট রক্ষা করিয়াছিল। এ দেশে তাহা সম্ভব নহে। সামাজিক শাসনই আমাদের বয়কটের একমাত্র রক্ষা-কবচ। দেখা যাইতেছে, গবমেণ্ট তাহারও বিরোধী। লেখক প্রবন্ধে এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করেন নাই। "নেপালে বৌদ্ধ-মন্দির" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নেপালী বৌদ্ধমন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন,—"এরূপ অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি ভারতে আর কুত্রাপি নাই।" শ্রীযুত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত "জাতীয় শিক্ষার উপাদান" প্রবন্ধে শিক্ষাসমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহার বক্তব্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। "জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা গুরুতর সমস্যা', সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, সমাধানে প্রবৃত্ত হন নাই। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রীর "হাঁচির কথা" কৌতুকাবহ। "প্রাচীন পুরাণে" শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বৈদিক উপাখ্যানের সহিত পৌরাণিকী কথার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সারগর্ভ। শ্রীযুত রামলাল সরকারের "পেকিং রাজপুরী" উল্লেখযোগ্য। চীনের রাজধানীর চৈনিক নাম;—'পে-চিন'; 'পে'=উত্তর; 'চিন'=নগর, বা রাজধানী; অর্থাৎ, "উত্তর রাজধানী।" লেখক এই প্রবন্ধে চীনের রাজধানীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন ঘোষের "ঐতিহাসিক বীরগাথা" পদ্য বটে, কিন্তু গাথা নহে। কবিতার ভাষায় ও ছন্দে লেখকের অধিকার নাই।—

"শুনি সেই বাণী, আপনা আপনি, লাফায়ে পড়িল মধ্যে।
আজি নিশিভোরে, স্থির শত্রুরে, বিতাড়িব ঘোর যুদ্ধে।"

নিতান্তই "যা পদ্য যা মিলে যা, নেবুর পাতায় করম্চা!" শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "আমার ডাক্তারী" নামক অতিসংক্ষিপ্ত গল্পে সফল হইতে পারেন নাই। এই গল্পের আখ্যানবস্তু যেমন অকিঞ্চিৎকর, তেমনই কৃত্রিম। ভাষাও সেইরূপ। "তন্দ্রা" আর একটি ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পের লেখক। সেই মামুলী প্রেমের কাহিনী,—অত্যন্ত পুরাতন, অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন। রচনায় সর্ব্বত্র চেষ্টার পরিচয় পরিস্ফুট, কিন্তু সে চেষ্টা সফল

হয় নাই। বিফল চেষ্টা কণ্টকের মত গল্পটিকে কেবল কণ্টকিত করিয়াছে। লেখকের ভাষা মন্দ নহে। আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে বিষয়-নির্ব্বাচনে সাবধান হইবেন। এই বিপুল বিশ্বে নর-নারীর গহন চিত্তবনে কত ফুল ফুটিতেছে, ঝরিতেছে। কিন্তু শিক্ষানবীশ বাঙ্গালী কবি বন-প্রান্তে সঙ্কীর্ণ প্রেমের কাটগোলাপ দেখিয়াই মুগ্ধ হন, এবং আর অগ্রসর না হইয়া তাহাই চয়ন করেন। জীবনের প্রকৃত সুখ দুঃখ গভীর গহনে ফুটিয়া ঝরিয়া যায়; বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য-মালঞ্চের মালীরা সে সব ফুলের কোনও সন্ধান রাখেন না। এই জন্য এখনকার সাধারণ গল্পে আন্তরিকতা ও সমবেদনার এত অভাব। কৃত্রিম সোমের ফুলে মানসী দেবতার পূজা হয় না। লালসাই মানব-চিত্তের একমাত্র বৃত্তি নহে। নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধই বিপুল বিশ্বের একমাত্র চিত্র নহে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে চাষা লেখকগণ কেবল স্থূল লালসারই চাষ করিতেছেন, এবং 'প্রেম' নাম দিয়া তাহাই ভবের হাটে বিক্রয় করিতেছেন। সমাজের কোনও উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, স্বদেশী, বয়কট, রাজনিগ্রহ ও লাঞ্ছনা প্রভৃতি সামাজিক বিষম বিপ্লব ও দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে তাঁহারা গল্পের বস্তু দেখিতে পান না! তথাকথিত প্রেমের প্রেত ও লালসার প্রেতিনীই বাঙ্গলা গল্পের নায়ক নায়িকা। গল্পের,—সাহিত্যের পরিধি এত ক্ষুদ্র নহে; মানব-জীবনের প্রসার এত সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহারা সাহিত্যে মানব-জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া কারবার করিতে চান, তাঁহারা ক্ষুদ্রতার চশমা খুলিয়া দিয়া মানব-জগতের বিপুল বিচিত্র সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত হউন। ক্ষুদ্রতার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বিশাল মানব-সাহিত্যের উপাদান নহে। "শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী—দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ" সময়োচিত ও তথ্যপূর্ণ বটে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। কিন্তু যাঁহারা দেশলাই প্রস্তুত করিতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধে অনেক সন্ধান পাইবেন। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "জ্যোতির্নির্ব্বাণ" নামক উপন্যাস সমাপ্ত হইয়াছে। "মৃদ্‌ভক্ষণে"—লেখক লিখিয়াছেন, পৃথিবীর নানা দেশে মৃদ্‌ভক্ষণপ্রথা প্রচলিত আছে। একবার মাটী খাইলে ক্রমাগত খাইবার ইচ্ছা হয়। পরে আর অভ্যাস ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে না। তাই বোধ করি বাঙ্গালী অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছে না,—ক্রমাগত মাটী খাইতেছে, মাটী হইতেছে। মৃদ্‌ভক্ষণের পরিণাম শোচনীয়,—"প্রথমে রোগ, পরে অকালমৃত্যু এই অভ্যাসের অনিবার্য্য ফল।" শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের "উদ্ভিদের বৃদ্ধি" উল্লেখযোগ্য,—আনন্দের সহিত শিক্ষালাভের সুযোগ আছে।

বঙ্গদর্শন। চৈত্র। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাহিত্য-পরিষদ" নামক প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—"সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্ন-উপার্জ্জন, জ্ঞানশিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার হাজার লোক মাটীর নীচেকার শিকড়ের মত প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য্য। * * * * ম্যাট্‌সীনি, গারিবল্ডী, হাম্প্‌ডেন, ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড় কাজ, তাহা নহে; তাহার পূর্ব্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমহাশয়, পাড়ার মুরুব্বী, চাষাভূষার সর্দ্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কি হিসাবে বড় কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না—এ সমস্ত গোড়াকার কাজ —ইহার ছোট বড় নাই। দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্ত্তব্য দেশকে জানা—এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্নতন্ন করিয়া জানিতেছে। না

জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই জানিবার চর্চ্চাই ভালবাসার চর্চ্চা। দেশের ছোট বড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিতসম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড়-বড় কথা বার্ক-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়। তাই দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক্ দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা, আর এক সিদ্ধির সফলতা।" শ্রীযুত শারদানন্দ স্বামী "স্বদেশী ব্রত" নামক সুলিখিত সুচিন্তিত আন্তরিকতাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম—সত্য, পুণ্য ও নিষ্কামকর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি, তবেই আমাদের মধ্যে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। পৃথিবীতে আমরা স্বাধীন, মহান্ ও পূজনীয় হইব, এবং পূর্ব্বে যেমন আমরা জগতের আদর্শস্থানীয় ও গুরু ছিলাম, সেইরূপই হইয়া উঠিব। অন্যথা আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের "প্রাদেশিক সমিতি" সাময়িক রচনা, অসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "রাজতপস্বিনী" উপভোগ্য, কিন্তু মাত্রা বড় অল্প। শ্রীযুত বনমালী বেদান্ততীর্থের "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা" বিশেষজ্ঞের উপযোগী। সাধারণ পাঠকের দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই। "রাইবনী দুর্গ" উপন্যাসের দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু প্রাঞ্জল মধুর স্বচ্ছ ভাষায় লেখকের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিতেছি। শ্রীযুত গিরিজানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মুক্তকণ্ঠ" কবিতায় ভাষার ঝঙ্কার আছে, কিন্তু পুরাতন ভাবের নূতন প্রতিধ্বনি—মামুলী প্রেম-তন্ময়তার উচ্ছ্বাসই কবিতার সর্ব্বস্ব নয়।

জাহ্নবী। চৈত্র। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেন বিশ্বধাত্রীকে 'রাঙ্গা মেয়ে' কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

> "কিংশুকের দাগে দাগে, অরুণের রাগে,
> রাঙ্গা মেয়ে! ঐ তোর রাঙ্গা মুখ জাগে।"

কবি "তেন সর্ব্বমিদং ততম্" এই মহাবাক্য কমনীয় কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন শ্রীযুত শশধর রায় "স্বপ্ন" প্রবন্ধে বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক মূলের অনুসন্ধান করিতেছেন। কবি বলিয়াছেন,—"সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই আগা।" বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, স্বপ্নের আদি ও অন্ত বিজ্ঞানের প্রমাণে ধরা পড়িতে পারে। শ্রীযুত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের "ভাবান্তর" নামক সুন্দর কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

> "হা ধরণী! কোথা তোর সে সুষমারাশি,
> ছায়ালোকে স্নিগ্ধ-দীপ্ত নিখিলরঞ্জন?
> কোথা শ্যাম-জল বনের ঢল-ঢল হাসি,
> বর্ণ-রাগ গীত-গন্ধ চিত্ত-সম্মোহন?
> আজি মনে হয়, হায়! তোর মাতৃকোল
> তপ্ত-ভস্মে সমাকীর্ণ অতীতের চিতা।
> সদ্যঃপাতী এ সুষমা—জীবন-হিল্লোল
> শুধু নিমেষের স্বপ্ন। হে চির-বাধিতা!
> তুমি গড়িতেছ নিজ সর্ব্বস্ব দিয়া
> কামনার স্বর্ণ-স্বর্গ দিবা-অপরূপ!
> অলক্ষ্যে সংহার-দণ্ড হানিয়া হানিয়া
> মৃত্যু রচিতেছে তাহে মহা ভস্ম-স্তূপ।
> তাই তোর বক্ষে বহে অকূল পাথার
> অনন্ত নালাম্বু-নিধি—মাতৃ-অশ্রুজল!"

শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দত্তের "মৃত্যু-বধূ" নামক চৈনিক গল্পটির আখ্যানবস্তু সুন্দর,—মর্ম্মস্পর্শী।

———:•:———

মাগো ! প্রাণ যে যায় !

রোগের ভীষণ যাতনায় এ আকুল আর্ত্তনাদ সকল সংসারেই শুনিতে পাওয়া যায়। এ কাতর ক্রন্দন শুনিতেও প্রাণ ব্যথিত হয়, রোগীর যাতনা দেখিয়াও স্থির থাকিতে পারা যায় না। যৌবনের অবিবেচনাসম্ভূত রোগসমূহে রোগী নীরবে নির্জ্জন গৃহে এইরূপ হৃদয়ভেদী চীৎকার করে, আর লজ্জায় নিজের রোগের কথা অপরকে বলিতে না পারায়—অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিতে থাকে—

কেহ কি রক্ষা করিবার নাই ?

কিন্তু এ আক্ষেপোক্তি গৃহকোণে বসিয়া করিলে কি হইবে? যখন রোগ হইয়াছে, তখন তাহার ঔষধও আছে, বুঝা উচিত। যখন দেহে সাংঘাতিক বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়া-সাধক ঔষধও আছে। বিষ আবার যে সে বিষ নহে। উপদংশ-বিষ অতি ভয়ানক;—ইহা বংশানুক্রমে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। উপদংশ ক্ষতের যাতনার কথা আর কি বলিব—

দস্যুর ভীষণ সাংঘাতিক অস্ত্রে

আপাদমস্তক জর্জ্জরিত হইলেও বুঝি এত কষ্ট হয় না। লজ্জায়, নীরবে, অনেক অপরিণামদর্শী যুবক, যত্র তত্র স্থানে গুপ্তে প্রাপ্য ঔষধ [illegible] ও [illegible] [illegible] সেবন করিয়া রোগকে জটিল করিয়া তুলেন। তখন মনে ভাবেন— —এমন রোগ হইতে আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ইহাতেই—

বুঝি এ জীবনের শেষ !

কিন্তু রোগীর উপাধানের নিম্নে—যে সুধাপাত্র রহিয়াছে, তাহাতে রোগীর দৃষ্টি নাই। দুই বিন্দু অমৃত যে দেবভোগ্য ও সর্ব্বরোগবিনাশক। অমৃতে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে—বিষকে অমৃত করিয়া তুলে। এ অমৃত দেবাসুরের মন্থিত সমুদ্রজাত অমৃতের অনুরূপ। এ অমৃত আমাদের আসমুদ্র ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলে বিখ্যাত "অমৃতবল্লী-কষায় !" উপদংশের সকল অবস্থায় ইহা সমানভাবে উপকারী। পারদদোষজাত ক্ষত আরাম করিতে [illegible] অমোঘ। শরীরে নূতন বল, স্ফূর্ত্তি ও শক্তি আনিয়া দিতে ইহা অদ্বিতীয়। যাহারা এই ভীষণ রোগে বা ইহার পরবর্ত্তী কষ্টকর উপসর্গ সমূহে ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অমৃতবল্লী কষায় ও বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। মূল্য প্রতি শিশি—অমৃতবল্লী কষায় ১॥০ দেড় টাকা, ৬জন ৯৲ পনর টাকা। বৃহৎ অমৃতবল্লী-কষায় প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ৬জন ২০৲ কুড়ি টাকা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত কবিরাজ।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড; কলিকাতা।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

২য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
১২। বিষবৃক্ষ	১৷০	১৭। ইন্দিরা	১৷৷০
১৩। আনন্দমঠ	১৷৷০	১৮। কৃষ্ণচরিত্র	৩৲
১৪। কপালকুণ্ডলা	[illegible]	১৯। লোকরহস্য	১৷০
১৫। চন্দ্রশেখর	১৷৷০	২০। বিবিধ প্রবন্ধ	২৲
১৬। রাজসিংহ	২৸০	২১। পদ্য-গদ্য	৷৷০

সর্ব্বসাকল্যে মোট ১০ খানি পুস্তক ১৭৲ টাকা মূল্যের। এক্ষণে, পৃথক লইলে কেবল ৩৲ তিন টাকা মাত্র মূল্যে পাইতেছেন। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ সহ সাড়ে তিন টাকা মাত্র; কাপড়ের বাঁধান ৩৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

৩য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
২২। শ্রীমদ্ভগবৎগীতা (সমগ্র বঙ্কিমের ব্যাখ্যা)	২৲	২৫। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	১৲
২৩। সাম্য	৷০	২৬। বিবিধ বিষয়	৷৷০
২৪। বিজ্ঞানরহস্য	৷৷০		

এই পাঁচখানি পুস্তকের মূল্য ৪৷০ টাকা, ইহা কেবল ৸০ আনায় বিক্রয় করিতেছি। ডাকমাশুল ৶০ আনা; বাঁধান ১৲ টাকা।

দেখুন!

এক্ষণে উক্ত তিন ভাগে সম্পূর্ণ সমগ্র উৎকৃষ্ট সংস্করণ ভাল কাগজে সুন্দর ছাপা সমগ্র তিন ভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেবল ৫৲ টাকায় দিব, রাজসংস্করণ ৬৲ টাকা। পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থাবলীর মূল্য উপরে লিখিত হইল। একত্র সমগ্র তিন ভাগ গ্রন্থাবলী না লইলে এতাধিক সুলভে পাইবেন না। তিন ভাগের মাশুলাদি ১৲ এক টাকা। মোট ৬৲ ছয় টাকা দিলেই ঘরে বসিয়া এই রত্নভাণ্ডার পাইবেন।

সত্বর না লইলে এ সুযোগে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী কার্য্যালয়;—

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অশোকারিষ্ট।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকের প্রাধান্য সহস্রবার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অশোকছাল এবং অন্যান্য কতকগুলি স্ত্রীরোগ-নাশক ভেষজ উপাদানের সাহায্যে সমিতির কবিরাজমণ্ডলী এই অকৃত্রিম "অশোকারিষ্ট" প্রস্তুত করিয়াছেন। "অশোকারিষ্ট" সেবনে স্ত্রীদিগের অষ্টিলা, গুল্ম এবং কষ্টকর বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আশু নিবারিত হয়। যাঁহাদের অজীর্ণ বা অম্লরোগ আছে, সুতরাং দ্রব্য সহজে হজম হইবে না, তাঁহাদের পক্ষে "অশোকারিষ্ট" ও "ঋতুবান্ধব বটিকা", একত্র সেবন করিবে। উপরোক্ত তিন প্রকার ঔষধ ব্যবহারে যেরূপ স্ত্রীরোগই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইতেই হইবে।

মূল্য [illegible] বোতল [illegible] ; ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

উক্ত তিন প্রকার ঔষধ একত্রে [illegible] ডাঃ মাঃ ৸৵০।

শ্বাসারি বটিকা।

শ্বাস ও কাশ রোগের কষ্টদায়ক যন্ত্রণা নিবারণ করিতে এই "শ্বাসারি বটিকা" যেরূপ আশু ফলপ্রদ, এরূপ ঔষধ অতি বিরল। অনেকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার বিজাতীয় ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, আয়ুর্ব্বেদে শ্বাস রোগ নিবারক কত অমূল্য ঔষধ রহিয়াছে, যাহা সেবনমাত্রই হাঁপানীর কষ্টের উপশম উপলব্ধিত হয়। এই শ্বাসারি বটিকা সামান্য সর্দ্দি কাসিতে যেরূপ উপকারী, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা রোগেও তদ্রূপ। ইহা ব্যবহারে শ্বাস কাশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শ্বাস প্রণালীর রোগের যাবতীয় উপসর্গ সত্বর দূর হয়, এবং কয়েক দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল ।০ চার আনা।

সর্ব্বজ্বরঘ্ন বটিকা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ৩২টী জ্বর-সংহারক গাছ-গাছড়ার সহিত সহস্র-পুটিত লৌহাদি ধাতুর সংমিশ্রণে এই মহাশক্তিসম্পন্ন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর নাশক বটিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা সকল প্রকার প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত নূতন ও পুরাতন, ম্যালেরিয়া, অস্থি ও মজ্জাগত সান্নিপাতিক, প্রমেহধাতুজ, পালাজ্বর, দোকালীন

ত্রৈকালীন, পালাজ্বর, সকল প্রকার জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। ইহা জ্বরে ও বিজ্বরে সেবনীয়।

জনপ্রবাদ যে, কুইনাইন ভিন্ন জ্বরের ঔষধ নাই; কিন্তু আমাদের কবিরাজমণ্ডলী বহু পরীক্ষার পর বিনা কুইনাইনে জ্বরের এই অদ্বিতীয় মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা শরীরের সকল প্রকার জ্বর ঠিক কুইনাইনের ন্যায় বন্ধ করে, অথচ কুইনাইন সেবন জন্য যে সকল অপকার হয়, তাহার সম্ভাবনা থাকে না, এবং শরীরের জ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষ নষ্ট করে। অন্য ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই ঔষধটি পরীক্ষা করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

মূল্য বড় কৌটা ৪২ বটী ॥৵০; ছোট কৌটা ২১ বটী।৵০; ডাঃ ।০।

উষাকুসুম তৈল।

মস্তিষ্ক ও কেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।

এই পরম সুগন্ধি কেশ-তৈল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নির্দ্দোষ দ্রব্যসমষ্টিতে প্রস্তুত। ইহা ব্যবহারে কেশক্ষয়, কেশের অকালপক্কতা, টাক, মস্তক-ঘূর্ণন, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন ভার করা, অতি মাদক সেবন জন্য বা দীর্ঘকাল প্রমেহাদি হেতু মস্তিষ্কের পীড়া ও বায়ু-জনিত শিরোরোগ অতি সত্বর নিবারিত হয়।

আমাদের উষাকুসুম তৈল কি কি বিষয়ে অদ্বিতীয়?

১। মন-বিমোহনকারী, বহুক্ষণস্থায়ী সুগন্ধে—

২। কেশ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার আরোগ্যে—

৩। মস্তিষ্ক-সম্বন্ধীয় সকল পীড়ার উপশমে—

৪। শ্রমান্তে শরীর ও মনের অবসাদ-দূরীকরণে—

৫। মন প্রফুল্ল ও চিন্তাশূন্য রাখিতে—

৬। কেশপাশের সংবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধতিতে—

৭। কেশের বিবর্ণতা, অকালপক্কতা ও টাক নিবারণে—

৮। অনিদ্রাদি বায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া নাশে।

যেরূপ প্রবল মস্তিষ্কপীড়াই হউক না কেন, আমাদের "উষাকুসুম তৈল" সামান্য একটু কপালে মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপশম হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার-সমিতি

১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

২

দুঃখের বিষয়, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অদ্যাপি অবিকৃত আকারে মুদ্রিত হয় নাই। ইহার সম্পাদককে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইবে, পশ্চিম রাঢ়ের বর্ত্তমান ভাষা ব্যতীত ওড়িয়া ও হিন্দী শব্দ শিখিতে হইবে, নানাবিধ গ্রাম্যকলা জানিতে হইবে, পশু ও পক্ষী, বন ও উপবনের বৃক্ষ চিনিতে হইবে। দুই পাঁচখানি পুঁথী মিলাইয়া পাঠ উদ্ধার করিলেই সম্পাদকের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। প্রাচীন পুস্তকের টীকা আবশ্যক, এবং টীকা করিতে গেলেই প্রচুর যত্ন আবশ্যক। কবিকঙ্কণের যে দুই তিন সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, তাহার কোনখানিকে আধুনিক কালের উপযুক্ত পরীক্ষাত্মক সংস্করণ বলিতে পারা যায় না। একখানি সন ১২৭৫ সালে নীলমণি চক্রবর্ত্তী দ্বারা 'সংশোধিত' এবং কলিকাতার আহিরীটোলায় মুদ্রিত হইয়াছিল। আমাদের বক্তব্যের নিমিত্ত এইখানিকেই আশ্রয় করা গেল। এই সংস্করণে ছাপার ভুল বিস্তর আছে, কিন্তু সম্পাদকের কারিকরির লক্ষণ নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই যথেষ্ট মানিতে হইবে।

কত প্রচলিত বাক্যে কবিকঙ্কণকে দেখিতে পাই, তাহার ইয়ত্তা হয় না। 'নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, হবে তুমি শিয়াল প্রহরী।' এ বিরহ জ্বরে, পতি যদি মরে, কোন ঘাটে খাবে পানি।' 'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।' 'মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।' 'আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দিও কর।' 'দুই চক্ষু জিনি নাটা।' 'কুমারের চাক যেন ফিরে।' 'এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই।' 'কি জানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, নারিকেলে সান্ধাইল পানি।' 'অলকা তিলকা পর মোহন কাজল।' 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে।' 'আপনি রাখিলে রহে মান।' 'দেখয়ে শরিষা ফুল।' 'নদী নালা একাকার।' 'পেসে খেতে নাহি আঁটে।' ইত্যাদির অংশবিশেষ প্রায় কবির ভাষায় সামান্য লোকেরা অদ্যাপি বলিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণে [illegible] দুরূহ সংস্কৃত শব্দ আছে। 'পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বুল তপন॥ পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী। কলধৌত, মকর, [illegible], পরিকর, তোক, আখেটী', ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ এক্ষণে বাঙ্গলায় চলিত নাই, কিন্তু হিন্দী ও ওড়িয়াতে চলিত আছে। যথা, পুখরি আড়া—পুকুর আড়া বা পাড় (ওড়িয়াতে পোখরি হুড়া) জোহার—প্রণাম, প্রাচীন কৃত্তিবাসে ও হিন্দীতে আছে, ওড়িয়াতে জুহার। কাত্তি—কর্ত্তরী, কাটারী; কৃত্তিবাস, হিন্দী ও ওড়িয়াতে আছে। পাকাল—প্রক্ষালিত অন্ন, পূর্ব্ব রাত্রির ধোয়া ভাত (ওঃ পখাল)। আওয়াস—আবাস, বিশেষার্থে রাজবাড়ী। উসাস—লাঘব; খরা—রৌদ্র; নেউটিয়া বাহুড়িয়া—ফিরিয়া; বিউনী—ব্যজনী, পাখা; তোরানি—আমানি; উধার—ধার; পানের বীড়া—পানের গোছা; বায়ার পউটী—পশ্চিম রাঢ়ে নাই, নদীয়া ও ওড়িয়ায় আছে। স্থানভেদে পরিমাণভেদ হইয়াছে। ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ পশ্চিম বঙ্গে অপ্রচলিত হইয়াছে। 'পসরা'—বিক্রেয় দ্রব্য। কিন্তু দোকানী পসারী কথা আছে। বেরুনিয়া—মুনিশজন—এখন মানভূমে চলিত আছে। তূলী—তোষক, লেপ। সাঁপুড়া—সম্পুট, ছোট পেঁড়া। বেহান বিকাল—এখন রাঢ়ে সকালে বিকালে, পূর্ব্ববঙ্গে ও হিন্দীতে বিহান শব্দ চলিত আছে। ওড়ফুল—জবাফুল। আরতি—আদেশ, নিয়োগ। পাছড়া—বর্ত্তমান চাদর। ইহা পাট কিংবা কাপাসের সুতায় বোনা হইত। পাছড়া—দুই প্রকার; একপাটা—প্রায়ই ধুতীর সঙ্গে বোনা হইত, কাজেই দুই ধারে পা'ড় থাকিত। দোপাটা—পৃথক্ বোনা হইত। দুইখানা মাঝে শেলাই করিলে চাদর হইত। তড়প—শাদা পা'ড় লম্বা ধুতী। ধুতী শব্দ কিংবা ধুতী [illegible] আজ কাল যাহা বুঝি, পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। তাড়পার গ্রামে এখনও তাহা অজ্ঞাত আছে। খাদি—ছোট ধুতী, শাড়ী আঁচলা যুক্ত ধুতী ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিকঙ্কণে শত শত গ্রাম্য শব্দ থাকিলেও পাকা আরবী কিংবা ফারসী শব্দ [illegible]। যেখানে মুসলমান প্রজার কথা বলিতে হইয়াছে, সেখানে অবশ্য আছে। তদ্ভিন্ন, অন্যত্র অল্প। 'বেগার কোন্দলে [illegible] নাহি হয় বেলা।' 'বদল আশে নানাধন এনেছি সিংহলে।' 'কূলেতে উঠিতে দেই রাজার দোহাই।' 'কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল।'

'সবার উকীল হয়ে বলে রাম কুণ্ড।' ইত্যাদি। বাবু শব্দ নাই, বাবুস্থলে বাপু আছে, ধনবানেরা রায়। রায় ব্যুৎপত্তিতে রাজা হইলেও, অর্থে ছোট খাট রাজা। এই অর্থে পশ্চিম রাঢ়ের কোনও কোনও গ্রামে কদাচিৎ এখনও রায় শব্দের প্রয়োগ আছে। ওড়িশায় রাজার ভাই প্রায়ই রায় নাম পান।

কবিকঙ্কণ তিন শত বৎসর পূর্ব্বের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট চিরদিন অমূল্য বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবিকঙ্কণ গ্রাম্য দুঃখী কবি, তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই তুল্য গ্রাম্য লোক। দেখা যায়, এখন যেমন, তখনও গর্ভিনী নারীর সন্তানপ্রসবে বিলম্ব হইলে তাহাকে জল-পড়া (মন্ত্রপূত জল) খাওয়ান হইত। প্রসবের পর আঁতুড়-ঘরের দুয়ারে গরুর মাথায় ষষ্ঠী রাখা হইত, এবং তিন দিনে, ছয় দিনে, আট দিনে, নয় দিনে, ও একত্রিশ দিনে এক এক উৎসব হইত। এখন অনেক স্থানে একত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া একুশ দিনেই প্রসূতি আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুত্রের ছয় মাসে, এবং কন্যার সাত মাসে অন্নপ্রাশন হইত। পাঁচ বৎসর বয়সে গন্ধবণিকের পুত্রেরও কর্ণবেধ হইয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের হাতে অর্পিত হইত। সাত বৎসর বয়সে কন্যারও কর্ণবেধ হইত, কিন্তু সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিত না। শ্রীমন্তের মা খুল্লনা পত্র পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহার সৎ-মা পারিত না। অথচ দুই জনেই এক বাড়ীর মেয়ে ছিল।

বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এগার বার বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ হইত। বর গলায় রত্নমালা ও হাতে সোনার তাড়বালা পরিয়া, গায়ে কুঙ্কুম লেপিয়া, পাটের (পট্টবস্ত্রের) দোলায় চড়িয়া গোধূলি সময়ে বিবাহ করিতে যাইত। সঙ্গে নানাবিধ বাজনা ও পুঞ্জে পুঞ্জে বরাতি (বরযাত্রী) চলিত। বিবাহের পর বর-কন্যা অরুন্ধতী দেখিত। এই প্রথা বাঙ্গালা দেশ হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। ওড়িশায় ব্রাহ্মণেরা দিবাভাগে বিবাহ করেন, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে অরুন্ধতী দেখিতে হয়। দম্পতী বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর ন্যায় অবিচ্ছেদে চির দিন ঘর করিবে, অরুন্ধতী দেখার এই অর্থ ছিল। কন্যার শুভ কামনা করিয়া তাহার মা বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী বাড়ী ঔষধ করিয়া ফিরিত। সতীনের কুহক হইতে

কন্যাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে এইরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইত। বিবাহের পর শয্যা তোলার কড়ি দিতে হইত।

কন্যা অল্প বয়সেই 'ইচড়ে পাকা' হইত, এবং সেই বয়সেই স্বামীর ঘর করিতে যাইত। অল্প বয়সেই স্বামী স্বত্ব বুঝিত। স্বামী বশীভূত করিতে বয়োজ্যেষ্ঠা সতা কাঙুর কামিক্ষার তন্ত্র মন্ত্র ও নানাবিধ ঔষধ করিত। অথর্ব্ব বেদ হইতে তন্ত্র মন্ত্র এ দেশে প্রচলিত আছে। বোধ হয়, মহাভারতের সত্যভামাকেও ঔষধ খুঁজিতে হইয়াছিল। স্বামীকে ওষুধ করা যে এখনও উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয়। সতীনের কোন্দল এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। কপট প্রবন্ধে ও পাটের শাড়ী ও সোনার চুড়ী দিয়া স্বামীকে কোন্দল ভাঙ্গাইতে হইত। বোধ হয়, ব্রাহ্মণের ঘরেই বহু স্ত্রী থাকিত, এবং অন্য জাতির মধ্যে প্রথমা পত্নী বাঁজা এবং স্বামী ধনবান্ হইলে ঘরে দুই স্ত্রী বিরাজ করিত। 'এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥'—ইহাতে বোধ হয় মুকুন্দরামেরও দুই স্ত্রী ছিল, কিংবা তাঁহার যে এক স্ত্রী ছিল, তিনি তাদৃশ মধুর-ভাষিণী ছিলেন না।

কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই শ্বশুর-বাড়ী যাইত। প্রথম রজোদর্শনে শুভাশুভ গণনা হইত, এবং পরিহাস্য কুটুম্বিনী ও পাড়াপড়সী জলখেলা করিত। স্বামীকেও বয়স্য উপহাস্য জনের জলখেলায় হেটমাথায় যোগ দিতে হইত। এখন স্বামীরা অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু মেয়ে মহল হইতে এই বীভৎস কাণ্ড একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

সুখের বিষয়, সতীর সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। 'সিন্দূর তিলক ভালে, চিরণী কুন্তলে দোলে, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল। সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া চতুর্দ্দোলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল॥' ইন্দ্রের পুত্রবধূ ছায়া স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে, এই সহমরণ বর্ণনা বঙ্গীয় পাঠক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

ধনপতি সাধু পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ভাট নানা স্থানে পত্র লইয়া গেল। 'বুলন কাণ্ডারী (বুলন ভাণ্ডারী—নাপিত ?) ঘরে ঘরে গুয়া ও সন্দেশ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানের যোল শত বেনে ধনপতির বাড়ী আসিল। কেহ দোলায়, কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে, কেহ বাঁকে, কেহ নৌকায় চাপিয়া আসিল। কেহ কেহ এমন

ধনী ছিল যে, তাহাদের রথ সাত ঘোড়ায় দিন রাত বহিত; কাহারও বাড়ির মহলে সাত মরাই টাকা থাকিত। কিন্তু 'ধন হইতে হয় কি বা কুলের প্রকাশ।' ধনপতি আগে কার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিবে, তাহা লইয়া তুমুল বিবাদ আরম্ভ ও ঘরের কুচ্ছা বাহির হইল। কারও ঘরে ছয় বউ পতির সহমৃতা হয় নাই, কারও বাপ হাটে আমলা (আমলকী) বেচিত, বারবনিতার সনে হাতাহাতি করিত, এবং স্নান না করিয়া খাইতে বসিত। শেষে ধনপতির নিজের ঘরের কথা বাহির হইল। যখন সে রাজার কাজে বিদেশে ছিল, তখন তাহার বড় স্ত্রী কোন্দল করিয়া মারিয়া ধরিয়া ছোট খুল্লনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, অভাগী খুল্লনাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে হইয়াছিল। তখন তার বয়স সবে বার তের বৎসর। কিন্তু বনে শতেক মাতাল বেড়ায়; কে জানে, খুল্লনার সতীত্ব ছিল কি না। সে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে কেহই তার রান্না খাইবে না। ধনপতি বিষম ফাঁপরে পড়িল; তাহার শ্বশুর রাজার দোহাই দিল। কিন্তু জ্ঞাতিকে রাজবল দেখান মিছা। রাজা ধন ও প্রাণ লইতে পারেন, কিন্তু 'জ্ঞাতি বন্ধুজন' * জাতি লইতে পারে। ধনপতি লক্ষ তঙ্কা দিয়া বান্ধব বশ করিতে ইচ্ছা করিল। খুল্লনা বুদ্ধিমতী। সে বলিল, 'আজি ধন দিলে দিবা বৎসরে বৎসরে'; অথচ তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না। সে পরীক্ষা 'লইবে'। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া সে সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিল। অভয়া অভয় দিলেন। সভায় শত পণ্ডিত একবুদ্ধি হইয়া পরীক্ষার বিধি স্থির করিলেন। অশ্বত্থপত্রে মন্ত্র লিখিয়া দুই পথিকের মাথায় দিয়া সরোবরের জলে ডুবান হইল। পথিক-দ্বয় পাতা লইয়া উঠিল, খুল্লনার জয় হইল।

কিন্তু জলের পরীক্ষা কিছু নয়। হয় ত পথিক দুজনের সঙ্গে ধনপতির সাঁট ছিল। মাল ডাকা হইল, এক নূতন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও সোনার অঙ্গুরী রাখা হইল। খুল্লনা সেই ঘটে হাত প্রবেশ করিয়া সাতবার অঙ্গুরী তুলিল।

এই পরীক্ষাও কিছু নয়। সাপের মুখ বাঁধা যায়। তখন কামার আগুনে শাবল তাতাইয়া লাল করিল। অশ্বত্থপত্রে বীজমন্ত্র লিখিয়া খুল্লনার

* এখন বাঙ্গালায় জ্ঞাতি কুটুম্ব। কবিকঙ্কণে বন্ধু শব্দ সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কুটুম্ব অর্থে পরিবারবর্গ, এবং বন্ধু অর্থে আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু। অর্থাৎ, বাঙ্গালা কুটুম্ববর্গ বুঝায়। ওড়িয়া কুটুম্ব। বাঙ্গালা=পরিজন ও জ্ঞাতি। ওড়িয়া বন্ধু=বাঙ্গালা কুটুম্ব।

হাতে দিয়া সেই অবাবর্ণ শাবল রাখা হইল। খুল্লনা শাবল ধরিয়া দূরে তৃণের উপরে ফেলিয়া দিল। তৃণ পুড়িয়া গেল।

তথাপি বিপক্ষ দলের মন উঠিল না। কে না জানে, আগুন ভারিলে হয় জল। আগুনে ঘি গরম করা হইল। খুল্লনা সেই আগুন সমান ঘি-এ সোনা ফেলিয়া হাত ডুবাইয়া তুলিয়া লইল। কিন্তু সে আগুনও ত ভারা যায়। যাহা হউক, এত দ্বন্দ্বে কাজ নাই, এক লক্ষ তঙ্কা দিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়। তখন ধনপতি রোষযুক্ত হইয়া তুলা পরীক্ষা করাইলেন। ইহাতেও বণিক্‌গুলা হারিল, কিন্তু তাহাদের কানাকানি থামিল না। তখন ধনপতির এক পিসতত ভাই সীতার জৌগৃহপরীক্ষার কথা তুলিল। সে উচিত কথা কহিতে চায়, ভাইবউ জৌগৃহ করুন, সবাকার মনে সন্তোষ হউক।

নগরে নগরে লোক ছুটিল। বাঁশের মাথায় পাটের পাছড়ায় শত পল সোনার চেঙ্গড়া (চাপ) বাঁধিয়া নগরে নগরে ফিরান হইল। যে জৌঘর নির্ম্মাণ করিবে, সে সেই সোনা পাইবে। কিন্তু সব কারিগর মাথা হেঁট করিল। দেবতার পরীক্ষা দেবতাই জানেন, তাহারা জৌগৃহের কথা কানেও শুনে নাই। এমন সময়ে চণ্ডী আকাশ-বিমানে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার দাসী খুল্লনাকে লোক-গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বকর্ম্মাকে জৌঘর নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। বিশাই ও তাহার ছেলে হনূমান্ মানুষের আকারে আসিয়া ধনপতির চেঙ্গড়া ধরিলেন। জৌর (যতুর) প্রকাণ্ড ঘর নির্ম্মিত হইল। খুল্লনা অভয় পদ ধ্যান করিয়া সেই ঘরে ঢুকিলে তাহাতে আগুন লাগান হইল। প্রথমে নীল ধূঁআ আকাশে উঠিল; উত্তর পবন আসিয়া জুটিল, যোজন প্রমাণ আগুন উঠিল, আগুনের দফালে ষাঁড়ের গর্জ্জন শোনা গেল, গগনবাসী মেঘের আড়ে লুকাইল। কিন্তু সতীর অঙ্গে আগুন মৃণালশীতল, তুষারশীতল হিম বোধ হইল।

কলিযুগে এমন কর্ম্ম কেহ করে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। খুল্লনা জলন্ত আগুন হইতে বাহির হইল, বণিকসমাজ সতীর শাপের ভয়ে তাহার পায়ে পড়িল। কেহ বলিল, আমি তোর ভাই; কেহ বলিল, মান চাই না, দুটি অন্ন দাও, খেয়ে ঘরে যাই; কেহ বলিল, তুমি মানুষ নও, তা আমি জানি, কিন্তু বলি কারে। খুল্লনা রাঁধিবার আজ্ঞা পাইল, জ্ঞাতি-গোত্র কুটুম্বেরা ভোজন করিল। তার পর কেহ সোনা, কেহ ঝারি, কেহ কণ্ঠমালা, কেহ পাটের পাছড়া, কেহ যোড়া লইয়া ফিরিয়া গেল।

আজ কাল সতীত্ব-পরীক্ষায় না হউক, চৌর্য্য-পরীক্ষায় চা'ল-পড়া আছে। চোর ধরিবার নিমিত্ত নল-চালা, এবং অপহৃত ধন পাইবার নিমিত্ত হাত-চালা, বাটী-চালা ইত্যাদি নানা বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে হাতে তেল ও আগুনপাতা লইয়া পরীক্ষা আছে। আজ কাল বাণ মারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাটি একবারে লোপ পাইয়াছে, বলিতে পারা যায় না।

আজ কাল জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে; বারবেলা কালবেলা না মানিয়া লোকেরা রেল ইষ্টীমারে দূর দেশান্তরে যাত্রা করিতেছে। অগত্যা লোকের যাত্রিক জ্ঞান ক্ষীণ হইতেছে। সেকালে পথে গোসাপ, কচ্ছপ, শৃগাল, শজারু, শশক দেখিলে লোকের যাত্রা ভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোম-চিল ফিরিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, টিকটিকির ডাক শুনিলে, পায়ে হুচোট খাইলে, কাপড়ে শেয়াকুল কাঁটা বিঁধিলে, শুক্না ডালে কাক কু কু শব্দ করিলে, যোগিনী আধখানি লাউ ভিক্ষা করিলে, তেলী তেল লবে, তেল লবে, করিয়া বেড়াইলে, বামে সাপ, দক্ষিণে শিয়ালী বেড়াইলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা হইত। এখনও যে হয় না, তা নহে। এখনও দৈবজ্ঞ পাঁজী খুলিয়া ও রাশিচক্র পাতিয়া যাত্রার শুভাশুভ গণনা করে। তখন তাহারা শতানন্দের ভাস্বতী ও শ্রীনিবাসের দীপিকা দেখিয়া বালকের জন্মপাতি লিখিত। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের সময়ে রাঢ়ে রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

সে কালের বসন ভূষণ এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ যত প্রকার নারী-ভূষণের নাম করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ আজকাল আর নাই। পুরুষের হাতে তাড়বালা, কানে বউলী বঙ্গদেশে আর নাই। বস্ত্রের ত কথাই নাই। ধুতী তখনও কেবল পুরুষের বসন হয় নাই। পার্ব্বতী ও রম্ভাবতী বিবাহের সময় হরিদ্রাযুত ধুতী পরিয়াছিলেন। ধুতী মহার্ঘ ছিল। কোটালেরা লোকের নিকট উৎকোচস্বরূপ ধুতী খাইত। দরিদ্রেরা খাদী (ছোট ধুতী), এবং ছোট খুঞা (বোধ হয় ক্ষৌমবস্ত্র,—তিসীর আঁশের কাপড়), ছেঁড়া কানি, মুড়া কাপড় (ধুতী কিংবা শাড়ীর ছেঁড়া অংশ) ও ধোকড়ী (মোটা কাপড়) পরিত। শীতকালে দোপাট্টা ও পাছুড়ী গায়ে দিত। খুঞা (ফেঁড়ায়ী) পরিলে গা ঢাকা পড়িত না। এই জন্য দরিদ্র স্ত্রীলোকে উড়নী বা ওড়না স্বরূপে খোসলা (কোনও গাছের খোসা বা ছালের মোটা কাপড়? যেমন খুঞা) ব্যবহার করিত। ধনবান্

লোকের জোড় (ধুতী চাদর) কাপাস ও পাটের লম্বা মোটা গজা ছিল। শীতকালে তসর ও বিচিত্র পামরী নামক লোমশ বস্ত্র ও শালের জোড়া ছিল। রমণীরা তসরের ও পাটের, শাদা ও নেতের শাড়ী পরিত। আজ কাল হাওয়া শাড়ী হইয়াছে; পূর্ব্বকালে পাটের নেত ছিল। এ জন্য তাহারা দোছটী করিয়া শাড়ী পরিত, এবং নানা চিত্র-বিচিত্র বিনোদ কাঁচলী গায়ে দিত। তাহারা মেঘডম্বুর কাপড়ের (বোধ হয় যাহাকে ময়ূরকণ্ঠী বলে) ভক্ত ছিল। ধনবানেরা বাড়ীতেও জুতা পরিত, এবং পাটের দোলায় চাড়িয়া এখানে ওখানে যাইত।

রাজাদের গড় ও গড়ের চৌদিকে বেউড় বাঁশের (এক জাতীয় ছোট ঘন কাঁটা বাঁশ) বন থাকিত। পুরীর চারি দিকে উঁচা পাঁচীর, পাঁচীরে খড়ের ছায়নী থাকিত। সাতানই বন্দে নানাবিধ আবশ্যক ঘর নির্ম্মিত হইত। অন্তঃপুরে সরোবর, সপ্তম মহলে দেবদেবীর মন্দির, পাষাণের নাচ-ঘাট, পাষাণের চতুঃশালা, পাকশালা। উত্তরে খিড়কী, পূর্ব্বে সিংহদ্বার। আওয়াসের পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুর দেউল, বামভাগে তুলসীমেলা, এবং সিংহদ্বারের পূর্ব্বে জলাশয়। নগর-চাতর মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা। বাসাড়ো জনের নিমিত্ত দীর্ঘ মন্দির। এখানে প্রবাসী লোকেরা থাকিত। রাজা নগর বসাইবার নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া প্রজাদিগকে ভূমি ইনাম দিতেন। নানা জাতি নগরে বাস করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত। অন্য দেশ হইতে চন্দন, শঙ্খ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মাণিক; মতি, পলা, চামর, পামরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আনা হইত। রাজার সদাগর থাকিত। তাহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল ও অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য আনিত।

রাজাকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুত মল্ল, বাগ্দী, ইহারাই সৈন্য হইত। স্থানবিশেষে মুসলমান সৈন্যও থাকিত। পায়ে দাঁড়াইয়া ঘোড়া, হাতী ও রথ চালাইয়া চতুরঙ্গ দলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাল্লিশ বাজনা বাজিত। হাতীর পিঠে শূল শক্তি জাঠ লইয়া মাহুত যুদ্ধ করিত; হাতীর শুঁড়ে লোহার মুগুর বাঁধিয়া দেওয়া হইত। গাড়ীতে কামান যাইত। সৈন্যের হাতে তীর ধনুক, খাঁড়া ঢাল, ভিন্দিপাল, ভুষণ্ডি, ডাঙ্গুষ, গদা, জাক, বেলক (বন্দুক) থাকিত। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দেশেই নির্ম্মিত হইত।

ধনী লোকেরা পাঠশালায় বন্ধুদিগের সহিত পাশা খেলিত। স্বামী স্ত্রীতেও পাশা খেলিতে ভালবাসিত। বারবনিতা ও মাতাল ছিল, কিন্তু তাহারা নগরের প্রান্তে বাস করিত। সমস্ত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে কেবল যোগেশ্বর মহেশকে সিদ্ধি খাইতে দেখি। গুলী, গাঁজা, আফিম-খোরের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, তামাক নাই। পান খাওয়া, পান দেওয়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাহাকেও সম্মান করিতে হইলে পাদ্য অর্ঘ্য পান, এবং কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিতে হইলে তাহাকে পান দিয়া 'আরতি' করা হইত।

ধনপতি কুটুম্ব বন্ধুজনকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীর চেড়ী দুর্ব্বলাকে পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া হাটে পাঠাইল। আর বলিয়া দিল যে, সে কড়িতে না আঁটিলে অমুক বেণ্যের কাছে দুই চারি টাকা লইবে। দুর্ব্বলা তসরের শাড়ী পরিয়া কপালে চন্দন চুয়ার ফোঁটা করিয়া হাতে পান গুয়া লইয়া হাটে গেল। সঙ্গে দশ জন ভারী গেল। ঐ কড়িতে দুর্ব্বলা শাক, পাতা, মাছ, শশক, কচ্ছপ, খাসী, দুধ, দই, ক্ষীর, নারিকেল, কলা, নবাত চিনি, খাঁড় গুড় আটা, হাঁড়ী প্রভৃতি রন্ধনের যাবতীয় উপকরণ কিনিয়া আনিল। একটা খাসীর দাম আট কাহন, জীয়ন্ত শশকের দাম আট পণ, এক পণ পানের দাম এক পণ, এক সের তেলের দাম দশ বুড়ী, ভারীর বেতন জন প্রতি এক পণ। সেকালে গোল আলু ছিল না, মরিচের নাম লঙ্কা হয় নাই। হাটে দাস দাসীও কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ মণ্ডল হাটে তোলা তুলিত। কোটালের ও মোড়লের দু' পয়সা বেশ রোজগার ছিল। তাই সেয়ানা লোকে মোড়লীর নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিত। শ্রীমন্ত সিংহলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বাজনা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। দামামার ধ্বনি শুনিয়া পঞ্চপাত্রসহ রাজা চমকিত হইলেন। তখন 'কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘন ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥ লুটে দেশ খাস্ বেটা দেশের বিধাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।" কোটাল গিয়া বাজনা বাজাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্তকে এক দফে বেশ ধমকাইল। তার পর উভয়ের ভাব হইল। কোটাল বলিল, 'মোর শিরে দায় যদি হয়, ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহান চাই আমার দিগারী॥" শ্রীমন্ত ঐ কড়ি দিতে স্বীকার করিলে কোটাল প্রীতমনে রাজাকে সংবাদ জানাইল।

সেকালে ময়রারা চিনি, নবাত লাড়ু ও সন্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইত। লুচী

কচুরী ছিল না। দুর্ব্বলা হাটে রক্ত-মাছ কিনিয়া স্নান করিল। তার পর দই, গুড়, কলা ভক্ষণ করিল, এবং ভারীদিগকে চিড়া দই কিনিয়া দিল। প্রবাসে যাইবার পথে রাঁধিবার অসুবিধা হইলে ধনবান্ পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কলা ভোজন করিয়া থাকিতেন। ধনপতির জ্ঞাতিকুটুম্ব ভোজনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অন্ন ব্যঞ্জন হইয়াছিল।

১। বেগুন, কুমড়া, কলা, মোচায় বেসার (বেসন) পিঠালি দিয়া এবং ঘৃতে সন্তোলিয়া হিঙ্গ জীরা মেথি দিয়া সুকুতা।

২। ফুলবড়ী দিয়া নট্যাশাক।

৩। কাঁঠাল বিচি দিয়া চিঙ্গড়ি মাছ।

৪। ঘি-এ ভাজা নালিতা শাক।

৫। সরিষা তেলে ভাজা বেতুয়া শাক।

৬। ফুলবড়ী ঘি-এ ভাজিয়া গুড়ের রসে ফেলা (ফুলরী)।

৭। দুগ্ধ ও গুড় দিয়া লাউঘণ্ট, মউরী দিয়া সাঁতলানা।

৮। আখের রস দিয়া মুগের সূপ। (সেকালে কি দাল নাম হয় নাই?)

৯। আদার রস ও মরিচ গুঁড়া দিয়া কই মাছ ভাজা।

১০। হিঙ্গ জীরা দিয়া মসুর-মিশ্রিত মাষ কলাইর সূপ।

১১। চিতল মাছের কোল (পেটী) ভাজা।

১২। রুই মাছের ঝোল।

১৩। মরিচ দেওয়া মানকচু।

১৪। তেলে সম্বরা বেসর দেওয়া বোয়াল মাছ ও হিঙ্গচা শাক।

১৫। রাই খড়া ও খরসুলা মাছ ভাজা।

১৬। চিঙ্গড়ী মাছের বড়া।

১৭। আম্বের সঙ্গে শৌল মাছ।

১৮। তেঁতুল দিয়া পাঁকাল মাছ।

১৯। ঘন আলে ক্ষীর।

২০। কলা বড়া, মুগ সাউলী, ক্ষীর-পূলী প্রভৃতি পিঠা বিবিধ। (মুগ সাউলী—এক প্রকার পূরপিঠা। চাউলের আটার নেচি করিয়া ভিতরে মুগসিদ্ধ দেওয়া হয়।)

২১। সকলের শেষে ভাত।

দরিদ্রের দিন চিরকালই দুঃখে কাটে।

সেকালে দরিদ্রের সম্বল ছিল, মেটো পাথর ও বাসি পান্তা। তাহারা অন্যের ধান ভানিত, হাটে নিজের চরকা-কাটা সূতা বেচিত। ছেঁড়া কানি বা মুড়া রা খুঞা পরিত, কুঁড়েতে থাকিত।

মুকুন্দরাম নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন। ধনীলোকের খাওয়ালেও তিনি পাঁকাল মাছ দিয়া তেঁতুলের অম্বল আনিয়াছেন। পাঠশালায় পাশা খেলিয়া কাল কাটাইতে পারিলে সুখী মনে করিতেন। তাঁহার আদর্শ রাজ্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন,—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস,
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা, না কর কাহার শঙ্কা,
পাটায় নিশানি মোর ধর॥
মোর গ্রামে কর বাড়ি, রয়ে বস্তে দিও কড়ি,
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামি কি বাঁশগাড়ি, নানা বারে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক জাত, গুয়া লোণ সোনা ভাত
ধানকাটি কমির কস্থরে।
যত বেচ চালু ধান, তার না লইব দান,
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর, কার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণদাস, পুরাব সবার আশ,
প্রতিজনে সাধিব সম্মান।

মুকুন্দরামের নিজের অবস্থা স্মরণ করিলে তাঁহার বর্ণিত আদর্শ রাজ্যে প্রজার সুখ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার ছয় সাত পুরুষ বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণে দামুন্যা গ্রামে কৃষিজাত শস্যে জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের সময়ে প্রজার পাপে মামুদ সরিফ নামে কোনও ব্যক্তি দামুন্যার

ডিহিদার হইল। যেমন ডিহিদার, তেমনই উজীর। তাহারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শত্রু হইল। জমীর কোণে কোণে দড়ী ফেলিয়া মাপিতে লাগিল, এবং তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরিয়া কর বসাইল। প্রজার গোহারি শুনিল না, পতিত জমী উর্ব্বরা বলিয়া লিখিয়া কর আদায় করিতে লাগিল। পোদ্দার ৵১০ আনায় টাকা ধরিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে, এবং প্রত্যহ এক পয়সা সুদ লইতে আরম্ভ করিল। ধান গরু কিনিবার লোক নাই। দামুন্যার এক জন মহাজনকে ডিহিদার বন্দী করিয়া লইয়া গেল। প্রজারা কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিল না, তাহাদের দুয়ার জুড়িয়া পেয়াদা থানা দিতে লাগিল। কেহ কেহ ব্যাকুল হইয়া ৷৵০ আনায় টাকা হিসাবে ধান গরু বেচিতে লাগিল। ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া মুকুন্দরাম ভাই রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিলেন। পথে এক দস্যুর হাতে পড়িয়া তিনি এমন নিঃসম্বল হইলেন যে, অন্যের নিকট পাথেয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইল। মুকুন্দরাম স্ত্রী পুত্র ভাই লইয়া নানা গ্রাম ও নদী পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক দিন কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। তাঁহাকে তৈল বিনা স্নান করিতে হইল, এবং কেবল উদক পান করিয়া প্রাণ রাখিতে হইল। কিন্তু শিশুপুত্র ত বুঝে না; ক্ষুধায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি এক পুকুর আড়ায় (পাড়ে) শালুক নাড়া (কুমুদ ফুলের নাল) নৈবেদ্য দিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে সেই পুকুরপাড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই সময় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয়া-মঙ্গল-গীত রচনার আদেশ করিলেন। তার পর মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূমি পরগণার আরড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপনীত হইলেন, কবিত্ববাণী শুনাইয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন। রাজা বাঁকুড়া রায় দশ আড়া ধান দিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গুরু (গুরুমশায়) এবং নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন।

এখানে মুকুন্দরাম নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন বটে, কিন্তু দামুন্যার তরে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কারণ, তিনি বুঝিতেন, 'যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন, সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।'

কি দুঃখেই মুকুন্দরাম এই গান রচনা করিয়াছিলেন!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভক্তমন্দিরে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন; এখন বেলা প্রায় ৩টা হইবে। বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ; আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ। ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্ত সঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা আছে, তাই ঠাকুর বলেন, "বড় শুদ্ধ অন্ন।"

নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাঁহাদের বাড়ী গিয়া অপরাহ্ণে ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়ী নন্দ বোসের বাটীর নিকটে; সেখানেও যাইবেন। ব্রাহ্মণী কন্যা-শোকে সন্তপ্তা; প্রায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর একটি ভক্ত মহিলা গন্নুর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোক্‌রা ভক্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্ব্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন;—

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ছোট নরেনের প্রতি) তোকে ডাক্‌তে পাঠাই নাই।

ছোট নরেন। (হাসিতে হাসিতে) তা আর কি হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে; অবসর হ'লে আস্‌বে।

ঠাকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পাল্কী আসিয়াছে। ঠাকুর নন্দ বসুর বাটীতে যাইবেন।

ঠাকুর ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পাল্কীতে উঠিলেন। পায়ে কালো বার্ণিস করা চটি জুতা, পরণে লাল ফিতাপাড় ধুতি একখানি, উত্তরীয় নাই। জুতা যোড়াটি পাল্কীর এক পাশে মণি রাখিয়া দিলেন।

পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আসিয়াছিলেন। [illegible] আসিয়া জুটিলেন।

পাল্কী নন্দ বসুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাল্কী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটি জুতা যোড়াটি দিতে বলিলেন; পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া উপরের হল-ঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল-ঘর। দেব দেবীর ছবি ঘরের চতুর্দ্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তেরা এই উপরের হল্-ঘরে জুটিলেন। গিরিশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নর পিতা নন্দ বসুর বাটীতে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন; তিনিও উপস্থিত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীনন্দ বসুর বাটীতে আগমন।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর কয়েক জন ভক্ত। গৃহস্বামীর ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন; দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় ছবি, শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তবৎসল মূর্ত্তি।

শ্রীরাম হনুমানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ বামনাবতার। ছাতি মাথায় দিয়া বলির যজ্ঞে গমন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—বামন! এবং এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন। মণি বলিয়া উঠিলেন,—চমৎকার ছবি!

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—"ধূমাবতী!" অষ্টম, ষোড়শী; নবম, ভুবনেশ্বরী; দশম, তারা; ১১শ কালী। এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—

"এ সব উগ্রমূর্ত্তি! এ সব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই। এ মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।"

ঠাকুর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ভাবে বলিতেছেন,—"বা! বা!"

তার পর রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন।

তার পর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্ত্তি দেখিতেছেন। গ্লাস্‌কেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্ত্তি; দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ রাগিণী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—"আজ খুব আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই সব ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য্য!"

নন্দ বসু বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"বসুন!—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। (উপবিষ্ট হইয়া) এ পট-গুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।

নন্দ বসু। ইংরাজী ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) সে সব অমন্‌ নয়। ইংরাজির দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গান ছিল। সুরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের এক জন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংস দেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, সব ধর্ম্মাবলম্বীরা ভিন্ন পথ দিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও যে সুরেন্দ্রের পট!

প্রসন্নের পিতা। (সহাস্যে) আপনিও ওর ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) ওই এক রকম; ওর ভিতর সবই আছে।—ইদানীং ভাব।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভোর হইতেছেন। ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন,—"আমি বেহুঁস হই নাই। বাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, বড় বাড়ী! এতে কি আছে? ইঁট, কাঠ, মাটী।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—"ঈশ্বরীয় মূর্ত্তি সকল দেখে বড় আনন্দ হ'ল।"

আবার বলিতেছেন,—"উগ্রমূর্ত্তি, কালী, তারা, (শব শিবা মধ্যে শ্মশান-বাসিনী) রাখা ভাল নয়; রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়।"

গৃহস্বামীর ভ্রাতা। (সহাস্যে) তা তিনি যত দিন চালাইবেন, তত দিন চল্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে; কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু। তাঁ'তে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর কৃপা হ'লে হয়।

নন্দ বসু। তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা কর্‌বার শক্তি আছে?

['ঈশ্বর কর্ত্তা', না 'কর্ম্মই ঈশ্বর?']

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) বুঝেচি তোমার পণ্ডিতদের মত; যে যেমন কর্ম্ম কর্‌বে, সে সেরূপ ফল পাবে; ও গুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হ'লে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—মা! এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না। তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা, ভক্তি দাও।

নন্দ বসু। আইন তিনি ছাড়াতে পারেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদ্‌লাতে পারেন।

[চৈতন্যলাভ ভোগান্তে, না তাঁর কৃপায় ?]

তবে তুমি ও কথা বল্‌তে পার। তোমার না কি ভোগ কর্‌বার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন্ কথা বল্‌ছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না। তবে ভোগই বা কি করবে ? কামিনী কাঞ্চনের সুখ,—এই আছে, এই নাই; ক্ষণিক। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর আছে কি ? আমড়া, আঁঠী ও চামড়া; খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেল্লে, আর নাই।

[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী ?]

নন্দ বসু একটু চুপ করিয়া আছেন; তার পর বলিতেছেন,—ও সব ত বলে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষপাতী ? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তাহা হলে বল্‌তে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই নিজেই সব;—ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন বুদ্ধি দেহ,—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর কর্‌বেন ?

নন্দ। তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন ? কোনখানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর খুসী।

অতুল। কেদার বাবু (চাটুর্জ্জে) বেশ বলেছেন। এক জন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন কর্‌লেন ? তাতে কেদার বাবু বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ তিনি সৃষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না।

[অবিদ্যা কেন ? তাঁর খুসী।]

(সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর খুসী।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে লাগিলেন।

গান।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমন চলি॥

তিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই একটি মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে;—তাতেও আনন্দ—

ঘুড়ির লক্ষের দুট একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি,
কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে,
(ভব সিন্ধু মাঝে মন উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কত তরী)

নন্দ বসু। তাঁর খুসী! আমরা যে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জান্‌তে পাচ্চ, ততক্ষণ আমি আমি কর্‌চ।

সকলে তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে,—সকলেই উদ্ধার হবে; তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা, কেউ-বা সন্ধ্যার সময়; কিন্তু কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জান্‌তে পার্‌বে।

গৃহস্বামীর ভাই বলিতেছেন,—আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি, এটা খোঁজো দেখি! আমি কি হাড়্, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজ্‌তে 'তুমি' এসে পড়ে; অর্থাৎ, অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই! 'আমি' নাই—তিনি।

[ঐশ্বর্য্য ও অহংকার।]

(নন্দ বসুর প্রতি) তোমার অভিমান নাই! এত ঐশ্বর্য্য। 'আমি' এক বারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না, তবে থাক্ শ্যালা ঈশ্বরের দাস হয়ে। (সকলের হাস্য) ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল।

যে 'আমি' কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই 'আমি' 'কাঁচা' আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।

অহংকারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, ১ম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয়, শান্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

[ঐশ্বর্য্য ও মত্ততা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশী ঐশ্বর্য্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়; ঐশ্বর্য্যের স্বভাবই ঐ।

"যদু মল্লিকের বেশী ঐশ্বর্য্য হয়েছে; সে আজ কাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

"কামিনীকাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠা বোধ থাকে না; তা'দেরই ব'লে ফেলে, তোর গুষ্টির—; মাতালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।

নন্দ বসু। তা বটে।

[THEOSOPHY.]

ভ্রাতা। মহাশয়! এগুলা কি সত্য—Spiritualism, Theosophy? সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জানি না বাপু। অত হিসাব কেন?

"আম খাও; কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটী পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জান্‌তে পারে, তা হ'লে ও সব হাবজা গোবজা বিষয় জান্‌তে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে;—'আমি ৫ সের চালের ভাত খাবো রে!'—'আমি এক জালা জল খাবো রে!' বৈদ্য বলে, খাবি? আচ্ছা খাবি।—এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে যা বল্‌বে তাই শুনতে হয়।"

ভ্রাতা। আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে?

[ক্ষণকাল যোগ ও মুক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো,—চৈতন্য হবে।

শ্রোতা। (সহাস্যে) আমাদের ঈশ্বরের যোগও ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হোক; ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি।

অহল্যা বল্লে,—রাম! শূকরযোনিতেই জন্ম হউক, আর যেখানেই হউক, যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে। যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

নারদ বল্লে,—রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্ব্বাদ করো।

আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁ'তে মন হয়,—ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

[পাপ ও পরলোক।]

'আমাদের কি বিকার যাবে'!—'আমাদের কি আর হবে'—'আমরা পাপী'—এ সব বুদ্ধি ত্যাগ করো।

(নন্দ বসুর প্রতি) আর এই চাই—'এক বার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!'

নন্দ বসু। পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কি না—তা'তে কি হয়—এ সব খবর। আম খাও। 'আম' প্রয়োজন;—তাঁ'তে ভক্তি—

নন্দ বসু। আম গাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। গাছ! তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই,—তিনি নিত্য!

তবে একটি কথা আছে,—তিনি 'কল্পতরু'—

"কালী কল্পতরু মূলে রে
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।"

কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—

তবে ফল, তরুমূলে পড়ে—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়—অহেতুকী ভক্তি। তা'কে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম চায় না।

পরলোকের কথা বোলচ। গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাবিবে, তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' হরিণ' করে শোকে প্রাণ ত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হ'ল। তাই ত জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস কর্‌তে হয়;—তা' হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে,—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।

কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বল্লুম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার?' তার পর আবার বল্লুম, 'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত কর্‌তে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয়, তা হ'লে তইরি লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়, কাঁচা-গুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গলকামনা।]

এ পর্য্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরকে মিষ্টমুখ-করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—

"কিছু খেতে হয়। যদুর মাকে তাই সেই দিন বল্লুম,—ওগো কিছু (খেতে) দাও। তা না হ'লে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বসু ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও রজোগুণ।]

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে হাত ধোওয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্য এক জন ভৃত্য পিকদান আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিক্‌দানি রজোগুণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।"

গৃহস্বামী বলিলেন, 'হাত ধুন।'

ঠাকুর অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। বলিলেন, 'কি ?—হাত ধোবো ?'

ঠাকুর দক্ষিণে বারাণ্ডার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, 'আমার হাতে জল দাও।' মণি ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন।

ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

ভদ্রলোকদের জন্ত রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল, সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল; তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

[ইষ্টদেবতাকে নিবেদন।]

নন্দ বসু। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) একটা কথা বলব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি ?

নন্দ বসু। পান খেলেন না কেন ? সব ঠিক্ হ'ল; ঐটি অন্যায় হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইষ্টকে দিয়ে খাই;—ঐ একটা ভাব আছে।

নন্দ বসু। ও ত ইষ্টেতই পড়্‌ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তি-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিসই ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে নেওয়া যায়। ভক্তি-পথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

নন্দ বসু। ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক্ বটে,—ও ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একটা সাবধান। মোসাহেবরা নিজের স্বার্থের জন্ত বেড়ায়।

(প্রসন্নের পিতার প্রতি) আপনার কি এখানে [illegible] হয় ?

প্রসন্নের পিতা।—আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক ইচ্ছা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতি বিনীতভাবে) না থাক, আপনি খান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর নন্দ বসুর বাড়ীটি খুব বড়, তাই বলিতেছেন,—

"যদুর বাড়ী এত বড় নয়;—তাই তা'কে সে দিন বল্লাম।"

নন্দ বসু। হাঁ তিনি (যোড়াসাঁকোতে) নূতন বাড়ী করিয়াছেন।

ঠাকুর নন্দ বসুকে উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নন্দ বসুর প্রতি) তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা?

[জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি।]

যে সংসারত্যাগী, সে ত ঈশ্বরকে ডাকবেই। তা'তে আর বাহাদুরী কি?

সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য। সে ব্যক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

একটা ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়। হনুমানের জ্ঞানভক্তি, নারদের শুদ্ধাভক্তি।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান! তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চ্চনা কর? হনুমান বলিলেন, 'কখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন দেখি, তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি,—আমিই তুমি।'

রাম নারদকে বলিলেন, 'তুমি বর লও'। নারদ বলিলেন, 'রাম! এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নন্দ বসুর প্রতি) গীতার মত,—অনেকে যা'কে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি খুব আছে।

নন্দ বসু। শক্তি সকল মানুষেরই সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্ত হইয়া) ঐ এক তোমাদের কথা,—সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্ব্বভূতে এক হ'য়ে আছেন বটে, কিন্তু শক্তিবিশেষ।

বিদ্যাসাগরও ঐ কথা বলিয়াছিলেন,—'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' তখন আমি বলিলাম,—যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হ'লে তোমাকে আমরা কেন দেখিতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে?

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বাটীর দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন।*

চন্দ্রশেখর-চরিত্র।

পৌরাণিক যুগে ব্যাস ও বাল্মীকি প্রমুখ ঋষিগণ যেমন অপূর্ব্ব আদর্শ-চরিত্র-রত্নমালার সৃষ্টি করিয়া সমাজের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তিনি সমাজের সম্মুখে নব নব আদর্শ ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আদর্শ চিত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ বর্ণের সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমাজের সমধিক উপযোগী হইয়াছে। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ-স্থল সীতা ও সাবিত্রী, পিতৃ-ভক্তির আদর্শ-স্থল রামচন্দ্র, ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ-স্থল লক্ষ্মণ, শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ-স্থল অর্জ্জুন ও ভীম প্রভৃতি, সত্যরক্ষণশীলতার আদর্শ-স্থল দেবব্রত ভীষ্ম, এবং দাস-ভাবের আদর্শ-স্থল হনুমান। প্রাচীন যুগের এইরূপ আরও নানা আদর্শের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল আদর্শ-চরিত্রের কার্য্যকারিতা কাল ও পাত্রভেদে অল্পবিস্তর খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। এই সকল আদর্শের পূজা, সমাজ-মধ্যে চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে সমাজের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাধীনে, সমাজের সম্যক্ পরিপুষ্টিসাধনের জন্য যে নব নব আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে সমাজের এ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ়

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ; ৮ম্ খণ্ড।

বিশ্বাস। তিনি পিতৃ-ভক্তির আদর্শ ব্রজেশ্বরে অঙ্কিত করিয়াছেন, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত আদর্শ,—সূর্য্যমুখী, মৃণালিনী, শান্তি ও প্রফুল্ল প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বীর-ধর্ম্মের আদর্শ প্রতাপে ও স্বদেশ-প্রেমিকতার আদর্শ সত্যানন্দে অঙ্কিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন। মনুষ্যত্বের দিক হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত কোনও চরিত্রই চন্দ্রশেখরের সমতুল্য নহে। এই অশেষশাস্ত্রবিৎ পরহিতব্রত-রত মহানুভব চন্দ্রশেখরের চরিত্র-আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব।

এই শোক-জরা-পূর্ণ নশ্বর জগৎ হইতে যদি অনন্ত আনন্দময় চিরযৌবন-সম্পন্ন অবিনশ্বর জগৎ পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্নশ্রেণী-বিভক্ত মনুষ্যকে উপযুক্ত সোপানপরম্পরায় অবস্থিত করান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কঠোর তপস্যারত সংযমশীল আর্য্য ঋষিগণ অপেক্ষা চন্দ্রশেখরের স্থান নিম্নে নহে। হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রের নাম শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিলে চিত্তের যে বিশুদ্ধি ও পরিতৃপ্তি সাধন হয়, চন্দ্রশেখরের নাম শ্রবণ করিলেও চিত্তের তদনুরূপ বিশুদ্ধি ও পরিতৃপ্তি ঘটিয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর অমর লেখনী এতই উচ্চ ভাবে এই পবিত্র চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছে যে, পার্শ্বে ধবলগিরি অথবা কাঞ্চনজঙ্ঘার চিত্র অঙ্কিত করিলেও মনে হইবে, প্রথমোক্ত শেষোক্ত হইতে উচ্চতর। মানসপটে ধবলগিরির শুভ্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তুষার-শুভ্র পর্ব্বত-চূড়া গগন-স্পর্শী সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ও তেমনই অনন্ত কাল ধরিয়া তুষার-শুভ্র, জ্ঞান-কিরণে সেই শুভ্রতা সমধিক উজ্জ্বল।

বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত প্রণয়-রাজ্যে রমণী-মধ্যে মৃণালিনীর যে স্থান, পুরুষমধ্যে চন্দ্রশেখরেরও সেই স্থান বলা যাইতে পারে। অভিমানশূন্যতা, অর্থাৎ প্রেমাস্পদের প্রতি ক্রোধশূন্যতা আদর্শ প্রেমের একটি লক্ষণ। এ লক্ষণ মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর উভয়েরই প্রণয়ে চির-বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত অন্য রমণী-চরিত্রে এ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, মৃণালিনী-চরিত্রেই ইহার সার্ব্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যত দূর স্মরণ হয়, তাঁহার রচিত অন্য পুরুষ-চরিত্রে এ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, সীতারাম, নবকুমার, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী। এই দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেককেই প্রাণান্তকর কঠোর যন্ত্রণা ভোগ-

করিতে হইয়াছিল। নিরভিমানিনী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্য সমাজে বিরল হইলেও হিন্দুসমাজে বিরল নহে; কিন্তু অভিমানশূন্য পুরুষের দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে নিতান্ত বিরল। এই কারণে, আশা করি, মৃণালিনীর চরিত্র অপেক্ষা চন্দ্রশেখরের চরিত্রের আদর্শেই সমাজের অধিক উপকার সাধিত হইবে।

প্রণয়ের বিভিন্ন স্তর বিভাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরে চন্দ্রশেখরকে স্থাপন করিয়াছেন। এই স্তরদেশ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। প্রণয়ের নিম্নতম স্তরে 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্রনাথ অবস্থিত। এই স্তরদেশ অনন্ত তমসাচ্ছন্ন। অসহ্য নরক-যন্ত্রণা এই স্তরদেশে অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, হেমচন্দ্র ও পশুপতি প্রভৃতির প্রেমের স্তরবিন্যাসের এ স্থল নহে।

মনুষ্য-হৃদয় কত দূর উদার ও উন্নত হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সংসারের কুটিলতা এতটুকুমাত্র চন্দ্রশেখর-চরিত্র কলঙ্কিত করে নাই। প্রত্যুত, চন্দ্রশেখরকে সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহাকে সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলে, কেহ তাঁহার জীবনের সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। তিনি সংসারে জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি সূর্য্য তুল্য বিরাজ করিতে জানিতেন, মনুষ্য-কীটের সহিত পঙ্কিল পূতিগন্ধময় কর্দ্দমে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে জানিতেন না,—সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে। মনুষ্যমধ্যে দেবতা তুল্য তিনি বিরাজ করিতে জানিতেন। মনুষ্যমধ্যে যে সহস্র সহস্র পশু বিরাজ করিতেছে, সে শ্রেণী হইতে তিনি অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া জগতে তিনি কোলাহল করিতে জানিতেন না। গভীর চিন্তারাজ্যে আড়ম্বরশূন্য জীবনযাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু পাপিষ্ঠা শৈবলিনী এ রত্ন চিনিতে পারে নাই। প্রজ্বলিত বহ্নি-বৃষ্টে পতঙ্গ যেমন মুগ্ধ হয়, শৈবলিনী প্রতাপের রূপে তেমনই মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইলেও, শৈবলিনী ঘোর স্বার্থপর রমণী; প্রতাপ স্বার্থত্যাগের জলন্ত প্রতিমা; চন্দ্রশেখর দূরে থাক্, শৈবলিনী প্রতাপেরও যোগ্যা ছিল না। এইরূপ পাপিষ্ঠার সহিত চন্দ্রশেখর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; লেখক এই সূত্রে চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের পরিচয় দিবার সুন্দর অবসর পাইয়াছেন। পাপের সঙ্গে পুণ্যের স্পর্শে এক দিকে পাপ যেমন পুণ্যাত্মা

হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই অপর দিকে পুণ্যের আলোক সমধিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের প্রথম দ্বাত্রিংশ বৎসরের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—'দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সেও তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন।' অর্থাৎ, এত অধিক বয়সেও তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি দারপরিগ্রহে নিরুৎসাহ ছিলেন, এ কথাও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের এই জ্ঞান-পিপাসা প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত বরতন্তু-শিষ্য কৌৎসের জ্ঞান-পিপাসার সমতুল। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যও অতুলনীয়। সে ব্রহ্মচর্য্য সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে যে প্রচুর ছিল না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়; বর্ত্তমান যুগের কথা স্বতন্ত্র।

বোধ হয়, শৈশবেই চন্দ্রশেখরের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, এবং জননী তাঁহাকে তাঁহার স্নেহ মমতায় পালন করিয়াছিলেন। পিতা মাতা উভয়ের যত্নে পালিত সন্তানের পক্ষে চন্দ্রশেখরের ন্যায় গম্ভীরাত্মা হইবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই আমরা মনে করি। নিতান্ত স্বাধীনভাবেই এ বনস্পতি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; যত্ন-বর্দ্ধিত ক্ষুদ্র উদ্যানবৃক্ষ ইহার সমতুল হইতে পারে না। বনান্তরবর্ত্তী তড়াগেই পদ্ম বিকশিত হয়; গোলাপের জন্যই উদ্যান-স্বামীর যত্ন আবশ্যক।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি মাতৃবিয়োগবশতঃ চন্দ্রশেখরের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া জুটিল। শুধু কার্য্যে নহে, চন্দ্রশেখরের অন্তরমধ্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই অন্তরমধ্যে বিশৃঙ্খলার কথা লেখক কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কোথাও উল্লেখ করেন নাই; কুশলী লেখক কৌশলে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী-মুখাগ্রে ছদ্মবেশে সে কথা নির্গত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের মাতৃবিয়োগের পর যখন গ্রন্থরাশি ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর দ্বিতীয় অবলম্বন রহিল না, তখন তাঁহার চিত্ত ঈষৎ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় তাঁহার পুস্তকাদি হারাইয়া যাইত, খুঁজিয়া পাইতেন না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখিতেন, কাহাকে দিতেন, মনে থাকিত না। এ উদ্ভ্রান্ত ভাব কেন? এ উদ্ভ্রান্ত ভাব চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের প্রেম-বিকাশের সঙ্কেতমাত্র। তাঁহার অন্তরমধ্যস্থিত বিশৃঙ্খলাভাবের লক্ষণমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থলে অসাধারণ নিপুণতার সহিত ব্রহ্মচারীর হৃদয়ফলকে

স্বপ্ন তুলিকার দুই চারি টানে অপূর্ব্ব প্রেম-বিকাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলার উৎপাত হইতে নিস্তারলাভের জন্য চন্দ্রশেখর আকস্মিক ঘটনাধীনে শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। শৈবলিনী সুন্দরী। বিবাহ করিয়া 'সংসার-বন্ধনে মুগ্ধ' হইবেন না, চন্দ্রশেখর এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ চন্দ্রশেখরের সে সংকল্প কোথায় রহিল? চন্দ্রশেখর 'সৌন্দর্য্যের মোহে' মুগ্ধ হইলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে ষড়িন্দ্রিয়বিশিষ্ট রক্তমাংসগঠিত মনুষ্যদেহ ধারণ করিতেন, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রমাণের বলে চন্দ্রশেখর আমাদের ঘরের ঠাকুর, আমাদের হৃদয়ের অনুভূতির দেবতা; ধ্যানের দেবতা নহেন। শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রশেখর শুধু যে সুন্দরী বিবাহ করিলেন, তাহা নহে; তিনি সংসার-ক্ষেত্রে আপনার ফাঁদ আপনি পাতিয়া রাখিলেন। বিবাহের আট বৎসর পরে চন্দ্রশেখরকে সংসার-বন্ধনে কঠোর ভাবে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পরে আমরা বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিব।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু শৈবলিনীর রূপ-বহ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর রূপ-বহ্নিতে যে দাহিকা শক্তির অভাব ছিল, এমন নহে। অভাব থাকিলে লরেন্স ফষ্টর তাহাতে পুড়িয়া মরিত না; অভাব থাকিলে মীর কাশিমকে ক্রীড়া-পুত্তলী করিয়া সে খেলাইতে পারিত না; অভাব থাকিলে আমিয়টকে সে প্রতারিত করিতে পারিত না। প্রত্যুত শৈবলিনীর রূপ-বহ্নি প্রখর ছিল; কিন্তু চন্দ্রশেখরের চিত্তও সহজদাহ্য ছিল না। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত, সেই কারণে শৈবলিনীর সংসর্গেও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা পূর্ব্বেরই মত বলবতী রহিল।

জ্ঞানস্পৃহা বলবতী থাকিলেও, বিবাহান্তে তিনি শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু শৈবলিনীর পক্ষে তাহা নিতান্ত কঠোর ও অপ্রীতিকর বোধ হইয়া থাকিবে। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের স্তরমধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকিত। সে ভালবাসা পূর্ণকলেবরে প্রকাশিত হইবার অবসর অল্পই ঘটিত। পক্ষান্তরে সুশীতল বারিপূর্ণ পাত্রের সন্নিকটে থাকিলেও শৈবলিনী হৃদয়ের তীব্র পিপাসা মিটাইতে পারে নাই। চন্দ্রশেখর সেই পিপাসা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে দোষ

দিতে প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চরিত্র আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার চরিত্রের সহিত শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার বাহ্যতঃ উদাসীন-ব্যবহারেরও একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের ব্যবহারের মধ্যে যে ক্রটী ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এ ক্রটী চন্দ্রশেখরের সূক্ষ্মদৃষ্টিকে, তাঁহার বিচারশীল চিত্তকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। তাই তিনি এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নব যুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্তই আত্মসুখ-পরায়ণ, সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" শৈবলিনীও সেই ক্রটী লক্ষ্য করিয়াছিল। লক্ষ্য করিয়া স্বামি-ত্যাগের পর পত্নী-বিরহে চন্দ্রশেখরেব ক্লেশাশঙ্কা উপস্থিত হইলে শৈবলিনী আপনাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছিল যে, "পুঁথিই তাঁহার সব; তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না।" সুখের বিষয়, চন্দ্রশেখরকে এক দিন তাঁহার ক্রটীর জন্য কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল।

বিবাহের পর আট বৎসর চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী একত্র বাস করিয়াছিলেন। আট বৎসর পরে শৈবলিনী হৃদয়ের দারুণ পিপাসায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া স্বাদুনীর জাহ্নবীপুলিন হইতে তপ্তবালুকাপূর্ণ মরুভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিল। গগন-ললাট-বিরাজী প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের শোভা উপেক্ষা করিয়া শৈবলিনী মূঢ় পথিকের ন্যায় অরণ্যে আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিতা হইল। সে অন্ধ, দীপ্ত সূর্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

চন্দ্রশেখরের পক্ষে সে কি দুর্দ্দিন, যে দিন শৈবলিনী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন! চন্দ্রশেখর রাজধানী হইতে শৈবলিনী-পরিত্যক্ত গৃহে যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আপনারা তাঁহার তখনকার অবস্থা একবার স্মরণ করুন। যে পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের গৃহ-প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে তাহা যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের চিত্তের বিভিন্ন দিক অতিসুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। স্বল্প কথায় এক একটি দিক এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, অন্যের পক্ষে সেরূপ ভাবে চিত্রণ অসম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়। চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবানে নির্ভরপ্রিয়তা, সর্ব্ব জীবে সমদর্শিতা ও

শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিচয়, উল্লিখিত পরিচ্ছেদে অতি সুন্দরভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। সত্য বলিতে কি, এই পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন এককালে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদেই তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে শৈবলিনীর সুপ্ত সৌন্দর্য্যসুধারাশি পান করিতে করিতে চন্দ্রশেখরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, যাহাকে তিনি অপ্রত্যাশিত কালে নয়নগোচর করিলে 'অসময়ের বিদ্যুৎ' বলিয়া রহস্য করিতেন, সেই শৈবলিনীর বিরহে তাঁহার হৃদয় দারুণ-ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সহসা স্থির সমুদ্রমধ্যে যেন বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। পত্নীর প্রতি স্বামীর চিত্তভাবকে চন্দ্রশেখরের স্থায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তি মোহ ভিন্ন অন্য কি আখ্যা দিতে পারেন? বিরহ-কাতর চন্দ্রশেখর সেই মোহ লক্ষ্য করিয়া বিক্ষুব্ধহৃদয়ে কহিলেন, "যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।" এই উক্তির পর চন্দ্রশেখরের গভীর ও অকৃত্রিম প্রণয় সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কবি কিন্তু এ স্থলে নিরস্ত হইলেন না; তিনি আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া চন্দ্রশেখরের প্রণয়-চিত্র সুন্দরতররূপে অঙ্কিত করিলেন। সেই চিত্র আঁকিতে গিয়া এক দিকে চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, অপর দিকে তাঁহার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই দৌর্ব্বল্যপ্রকাশেই চন্দ্রশেখরকে যেন আমরা সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হই। আজ চন্দ্রশেখরের গৃহ শূন্য; তিনি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; ঘন মেঘ উষার রক্তিম গগন যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। শৈবলিনী-পরিত্যক্ত গৃহে তিলার্দ্ধকালযাপনও চন্দ্রশেখরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। যে চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, "এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীর মুখপদ্ম কি জীবনের সারভূত করিব?" তিনি "সায়াহ্নকালে আপনার অধীত অধ্যয়নীয় শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সমস্ত একে একে আনিয়া একত্র করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন, * * * সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

"অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই জ্বলিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট

হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্নে সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।"

এক্ষণে সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে,—চন্দ্রশেখর এই গ্রন্থরাশি ভস্ম করিলেন কেন? পত্নীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রশেখর গ্রন্থরাশির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি কি গ্রন্থরাশি ভস্ম করিলেন? নগেন্দ্রনাথ যেমন সূর্য্যমুখীর জন্য কুন্দের চিতা সাজাইয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরও শৈবলিনীর জন্য কি সেইরূপ তাঁহার গ্রন্থরাশির চিতা সাজাইয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন? কুন্দের জন্য সূর্য্যমুখীকে হারাইয়াছিলেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; গ্রন্থরাশির জন্য শৈবলিনীকে হারাইয়াছেন, এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখর কি গ্রন্থরাশিকে ত্যাগ করিলেন? না, তাহা নহে। গ্রন্থ-ভস্মের এরূপ অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। শৈবলিনী স্বেচ্ছায় যে বেদগ্রাম ও স্বামী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, চন্দ্রশেখর সে কথা তখনও জানিতে পারেন নাই। তিনি জানেন, তস্করে তাঁহার প্রেমোদ্যানের কুসুমটিকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সহিত তাঁহার গ্রন্থরাশির প্রতি অত্যধিক অনুরাগের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, এ ভাব চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে উদিত হইবার অবসর সুদূরপরাহত।

তবে এই গ্রন্থ-ভস্মের প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ এই, যখন শৈবলিনী নাই, তখন অরণ্যতুল্য সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হউক। যখন তস্করে উদ্যানের শোভাবর্দ্ধনকারী একমাত্র পুষ্পটি অপহরণ করিল, তখন উদ্যানের সকল বৃক্ষ লতা উপাড়িয়া ফেল, উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দাও। দৃঢ়-চিত্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে এ ভাব কিন্তু অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না; তাই চন্দ্রশেখর আবার সংসারী হইয়াছিলেন। পরে আমরা সে কথার আলোচনা করিব।

এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। যখন কোনও কারণাধীনে অন্তরমধ্যে তীব্র কষ্ট অনুভূত হয়, তখন যে কোনও প্রকারেই হউক, সেই অন্তরনিহিত কষ্টের বহির্বিকাশ ঘটিয়াই থাকে। আমরা চন্দ্রশেখরের 'শোণিত-তুল্য প্রিয়' গ্রন্থরাশির অগ্নিসংকার কার্য্য, তাঁহার তীব্র মনঃকষ্টের বহির্বিকাশস্বরূপ মনে করি। প্রিয়তমার বিরহ হেতু চন্দ্রশেখরের চিত্ত-মধ্যে

যে অনল জ্বলিতেছিল, এই গ্রন্থ-প্রজ্বালিত অনল তাহার প্রতিবিম্বমাত্র। এই অনল-শিখায় চন্দ্রশেখরের প্রেম লিখিত হইয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেম এরূপ জ্বলন্তভাবে আর কোথাও লিখিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

কেহ বলিতে পারেন, শৈবলিনীর বিরহে চন্দ্রশেখরের চিত্ত যে সহসা এতটা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অশোভন; মনুষ্যত্বের হিসাবেও তাহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করি। রামচন্দ্র সীতাহারা হইয়া অরণ্যের বৃক্ষলতা ও পশু পক্ষীর নিকট সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, যিনি লোকরঞ্জনার্থ প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অনায়াসে বনবাসে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তিনিও পত্নী-বিরহে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কাতর হইয়াছিলেন; চন্দ্রশেখরও সেইরূপ কাতর হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের চরিত্র মলিন হয় নাই, বরং মহিমান্বিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের জীবন-নাটককে দুই অঙ্কে বিভক্ত করিলে, উল্লিখিত গ্রন্থরাশির ভস্মাবশেষকেই সেই অঙ্কদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা-স্বরূপ মনে করিতে পারা যায়। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, সে সংকল্প তাঁহার গ্রন্থরাশির সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হইল; তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যও আরব্ধ হইল; তাঁহার মনুষ্য-জীবন চরম সার্থকতা-লাভের পথে সদ্যঃ অবতীর্ণ হইল। অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেই যে মনুষ্য-জীবনের সফলতা সাধিত হয় না, চন্দ্রশেখরের জীবনের প্রথমাংশ হইতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। সংসার-ক্ষেত্রে শাস্ত্রলব্ধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োগেই যে জীবনের সার্থকতা ও শাস্ত্রালোচনার সার্থকতা সূচিত হয়, ইহাই চন্দ্রশেখরের জীবনের দ্বিতীয় অংশের স্থূল মর্ম্ম। মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা-সাধনের উপায়-উদ্ভাবনই সকল শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য; সেই চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যত দিন চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে যে দিন তিনি সকল শাস্ত্রগ্রন্থের অগ্নিসংকার করিয়া ক্ষুদ্র বেদগ্রাম হইতে বাঙ্গলা দেশের সুবিশাল প্রাঙ্গণে পরোপকার-ব্রত-রত ব্রহ্মচারীর বেশে প্রকৃত সংসারী রূপে অবতীর্ণ হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নের সার্থকতা আরব্ধ হইল।

দুঃসহ ক্লেশে চন্দ্রশেখর বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। শৈবলিনীর

উদ্ধারসাধনই যে এই বেদগ্রাম-ত্যাগের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর অশান্তচিত্তে গভীর রজনীর তিমিরমধ্যে পথে পথে বিচরণ করিতেন, এবং তৎকালে তিনি আপনাকে যৎপরোনাস্তি হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। ঠিক এমনই সময়ে চন্দ্রশেখরের জীবন-পথে একটি কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। এ কর্ত্তব্য শৈবলিনী-সংক্রান্ত নহে, মীরকাসিমের বেগম দলনী বিবি সংক্রান্ত। চন্দ্রশেখর কর্ত্তব্য পায়ে ঠেলিলেন না। চন্দ্রশেখর দলনী বিবির উপকারসাধনে যত্নবান হইলেন। এই স্থলে গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি পুড়াইলে কেন! সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, কিন্তু হৃদয় ভস্ম হয় না।" ইহার অর্থ এই, তুমি মনে করিয়াছিলে, গ্রন্থ পুড়াইয়া সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবে, কিন্তু যে হৃদয় পরের হিতসাধনের জন্য সতত উন্মুখ, সে হৃদয় এই অনন্ত শোকপূর্ণ সংসারকে কি পরিত্যাগ করিতে পারে!

চন্দ্রশেখর, তাঁহার নবীন জীবনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁহার গুরুদেব রামানন্দ স্বামীর নিকট হইতে অর্জ্জন করিলেন। পরোপকারে পুণ্য আছে, পরোপকারসাধন মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য, এ শিক্ষা চন্দ্রশেখর পূর্ব্বেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার ফলে, চন্দ্রশেখর প্রতাপের উদ্ধারসাধনের জন্য গঙ্গার সলিলরাশি-মধ্যে অবলীলাক্রমে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বার্জ্জিত শিক্ষার উপরে চন্দ্রশেখর আজ রামানন্দ স্বামীর নিকট নূতন শিখিলেন যে, পরোপকারেই সুখ, সুখার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই।

এই শিক্ষার পর, চন্দ্রশেখর পরোপকারসাধন জীবনের সারব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়নের যে সার্থকতা আরব্ধ হইয়াছিল, এত দিনে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। চন্দ্রশেখরের জীবন ধন্য হইল। তাঁহার দেহ ও মনে যেন অপরিমিত বল সঞ্চারিত হইল। সমস্ত গ্লানি তাঁহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। শৈবলিনীর বিরহজনিত যে চাঞ্চল্য এত দিন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল। অসাধারণ স্থৈর্য্য আসিয়া চাঞ্চল্যের স্থল অধিকার করিল।

যখন চিত্ত এমনই স্থির, সংযত ও অবিকৃত, তখন চন্দ্রশেখর জীবনেই অসহ্য নরক-যন্ত্রণায় উৎপীড়িতা শৈবলিনীকে দর্শন করিলেন। শৈবলিনীর মানসিক যন্ত্রণায় চন্দ্রশেখর যারপরনাই ব্যথিত হইয়া অশ্রুমোচন করিলেন, কিন্তু

শৈবলিনীর পতন-সংবাদেও তাঁহার চিত্ত বিকৃত হইল না। শৈবলিনী যে স্বইচ্ছায় কুলত্যাগিনী, এ কথা সে আত্মমুখে স্বীকার করিলেও, চন্দ্রশেখর হৃদয়ের স্থৈর্য্য হারাইলেন না। এ স্থলে আপনারা একবার হেমচন্দ্রের চরিত্র স্মরণ করুন; তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। চন্দ্রশেখর রামানন্দ স্বামীর শিক্ষাগুণে সর্ব্বসন্তাপকে চিত্ত হইতে দূর করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার চিত্ত সুখ দুঃখের অতীত; কিন্তু তথাপি তিনি শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি? ইহার দুই কারণ; প্রথম,—শৈবলিনী পতিতা হইলেও চন্দ্রশেখরের পরিণীতা ভার্য্যা; দ্বিতীয়,—চন্দ্রশেখর আপনার সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু অন্যের সুখ দুঃখ তিনি আত্মজীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রশেখর শুধু তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, তিনি হৃদয়বান পুরুষ। যিনি তত্ত্বজ্ঞ অথচ হৃদয়হীন, তিনি মনুষ্যকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিলে রোদন করিবেন কি না সন্দেহের বিষয়।

চন্দ্রশেখর উন্মাদ-গ্রস্ত শৈবলিনীর সহিত রামানন্দ স্বামীর সম্মুখীন হইলেন। রামানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী সমভিব্যাহারে বেদগ্রামে ফিরিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিকারচিত্ত পুরুষ ভিন্ন আর কে পতিতা পত্নী সমভিব্যাহারে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিত? চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বগৃহে আনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কেন না তাহা লোক ও সমাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ বোধ হইল। পরে যখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর জীবন-সংক্রান্ত সকল তথ্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না; তখন তিনি শৈবলিনীকে পুনরায় পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর ভিন্ন কে এমন পারিত?

কিন্তু এ স্থলেই চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের শেষ নহে; তাঁহার মহত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর এখনও প্রদর্শিত হয় নাই। চন্দ্রশেখর হৃদয়ের শোণিতশোষী শত্রুর অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি লরেন্স ফষ্টরকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ক্রোধশীল হইলে, তাঁহার শরীরে যে অপরিমিত শক্তি ছিল, তাহাতে তিনি একাধিক লরেন্স ফষ্টরকে পদতলে টিপিয়া মারিতে পারিতেন। আজীবন বৃথায় তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন নাই।

লরেন্স ফষ্টরকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাহাই বা বলি কেন।

যিনি সর্ব্বরিপুদমনকারী মহাপুরুষ, যিনি অক্রোধ, তাঁহার আবার শত্রু মিত্র কি ? তিনি আবার ক্ষমা করিবেন কি ? প্রত্যুত লরেন্স ফষ্টরকে চন্দ্রশেখর ক্ষমা করিয়াছিলেন বলিলেও চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব খর্ব্ব করা হইবে। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে ক্ষমা শিখাইয়াছিলেন। কিরূপে শিখাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রতাপ ফষ্টরের বধে চলিয়াছেন; চন্দ্রশেখর প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "ফষ্টরের বধে [illegible] কি ভাই! যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান [illegible]। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর [illegible] করে; যে উত্তম [illegible] শত্রুকে ক্ষমা করে।"

সংসারে অনেক সময়ে মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তিমূলক বিষম [illegible] উপস্থিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। শত্রুর অনিষ্টসাধন অপেক্ষা শত্রুকে ক্ষমা করায় যে অধিক বীরত্ব, এ কথা অনেক শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু জগতে কয় জন এই নীতি-বাক্য পালন করে? কর্ত্তব্যের অনুরোধে কখনও কখনও শত্রু কেন, মিত্রেরও অনিষ্টসাধন করিতে হয়। কিন্তু যে হৃদয়ের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যের অনিষ্টবিধান করে, সে অধম।

মনুষ্যের ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিজেরই সম্পূর্ণ ইষ্টসাধন করিবার অবসর নাই; তাহার উপর সেই মহামূল্য জীবনের কোনও অংশ যদি অন্যের অনিষ্টসাধনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? অন্যের অনিষ্টে নিজের পারমার্থিক ইষ্ট অসম্ভব, এই জন্যই চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, "তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা?" ফষ্টর সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের এই উক্তি যে কত মহত্ত্বব্যঞ্জক, তাহা হৃদয়ে অনুভব [illegible] আমাদের ন্যায় [illegible] কীটের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব [illegible] এই ক্ষুদ্র উক্তির মধ্যে চন্দ্রশেখরের সমস্ত সৌন্দর্য্য [illegible] পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে চন্দ্রশেখরের ইহাই শ্রেষ্ঠ উক্তি এবং শেষ উক্তি বলিলেও বিশেষ ভ্রম হইবে না। মহত্ত্বের মধ্য দিয়া চন্দ্রশেখর আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মহত্ত্বের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সম্মুখ হইতে বিদায় লইলেন। চন্দ্রশেখরের সমস্ত জীবন মহত্ত্বময়।

আমরা চন্দ্রশেখরের চরিত্র সাধ্যমত বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে সেই চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

সর্ব্ব প্রথমেই চন্দ্রশেখরের সমগ্রজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের কথা উল্লেখযোগ্য। এ ব্রহ্মচর্য্যের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। শৈবলিনী-হারা হইয়া চন্দ্রশেখর যখন মুঙ্গেরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন তিনি যেমন ব্রহ্মচারী ছিলেন, যখন তিনি শৈবলিনী সমভিব্যাহারে বেদগ্রামে আত্মকুটীরে বসবাস করিতেন, তখনও তিনি তেমনই ব্রহ্মচারী ছিলেন। উদয়নালার যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে শৈবলিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার এ ব্রহ্মচর্য্যের অবসান ঘটে নাই। অথচ তাঁহার এই সমস্তজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে তিনি নানাপ্রকারে সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এই স্থলেই চন্দ্রশেখরের চরিত্রের মহত্ব। সংসারকে অগ্রাহ্য করিয়া কাহারও জীবন ধন্য হইতে পারে না। চন্দ্রশেখর জীবনের প্রথম চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার জীবনের এই অংশ কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। শেষ জীবনে তিনি সংসারের সহিত সুহৃৎ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি সংসারক্ষেত্রে এক জন মূল্যবান কর্ম্মিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার শেষ জীবন এত উজ্জ্বল। চন্দ্রশেখর সততই আপনার বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ রাখিতেন; তিনি ঈশ্বরে সতত নির্ভরশীল ছিলেন; তিনি দুঃখকে জয় করিতে ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে জানিতেন। সহস্র সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও এরূপ ব্যক্তিকে নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। এই কারণেই আমরা চন্দ্রশেখরের সমস্তজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রশেখরের প্রেম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। চন্দ্রশেখরের প্রেম কতকটা বিশ্বজনীন। তাঁহার প্রথম জীবনে এ প্রেম বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। শৈবলিনী-বিচ্ছেদের পর রামানন্দ স্বামীর উপদেশবারিসেচনে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই বিরাট বৃক্ষ আপনার পত্র-বহুল প্রকাণ্ড শির ঊর্দ্ধে উন্নমিত করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-সংক্রান্ত প্রণয়ের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রেম সাধারণ মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেমের ন্যায় সংকীর্ণ হইলে, শৈবলিনীর হৃদয়স্থিত নরকানল কখনও নির্ব্বাপিত হইত না।

তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য গুণ সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পতিতা শৈবলিনীকে তিনি পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন নাই। লরেন্স ফষ্টরকেও তিনি ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করেন নাই।

[illegible] সম্বন্ধে আমরা শুধু একটি উক্তি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত [illegible] গণিয়া জানিয়াছিলেন, দলনী বিবির ভবিষ্যৎ [illegible] কলনীর উদ্ধারসাধনে যত্নবান্ হইয়া তিনি [illegible] "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? ঘটিবার যাহা, তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।"

চন্দ্রশেখর নির্লোভী পুরুষ; ধনাকাঙ্ক্ষাকে কখনও তিনি হৃদয়ে প্রবল হইতে দিতেন না। তিনি কখন ভিক্ষা অথবা দান গ্রহণ করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কটাক্ষপাত করিয়া চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

চন্দ্রশেখর, বিনয়ী, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান পুরুষ বলিয়া লোককে অপ্রিয় কথা শুনাইতে পরাঙ্মুখ। গণিতে অপারদর্শিতার দোহাই দিয়া তিনি দলনী-বিবির ভবিষ্যৎ কাসেমালি খাঁর নিকট গোপন করিয়াছিলেন।

তিনি নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানপিপাসু। গভীর রজনী পর্য্যন্ত তিনি সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন সকলের মীমাংসায় রত থাকিতেন। চন্দ্রশেখর আরও অন্যান্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তাহার কোনও কোনওটি পূর্ব্বেই হয় ত প্রবন্ধমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনওটি হয় ত এখনও লক্ষ্যের বাহিরে পড়িয়া আছে।

যাহা হউক, সর্ব্ব-শেষে আমরা চন্দ্রশেখর-চরিত্রের সারসঙ্কলন না করিয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারি না। তাঁহার সমগ্র চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, লেখক তাঁহার পাঠকবর্গকে নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রদান করিবেন বলিয়াই চন্দ্রশেখরের ন্যায় আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন,—

প্রথম,—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে প্রকৃষ্ট জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব।

দ্বিতীয়,—শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই,—যদি সে জ্ঞান সংসারক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারা না যায়। যত দূর সম্ভব, অনাসক্তভাবে সংসার কর, সংসারকে উপেক্ষা করিও না। উপেক্ষা করিয়া কাহারও জীবন ধন্য হইতে পারে না।

তৃতীয়,—যদি সকল দুঃখ দূর করিতে চাও, তাহা হইলে পরোপকার ব্রত গ্রহণ কর।

চতুর্থ,—ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ বীরের ধর্ম্ম।*

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

---

* ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

কমলা

১

যখন কোদালিয়ার জমীদার-পুত্র নন্দীগ্রামের অনুরূপ চাটুর্য্যের একমাত্র কন্যাকে-বিবাহ করিয়া ঢাক ও রোশনচৌকির বাদ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে সর-গরম করিয়া চলিয়া গেল, তখন পল্লীর স্ত্রী-সমিতিতে দু' একটা ছোটখাট সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দুই বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার বিবাহঘটনার উল্লেখ করিয়া কমলার পিতৃব্য নামক জীবের আক্কেল রূপ পদার্থটির অস্তিত্বের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন! পরে তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া যখন শ্রীমতী জগৎতারিণী উক্তরূপ পূজ্যপাদ পিতৃব্য দেবের মুখে অগ্নিসংযোগের সারবত্তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন, তখন ক্ষমতাপন্ন ক্ষুদ্র সমিতিটির আলোচনা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

রিপোর্টটা যত সংক্ষেপে সারিলাম, ঘটনাটি তত সংক্ষিপ্ত নহে। সে কথাটি এই,—স্বরূপচন্দ্র যখন জমীদার সরকারে নায়েবী করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন কনিষ্ঠ অনুরূপচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপরিপাক ভিন্ন অপর কোনও কার্য্যে বিন্দুমাত্রও পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। সহসা এক দিন প্রাতঃকালে বিপত্নীক স্বরূপচন্দ্রের মৃত্যু হইল। স্বরূপচন্দ্র যে মৃত্যুশয্যায় আপনার অনাথা কন্যা কমলাকে নিস্বঃ অবস্থায় কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়া যান, তাহা নহে। প্রতিবেশিগণ বলেন, কমলার সহিত বিস্তর রজতকাঞ্চন রত্নাদিও না কি অনুরূপচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল; এবং বিষয়-বুদ্ধিতে অনুরূপ অপেক্ষা তদীয় সহধর্ম্মিণীর প্রবেশলাভটা অনায়াসেই ঘটিত। সেই জন্যই একটি দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের সহিত কমলার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় স্ত্রীবুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া অনুরূপ পরিজনবর্গের নিকট বলিয়া-ছিলেন যে, "স্বরূপচন্দ্র ত কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! তিনি দরিদ্র, সম্বলহীন; ধনী পাত্র সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য, এবং তাঁহার আপনার কন্যা মন্দাকিনীও বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল; সুতরাং এ ক্ষেত্রে—"ইত্যাদি। এক্ষণে মন্দাকিনীর বিবাহে অনুরূপচন্দ্রকে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া পল্লীর দুই একটা নিন্দুক ও খলের ঈর্ষ্যাবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বলবতী হইয়া গ্রামে

একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই জন্যই ত একটা ছোটখাট সভাসমিতিতে অহুরূপচন্দ্রের অদ্ভুত ধূর্ত্ততা ও তাঁহার পত্নী বিন্দুবাসিনীর অপূর্ব্ব মস্তিষ্কের আলোচনা করিয়া প্রতিবেশিনীগণ উত্তরের মুখে অগ্নিপ্রয়োগ করিবার নিমিত্ত ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দরিদ্র স্বামীর গৃহে কমলার সুখের অভাব ছিল না। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র পরিবার। স্বামীর বৃদ্ধা পিতৃষসা ভিন্ন সংসারে আর কেহ অভিভাবক ছিল না। বধূকে গৃহে আনিয়া অবধি বৃদ্ধা আপনার ক্ষুদ্র সংসারটিকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। আর গৃহে ছিল অতি পুরাতন ভৃত্য—বেহারী।

স্বহস্তে স্বামীর জন্য রন্ধন করিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া, বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিয়া নিশীথে কমলা যখন শয্যাগৃহে প্রবেশ করিত,—শয়নমন্দিরে স্বামী যখন সপ্রেম-সম্ভাষণে কমলাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, তখন তাহার সমস্ত শ্রান্তি নিমেষে ঘুচিয়া যাইত। তাহার পুলক-কম্পিত হৃদয় হর্ষের বিমল তরঙ্গপ্লাবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। স্বামীর সোহাগে কমলা আপনাকে কনকসিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষা এতটুকু ভিন্ন ভাবিত না।

২

কমলার স্বামী যোগেশচন্দ্র চাকদালির জমীদার বাবুদের এণ্ট্রান্স-স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিতেন, এবং জমিদারবাটী হইতে প্রকাশিত "দীপালী" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিতেন। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেগুলি প্রকৃতই তাঁহাকে ভালবাসিত। এমন মাষ্টার মহাশয় আর হয় না;—কখনও কাহাকে বকেন না, অথচ স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে অত্যাচার বা দৌরাত্ম্যের কোনও ভয়াবহ প্রসিদ্ধি দেশের মধ্যে বিস্তারলাভ করে নাই। কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী এই পল্লীগ্রামে শান্ত অথচ বলিষ্ঠ মাষ্টারটির শিক্ষা-গুণে বালকেরা চপল না হইয়াও পাড়াগেঁয়ে নিরীহতা হইতে মুক্ত ছিল, এবং ক্রিকেট, ফুটবল না খেলিলেও লাঠিখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামক্রীড়ায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিত। ডিবেটিং ক্লবে ক্রমাগত স্বদেশ ও গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্যাদি বুঝাইয়া বুঝাইয়া যোগেশচন্দ্র ছাত্রদিগকে অতিরিক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার একটি দরিদ্র পল্লীতে কয়েকখানা খড়ের ঘর হুতাশনের প্রবল তেজে ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে, কয়েকটি বয়স্ক

ছাত্র তাহাদের অভিভাবকগণের সম্পূর্ণ নিষেধ সত্বেও যোগেশচন্দ্রের তত্বাবধানে প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা যোগেশচন্দ্র নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতেন; মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকেও সঙ্গে লইতেন। তখন পল্লীর দু' একজন বৃদ্ধ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিত,—"এই যে যোগেশ-মাষ্টারের ফৌজ বেরিয়েছে!"

জমীদার বাবুর নিকটও যোগেশের আদর অল্প ছিল না। জমিদার তারিণীশঙ্কর চৌধুরীর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল; তাই তিনি যোগেশচন্দ্রকে ভৃত্য হিসাবে না দেখিয়া বন্ধুর ন্যায় স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। যোগেশচন্দ্র গদ্যরচনাগুলি এমনই ভাষা ফেনাইয়া লিখিতে পারিতেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছিল! সাহিত্যসমাজে তাঁহার মত, তাঁহার সমালোচনার একটা রীতিমত মূল্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল! প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতাপন্ন মাষ্টার লেখকটি তাঁহার লেখনীর অসামান্য লিপিচাতুর্য্যে চাকদালি গ্রামের নাম বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিকট বিশেষভাবে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের লেখনীর আর একটি প্রধান গুণ ছিল, গুপ্ত বিদ্রূপ! তাঁহার রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া বিদ্রূপের ক্ষুরধারা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইত,—সে ক্ষুরধারার বিপুলস্রোত যে হতভাগ্য বিপক্ষের শিরে আঘাত করিত, তাহার শোচনীয় দুরবস্থা দেখিলে অতিশয় গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মারও হাস্যসংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিত! কলিকাতার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মাসিকের স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্রকে সম্পাদকের দেবাসনে বরণ করিয়া লইবার আশায় বিস্তর ধূপধূনা ও পুষ্পচন্দনের আভাষ দিতেন; কিন্তু কোনরূপ প্রলোভন তাঁহাকে তারিণীশঙ্করের স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই!

যোগেশচন্দ্রের সংসর্গগুণে তারিণীশঙ্কর রায়বাহাদুর খেতাব-গ্রহণের জন্য লালায়িত হওয়া অপেক্ষা সাহিত্যচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করাটা অধিকতর লাভজনক মনে করিতেন, এবং তৈলদানে তৎপর হওয়া অপেক্ষা বিপন্ন ও দরিদ্র বাঙ্গালী-লেখকগণকে অর্থসাহায্য করিতে অধিকতর ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেন।

বিবাহের পর কমলার অদৃষ্টে অর্থসুখ তেমন প্রকৃষ্টভাবে না ঘটিলেও, স্বামি-সুখটা পূর্ণমাত্রায় মিলিয়াছিল। নিরলঙ্কারা স্মিতমুখী কমলা একমাত্র স্বামিপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল মহিমায় আপনাকে সমধিক সম্পদশালিনী বুঝিয়া যথেষ্ট

আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। কিন্তু হায়! অভাগিনীর এ আত্মপ্রসাদটুকু—এ সম্পদটুকুও তাহার কঠিন হৃদয় অপ্রসন্ন ভাগ্যদেবতার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তাই সেই বিরাট কর্ম্মপুরুষ তাঁহার অনতিক্রমণীয় খড়্গখানি লইয়া কমলার এই সুখ তরুর মূলে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।

৩

এক দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া যোগেশচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটা ক্ষেত্রে গোরাদের 'টারগেট' অভ্যাস করিবার একটা স্থান ছিল; এই স্থানটি যোগেশচন্দ্রের গৃহে ফিরিবার পথের উপর! এই স্থানটির নিকটে আসিতেই একটা অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি যোগেশচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। একটা পলায়মান কৃষককে বিস্তর আশ্বাস দিয়া তাহার নিকট হইতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগ্রহ করিলেন, তাহা এইরূপ;—আজ মধ্যাহ্নের পর দুইটা গোরা এ দিকে আসিয়াছিল। হারাধনের জমীতে তরমুজ দেখিয়া গোরা দুটো সেগুলা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে হারাধনের পুত্র গোবর্দ্ধন তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। গোরা দুইটা ইংরাজীতে গালি দিতে দিতে বন্দুকের বাঁট দিয়া তাহাকে এমনই আঘাত করিয়াছে যে, তাহার একখানা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গোরারা ইহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। এখন তাহারা নিকটস্থ ক্ষেত্রসমূহে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল, সাহেব বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া সে পলাইতেছে। ক্রুদ্ধ যোগেশচন্দ্রের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা একটা আগুনের গোলার মত ঘুরিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কোথায় সে গোরা দুটো?" শঙ্কিতচিত্ত কৃষক হাত বাড়াইয়া কহিল, "ঐ হানিফের ক্ষেতে ঢুকেছে!" "তুই আয় আমার সঙ্গে, দেখি পাজীগুলো কত বড় পালোয়ান!" এই কথা বলিয়াই যোগেশচন্দ্র হানিফের ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিলেন! অল্প অগ্রসর হইয়াই তিনি একটা গোরাকে লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত দেখিলেন; তাড়াতাড়ি রোষদীপ্তস্বরে কহিলেন, "তোমার এ ভারি অন্যায় হচ্ছে! গরীব চাষাদের এরূপ ক্ষতি করা Downright robbery"। গোরা অবজ্ঞার স্বরে কহিল, "তুমি কে গো বাবু, হুকুম দিতে আসলে? এখনই শিক্ষা পাইবে।" যোগেশচন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "চুপ রও বেয়াদব! ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখ সামলাইয়া কথা কহিস!" "ভদ্রতা শিখাইতে আসিয়াছ, কালা রাস্কেল!" বলিয়া

যোগেশচন্দ্রের [illegible]রে গোরা একটা বুটের ঠোকর দিল। যোগেশ তখন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গোরার উপর পড়িয়া তাহাকে প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিতে লাগিলেন। গোরাটা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় তাহার সঙ্গী গোরা ছুটিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটা পতিত বংশদণ্ড লইয়া যোগেশচন্দ্রের মস্তকে আঘাত করিল। যোগেশ তখন প্রথম গোরাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়ের মস্তকে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিলেন। সে "By jove, beaten to jelly" বলিয়া ঘুরিয়া সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ যোগেশ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "Rogues! নিজেদের হাতে প্রতিকারের ভার লইয়া বলিয়া তোদের আস্পর্দ্ধা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।"

ধনঞ্জয় লাফ করিয়া প্রথম গোরা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু দ্বিতীয় গোরা গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তারিণীশঙ্করের অল্প বন্ধুত্ব ছিল। তিন চারি দিনের মধ্যেই তারিণীশঙ্করও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন।—"অপরাধীকে ধরিয়া দিতে হইবে; নচেৎ ভারী অন্যায় হইবে!" তারিণীশঙ্কর উত্তর দিলেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার আরও পাঁচ ছয়খানি পত্র ব্যবহার চলিল। অবশেষে একদিন যোগেশচন্দ্র তারিণীশঙ্করের সহিত সাহেবের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন। তখন স্কুলের কার্য্য আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। "দীপালী" পত্রিকা আবার প্রবন্ধগৌরবে সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। জমীদারের মাষ্টারে রীতিমত সাহিত্যচর্চ্চা হইতে লাগিল। কেবল যোগেশের সংসারে দু' একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল;—যোগেশের বৃদ্ধা পিতৃস্বসা ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, এবং কমলা একটি মৃতসন্তান প্রসব করিল।

বিধাতা যখন প্রসন্ন হন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের দানগুলি যেমন বর্ষার ধারার ন্যায় অজস্রভাবে ভাগ্যবানের শিরে বর্ষিত হয়, তখন যেমন ভাগ্যবানের ভস্মের মুষ্টিও কনকের মুষ্টিতে পরিণত হয়, তেমনই বিধাতা অপ্রসন্ন হইলে বিপদগুলি যেন বিষধর সর্পের ন্যায় মানবজীবনের শতসহস্র ছিদ্রপথ দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ ফণা উদ্যত করিয়া বাহির হইয়া হত-ভাগ্যকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে! কোনও দিকে সামলাইবার অবসরটুকুও তাহার দুরদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না! জানি না, ইহাতে এই দুঃখের

অটল বিধাতা পুরুষটির কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হয়! কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উত্তরোত্তর দুর্ঘটনা আসিয়া হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই ক্ষমতাপন্ন অদৃশ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে, বলহীন মানব-সন্তানের এমন কি ক্ষমতা আছে?

উক্ত ঘটনায় দুই তিন মাস পরে কয়েকটি সাহেব চাকদালিতে শিকার করিতে আসিল। সাহেবদের বিরাট তাম্বুর চারি পার্শ্বে গ্রাম্য নরনারীর কৌতূহলদৃষ্টি তাহাদের নিকট বেশ কৌতুককর মনে হইল। নিরীহ গ্রামবাসীদিগের লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়া দুই একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলে যখন তাহারা তাহাদিগের পলায়নশক্তির পরিচয় প্রদান করে, তখন সাহেবরা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের ভীতি বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে! ব্যাপারটা যদি এই অবধি আসিয়া থামিয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়, এবং কোনও পক্ষেরই উদ্বেগ বা অভিযোগের কোনও কারণ ঘটে না। কিন্তু হায়! এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাচক্রগুলির সঙ্গে যোগেশচন্দ্র ও কমলার অদৃষ্টচক্রও যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য গতির বশে ঘুরিতেছিল, তাহা ত কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না; তাই এক দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইটি কৃষক-রমণী নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহারা যখন নদীর জলে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল, তখন পীটার ধীরে ধীরে নদীতীরবর্ত্তী বাবলাগাছের ঝোপের পাশে আসিয়া লুকাইল। সরলা গ্রাম্য-নারী দু'টি তাহা দেখে নাই, তাহারা তখন নির্জ্জন ঘাটে আপনাদের সুখ দুঃখের আলোচনাতেই একান্ত ব্যস্ত ছিল। সহসা একটি রমণীর পীটারের দিকে দৃষ্টি পড়িলে সে চুপি চুপি তাহার সখীর কাণে কাণে কহিল, "ওলো শশী! দেখিচিস—সাহেব রয়েছে!" স্বামিগৃহ-প্রত্যাগতা কিশোরী শশী বড় শঙ্কিতা হইল; সে কহিল, "কি হবে বৌ?" "কি আর হবে? তাড়াতাড়ি 'দুর্গা' নাম করে পালাই চ'!" তাহারা জলের কুম্ভ কক্ষে করিয়া আপনাদিগকে যথেষ্টপরিমাণে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া কম্পিত ও ত্রস্তচরণে গ্রামের পথে চলিতে লাগিল। শশী ভয়ে তাড়াতাড়ি চলিতে পারিতেছিল না। খানিকটা পথ অতিক্রম করিতেই সে তাহার পৃষ্ঠদেশে করস্পর্শ অনুভব করিল। ভয়ে কুম্ভ ফেলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভ্রাতৃবধূ যখন পশ্চাতে

ফিরিয়া দেখিল, যে, সাহেবটা শশীর হস্তধারণ করিয়াছে, তখন সে ভয়ে চীৎকার করিয়া অদূরবর্ত্তী কৃষকের বাড়ীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সাহেব শশীর হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল,—"My darling! ডুর করিয়ো না,—হামি কি বাঘ আছে যে টুমারে খাইয়া ফেলিবে? হামি টুমারে ভালবাসিবে!" শশীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তখন সাহেব তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, শশী সবলে তাহার বস্ত্র সংযত করিয়া আক্রোশে সাহেবের হাতে দংশন করিল। "O You * *—you bitch" বলিয়া সাহেব তার হাত ছুটা ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া সজোরে তাহার উদরে সবুট পদাঘাত করিল। শশী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো বাবা গো, মা গো, সাহেবে মেরে ফেল্‌লে গো!" পীটার তাহার চীৎকারে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া যেমন তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে, অমনই পশ্চাৎ হইতে কে তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া সবলে আকর্ষণ করিল। সাহেবকে তাহার এই আকস্মিক শত্রুটির মুখ চোখ দেখিবার অবসরমাত্র না দিয়া আগন্তুক সাহেবের নাকে মুখে ভীষণভাবে ঘুঁসি চড় মারিতে লাগিল। সাহেবের নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পরে আগন্তুক তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "You are rightly Served to-day, you devil." পরে শশীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"শশী, কোনও ভয় নাই,—আমি এসেছি!" "কে যোগেশ দা'?" শশীর তেমন চৈতন্য ছিল না; সে তখন অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। নদীর ধারে বেড়াইতে আসিয়া যোগেশচন্দ্র সহসা রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন। উঃ, খুব সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি! যদি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'ত!—একটা অমূলক আশঙ্কায় যোগেশের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সাহেবকে তদবস্থায় রাখিয়া যোগেশ শশীকে বাড়ী রাখিয়া আসিলেন।

এ সংবাদ প্রচ্ছন্ন রহিল না। পর দিন গ্রামময় রাষ্ট হইল,—একটা সাহেব ছিদামের কন্যার উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, এবং মাষ্টার মহাশয় তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন!

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তারিণীশঙ্করের তলব হইল। তারিণীশঙ্কর তাহার চাপকান জোব্বা আঁটিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রুষ্টস্বরে কহিলেন, "এরূপ অত্যাচারে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট

আরও দুই একটা কড় কথা বলিলেন। তাহার উত্তরে তারিণীশঙ্কর কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "সাব্! আমিও বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছি; এরূপ অপরাধীকে আমার এলাকায় আর স্থান দিব না। তাহার জন্য আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারি না। আমি নিজে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!" "দোষী কে?" "যোগেশ মাষ্টার।" "The Scoundrel, the rogue!"

গম্ভীরমুখে বাড়ী ফিরিয়া তারিণীশঙ্কর একখানি পত্র লিখিলেন, এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরতরকণ্ঠে ভৃত্যকে কহিলেন, "যোগেশ বাবুকে দিয়া আয়।"

খোলা জানালার ধারে বসিয়া যোগেশচন্দ্র তখন ছাত্রদের অনুবাদ-পত্র সংশোধন করিতেছিলেন। ভৃত্য বেহারী পত্র দিল। পত্রপাঠ করিয়া যোগেশচন্দ্র জড়পুত্তলীর ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘন কালো মেঘে তখন আকাশের আপ্রান্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে অনিবিড় বনখানা নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। কচিৎ দূর হইতে কৃষকের কর্কশকণ্ঠের তানলয়হীন গ্রাম্যগীতির স্বর শোনা যাইতেছে। আজ সহসা যোগেশের চিত্তাকাশ একটা সুনিবিড় কৃষ্ণ মেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে; তারিণী লিখিয়াছেন,—"আমি আর সহ্য করিতে পারি না। তোমার এইরূপ অন্যায় স্পর্দ্ধায় আমার জমীদারী নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সাহেবকে মারিবার কি এত প্রয়োজন ছিল? তোমাকে গ্রাম ও চাকরী পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ হইতে তোমার সহিত আমার সমস্ত সৌহৃদ্যবন্ধন ছিন্ন হইল।" সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ভালবাসার বন্ধন এক কথায় ছিন্ন করিতে হইবে? কেন? কি অপরাধে? যোগেশের চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সহসা কক্ষের বাহিরে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া যোগেশ তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তারিণী বাবুর চাকর চিঠির জবাব চাচ্ছে!" যোগেশ কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। কমলা নিকটে আসিয়া কহিল, "চিঠির জবাব দেবে না?" যোগেশ তবু নিরুত্তর রহিলেন। কমলা তখন যোগেশের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া তুলিল। যোগেশ অর্থহীন দৃষ্টিতে কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে কোনও ভাব ছিল না; যেন পুতুলের চিত্র করা চোখের মত! কমলা কহিল, "এ কি? মুখ এত ভার কেন? কি ভাবছ?" "কিছু না।"—"কিছু নয় কি? হাঁ—তুমি ভাবছ। বলবে না আমাকে? লক্ষ্মীটি বল, আমার

বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে! কি ভাবছ বল?" কমলার চোখ দুটি ছল ছল করিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগেশ কহিলেন, "অনেক দিনের স্নেহের বন্ধন আজ ছিন্ন কর্‌তে হবে কমল! মনিবের হুকুম হয়েছে।" "সে আবার কি? আমি বুঝতে পারছি না!" তখন যোগেশচন্দ্র কমলার নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া তারিণীর পত্রখানি দেখাইলেন। পত্রপাঠান্তে রুদ্ধকণ্ঠে কমলা কহিল, "এখন কি কর্‌বে?" "তুমি কি কর্‌তে বল?" "অত্যাচারী সাহেবকে মেরে ত তুমি অন্যায় কর নি। তার জন্যে যদি চাকরী ছাড়তে হয় ত এখনই ত্যাগ কর।" "তার পর?" "তার পর কি?" "পেটটা চালাতে হ'বে ত?" "নিশ্চয়! রাণীহাটের বাড়ীতে চল,—তুমি চাষ কর্‌বে, আমি পৈতে বেচিব, মুড়ি বেচিব, তাতেও ঢের সম্মান, ঢের সুখ!" "কমল! তোমার মত যার স্ত্রী, কে তা'কে আশ্রয়হীন করে? তুমি সত্যই আমার কমলা!" বলিয়া সজলনয়নে যোগেশচন্দ্র কমলার অধরে চুম্বন করিলেন। তারিণীশঙ্কর উত্তর পাইলেন, "কাল বিকালে আপনার গ্রাম পরিত্যাগ করিব;—এত কালের বাস উঠাইতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই এই অবকাশটুকু শুধু ভিক্ষা চাহি!" পত্রপাঠ করিয়া তারিণীশঙ্কর রুমালে চোখ মুছিলেন। বেদনার গুরুভার তাঁহার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল। সে রাত্রে তারিণীশঙ্করের ভাল নিদ্রা হইল না; সমস্ত রাত্রি নিতান্ত অধীরভাবে তিনি কক্ষসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় পায়চারী করিয়া বেড়াইলেন;—চিঠিখানা বড় রূঢ় হইয়াছে, কিন্তু হায়, উপায় নাই!

পর দিন বাহির হইতে আসিয়া যোগেশ কহিলেন, "কমল! এইবার তোমাকে একটা কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে!" "কি কষ্ট?" "তোমাকে বেহারীর সঙ্গে রাণীহাটে যেতে হবে!" রাণীহটে যোগেশের জন্মভূমি। "আর তুমি?" "আমার ত এখন যাইবার যো নাই।" "কেন?" "মকদ্দমার জন্য আমাকে জেলায় যেতে হবে!" বিস্তর অশ্রু, আবেদন ও অনুনয়ের পর কমলা যোগেশের প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন বেহারীকে সব কথা বুঝাইয়া দিয়া যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! তোমার মাকে দেখো, আর কেউ নেই!" চোখের জল মুছিতে মুছিতে বেহারী কহিল, "সে জন্য ভেবো না, বাবা,—যত দিন আমি আছি, তত দিন কিছু ভেবো না। আমার মাকে দেখ্‌বো, এ আর বেশী কথা কি বাবা? কিন্তু তুমি কবে ফির্‌ছো?" মলিন হাসি হাসিয়া যোগেশ কহিলেন, "ভগবান যে দিন ইচ্ছা কর্‌বেন, বেহারী! সেই

দিনই আমি বাড়ী ফিরিব। বাড়ী ছাড়া আর কোথায় আমার মাথা গোঁজবার জায়গা আছে, বেহারী?”

৪

মকদ্দমায় যোগেশের হার হইল। সাহেবের ব্যারিষ্টার বেশ করিয়া বুঝাইল যে, মিষ্টার পীটার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তাঁহার কোনও প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না। সেখানে এই গ্রাম্য অশিক্ষিতা 'নেটিভ' স্ত্রীলোক দুটিকে ভয় পাইতে দেখিয়া কেবল বলিয়াছিলেন, “আমি ত বাঘ নহি,—ভয় কেন?” আপনারা নির্ভয়ে পথ দিয়া চলিয়া যান।” এমন কি, সাহেব তাঁহাদিগকে 'সিষ্টার' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরক্ষর রমণীগণ তবু ভয় পাইয়া চীৎকার করে। তখন আসামী আসিয়া সাহেবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। সাহেব ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত শিক্ষাগর্ব্বিত বাঙ্গালীটা কোনও কথায় ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সাহেবদের মারিবার জন্য লোকটার একটা 'ম্যানিয়া' আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে নির্দ্দোষ গোরাকে মারিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। লোকটা বন্য ভল্লুকের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে।” যোগেশের স্বপক্ষে যতগুলি যুক্তিতর্ক ছিল, সমস্তই ব্যারিষ্টার সাহেবের বক্তৃতা ও আস্ফালনের স্রোতে ভাসিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন যোগেশচন্দ্রকে এক বৎসরের কারা-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। যোগেশচন্দ্র কহিলেন, “পাপীকে শাস্তি দিয়াছি; সে জন্য যদি জেলে যাইতে হয়, তবে হে ভগবান্! তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না! কিন্তু কমল—” অসীম বলে যোগেশ অশ্রুসংবরণ করিলেন।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশ এই মকর্দ্দমার ফল জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কমলা অচিরেই এই সংবাদ অবগত হইল। সে তখন পাগলিনীর ন্যায় তাহার পিতৃব্যের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। পিতৃব্য কহিলেন, “আমি এত টাকা এখন কোথায় পাব। ছিঃ। অমন গোঁয়ার্ত্তুমি করতে আছে! সাহেবের গায়ে হাত! মনে করতেও গায়ে কাঁটা দেয়। দুর্গা শ্রীহরি!”

বেহারী স্বোপার্জ্জিত যাহা কিছু সমস্তই বাহির করিয়া দিল। কমলা নিরলঙ্কারা হইল।—বিস্তর অর্থব্যয়ে আপীল হইল। কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ধনী স্বব্যয়ে এটর্ণী নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রথম বিচারকের রায় অবিচলিত রহিয়া গেল। এক দিন অপরাহ্ণে যোগেশচন্দ্রকে কারা

প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কারারক্ষক সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ করিল।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস,—অবশেষে বারটি মাস কাটিয়া গেল। নানারূপ দুর্ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়া শ্রাবণ মাসের একটি মেঘমুক্ত প্রভাত স্নিগ্ধ অরুণ-রশ্মির মুকুট পরিধান করিয়া দেখা দিল। এই দিন প্রাতঃকালে যোগেশচন্দ্র হরিণবাড়ীর জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ এক বৎসর পরে আজ প্রকৃতির মুক্ত আনন্দের মধ্যে যোগেশচন্দ্রের দুশ্চিন্তার ভার অনেক কমিয়া গেল। কিন্তু হায় রে মানব-জীবন! যদিও এ জগতে তাহার সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপক্রম ঘটে, তবু বুকের এক কোণে যে একটি ক্ষুদ্র 'কিন্তু'র মেঘ দেখা দেয়, সে মেঘটুকু কিছুতেই ঘোচে না রে, কখনও ঘোচে না! আজ স্বাধীনতা পাইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিতেই যোগেশচন্দ্রের নয়নসমক্ষে অনশনক্লিষ্টা, প্রতীক্ষাকারিণী, চিন্তাপীড়িতা, সাধ্বী পত্নীর দীন অথচ লক্ষ্মীশ্রীবিচ্ছুরিত মুখচ্ছবিখানি ফুটিয়া উঠিল! অমনই তাঁহার সমস্ত প্রাণ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় রাণীহাটে উড়িয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! বেলা দুইটার পূর্ব্বে ত ট্রেণ নাই!

সহসা একটা পাগড়ী-পরা দরোয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু আপনাকে ডাকছেন।" "কে বাবু?" "ঐ গাড়ীতে।" যোগেশ দেখিল, পথের অপর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানি 'ল্যাণ্ডো'তে একটি বাবু বসিয়া। যোগেশ নিকটে আসিতেই বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার করকম্পন করিয়া কহিলেন, "আপনারই নাম যোগেশ বাবু? আপনই 'দীপালী'র সম্পাদক?" "আজ্ঞে, আমারই নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" "আমাকে আপনি বোধ হয় জানেন না; আমার নাম শ্রীহেমন্তকুমার মল্লিক।" ইনিই সেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী হেমন্ত মল্লিক। অভিবাদন করিয়া যোগেশ কহিল, "আপনিই আমার জন্য এটর্ণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন?" মৃদু হাসিয়া হেমন্ত বাবু কহিলেন, "কোনও ফল হয় নি! যাক্, আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে।" "বলুন।" "আমি একখানা মাসিকপত্র বাহির করিব; আপনার ন্যায় তেজস্বী সম্পাদকের হাতেই সেখানি অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। আর—" "আর কি!" "আমার পুত্র দুটির শিক্ষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর ন্যস্ত করিতে চাই। তাদের মানুষ করে' তুল্‌তে হবে। এতে

অনুগ্রহ করে আপত্তি করিবেন না।” গদগদকণ্ঠে কৃতজ্ঞ যোগেশ কহিলেন, —“আপনি আজ বুভুক্ষুকে অন্নদান করিলেন। দেশে আমার স্ত্রী আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা—” “নিশ্চয়! তাঁ'কে এখানে নিয়ে আসবেন। ক'টায় ট্রেণ?” “বেলা দু'টায়।” “এখন তা' হ'লে আমার কুঠিতে গিয়ে স্নানাহার করতে হচ্ছে। আর একটি কথা,—আপনার বাড়ী আমি বন্দোবস্ত করে দেব, আর আপনার খরচের জন্য যা আবশ্যক—” কৃতজ্ঞতায় যোগেশের চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, “হেমন্ত বাবু! আমাদের বিপন্ন পরিবারকে কিনিয়া রাখিলেন।” “আপনাকে বন্ধু লাভ করে আজ আমার কত আনন্দ, তা' প্রকাশ করে বলতে পারি না। বাঙ্গালীর ভিতরে যে মনুষ্যত্ব এখনও লোপ পায় নাই, আপনি তা'র সুন্দর প্রমাণ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার নির্ভীকতা ও সৎসাহসের প্রশংসা করি।” সপ্রীতিসম্ভাষণে হেমন্ত বাবু যোগেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন; কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

৫

যোগেশচন্দ্র যখন রাণীহাটের পথ ধরিয়া আপনার জীর্ণ অট্টালিকার দিকে চলিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। সুষুপ্ত গ্রামখানি নিস্তব্ধ। শ্রাবণ মাসের রাত্রি। একটু পূর্ব্বেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতা হইতে টুপ টাপ করিয়া জলের ফোঁটা পড়িতেছে। গ্রামের শুষ্ক ডোবাগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে অসংখ্য ভেকের কর্কশ স্বর উত্থিত হইতেছে। কালো মেঘের পর মেঘের স্তর আসিয়া জমিতেছে। চারি দিক যেন মসীলিপ্ত! আকাশে তারা নাই, চাঁদ নাই! বড় বড় গাছের ঝোপগুলির চারি পার্শ্বে দ্যুতিমান জোনাকীগুলা কালো মখমলে খচিত চুম্‌কির ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে! সুগম্ভীর ঝিল্লী-ধ্বনিতে আড়ম্বরহীন গ্রামের সরল সঙ্গীতরাশি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

গৃহের সম্মুখে আসিয়া যোগেশ ডাকিলেন, “বেহারী!” কোনও উত্তর পাইলেন না। যোগেশের বুকের রক্ত সোঁ সোঁ শব্দে মাথায় উঠিতে লাগিল। রক্তের এই সবেগ গতির শব্দটা যেন যোগেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। পায়ের কাছ দিয়া একটা সরীসৃপ সর্ সর্ শব্দে সরিয়া গেল। আশঙ্কা ও উদ্বেগে যোগেশের বক্ষঃ-স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া যোগেশ আবার ডাকিলেন, “বেহারী!” “যাই” বলিয়া প্রদীপহস্তে

এক জন বৃদ্ধ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এ কি বেহারী? এক বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! বেহারীকে যে মোটে চেনা যায় না! যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! আমি এসেছি।" মুখ তুলিয়া বেহারী কহিল, "কে? বাবা! এসেছ?" বেহারীর স্বর ফুটিল না। সে মস্তক নত করিয়া প্রদীপহস্তে চলিল; যোগেশও নির্ব্বাক স্তম্ভিতভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! বাড়ীর সব ভাল ত? কমল ঘুমুচ্ছে বুঝি?" কথাটা বলিতেই যোগেশের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততালে সম্পন্ন হইতে লাগিল। যোগেশ তাঁহার অত্যন্ত পুরাতন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কত দিন, কত দিন পরে সজ্জিত কক্ষ, সজ্জিত শয্যা দেখিয়া যোগেশ যেন গৃহের সজ্জাকর্ম্মনিরতা লক্ষ্মী পত্নীর কোমল করপল্লব দু'টি স্পষ্ট চক্ষে দেখিতে পাইলেন; এবং তাহার হাতের চুড়ির টুং টাং শব্দটাও না ঐ শুনা যায়! আজ যোগেশ গৃহে ফিরিয়াছেন,—পত্নীর সুকুমার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—কমল কত সুখী হইবে! যোগেশ ভাবিলেন, "আঃ! এ কি বিরাট অপূর্ব্ব আনন্দ! কি অসহ্য হৃদয়প্লাবী সুখ!" যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! কমল কোথায়?" বেহারী প্রদীপের শিখাটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে কহিল, "স্বর্গে!" "সে কি কথা বেহারী? আমার কমল—?" যোগেশের মনে হইল, কে যেন তাঁহাকে অনেকখানি উর্দ্ধে তুলিয়া সহসা সবলে একটা বিপুল অন্ধকারময় অতল গহ্বর-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া যোগেশ কহিলেন, "কবে হল?" "আজ তিন দিন! কোনও মতে মাকে ধরে রাখ্‌তে পারলুম না,—কোনও মতে না,—উঃ! কি যে জ্বরে ধরলে—ওঃ! আর তিনটে দিন শুধু!" বেহারী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; তাহার হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল। কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। বেহারীও মাটীতে বসিয়া পড়িল।

আজ দীর্ঘকাল পরে যোগেশ গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহার এ আনন্দে সহানুভূতি করিবার জন্য, তাঁহাকে আনন্দপূর্ণ নয়নের সপ্রেম চাহনিতে অব্যক্ত সুখের হাসির সহিত আবাহন করিয়া লইবার জন্য, কেহ ত দ্বার-প্রান্তে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া নাই! আজ তাঁহার প্রতীক্ষাকারিণী হৃদয়-লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যোগেশের বাহুদ্বয় যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু হায়! সে ত নাই!—কাছে নাই, দূরে নাই, কো[illegible] নাই!

সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর ফিরিবে না—যোগেশচন্দ্রের সহস্র কাতর অনুনয়েও সে ফিরিবে না! একরাশি দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া যোগেশের অস্থিপঞ্জরগুলা চূর্ণ করিবার উপক্রম করিল।

তখন বাহিরে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল; খোলা জানালার ভিতর দিয়া বিদ্যুতের রোষদীপ্তি গৃহমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মত্ত পবন প্রলয়-হুঙ্কারে বিশ্ব-সংহারে উদ্যত হইল। সেই প্রবল ঝড়ে গাছের পাতা ও শুষ্ক ছোট বৃক্ষশাখাগুলি ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিতে লাগিল; এবং বাহির হইতে যেন একটা তীব্র মর্ম্মান্তিক পরিহাসধ্বনি যোগেশের নিষ্ফল আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া উৎকট আনন্দে "হা, হা" করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে বিদীর্ণ হৃদয়ের সমস্ত বেদনা, সমস্ত শোক, সমস্ত হাহাকার করুণ-কম্পিত-স্বরে ঝঙ্কৃত করিয়া বিষাদ-কাতর যোগেশচন্দ্রের মর্ম্মের ভিতর হইতে একটিমাত্র বিলাপ-ধ্বনি উচ্চলোকবাসিনীর উদ্দেশে উত্থিত হইল,—"হা কমল!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য।

—:*:—

রাজদরবারে প্রবেশলাভ করিয়া বঙ্গভাষা অনুবাদ-গ্রন্থগুলির দ্বারা নবশক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত এই ভাবে ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে ইহা এরূপ বিশুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ভারতীয় সমস্ত কথিত ভাষার মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এমন কি, বীমস্ সাহেব ইহাকে "তদ্ভব" আখ্যা প্রদান করিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে ইহার পৃথক পংক্তিতে আসন স্থাপন করিয়াছেন। "তদ্ভব" শব্দটি তিনি দণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দী প্রভৃতি ভাষা "তৎসম", কিন্তু বাঙ্গালা "তদ্ভব," অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলা আদিকালে হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ন্যায়ই ছিল। কিন্তু গত ৪।৫ শত বৎসর কাল যাবৎ এই ভাষা উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হওয়াতে, ইহা এখন অনেকপরিমাণে সংস্কৃতানুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আভিধানিক সংশোধনে ভাষার মূল তত্ত্ব রূপান্তরিত হয় না। যে নিয়ম হিন্দী,

আসামী প্রভৃতি ভাষায় লক্ষিত হয়, [illegible] শব্দের বাহুল্য [illegible] নিয়মেরই বশবর্ত্তী। প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলি [illegible] বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, বীমস্ সাহেবের শ্রেণীবিভাগ আমাদের অনুমোদিত নহে। অনুবাদ-চেষ্টাই বাঙ্গালা ভাষার গতি সংস্কৃতের দিকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। অনুবাদ-সাহিত্য আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা ভাষা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ডাকের বচন প্রভৃতি অতি প্রাচীন রচনায় গ্রাম্য ভাষাই প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিতে এরূপ বহু শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। অনুবাদকারিগণ যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে চয়ন করিয়া বাঙ্গালার ভাণ্ডারে উপহার দিলেন, তাহা শুধু আবদ্ধ মূলধনের ন্যায় উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গীয় হইয়া রহিল না, কথিত ভাষায় তাহাদের প্রভাব অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা ভাষা এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সংস্কৃতমুখী গতি এখনও থামে নাই, বরং বর্ত্তমান সময়ে তাহা এত প্রবল হইয়াছে যে, এই ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের আত্মসাৎ করাইবার চেষ্টায় অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

প্রাচীন পুঁথিতে কাতি (কার্ত্তিক মাস), পথা (পক্ষ), বিভা (বিবাহ), পুনি (পুনঃ), বিনি (বিনা), আই (মাতা), পইতায় (প্রত্যয় হয়), সিনেহ (স্নেহ), উমতি (উন্মত্ত), মরঙ্ক (মৃগাঙ্ক), বালা (বালক), লো (লহরী), বরিযাত্তি (বরযাত্রী), আগুসারী (অগ্রসর হইয়া), আগল (অগ্রসর), জেঠি (জ্যেষ্ঠী), আগুনি (অগ্নি), গাবী (গাভী) প্রভৃতির প্রয়োগ বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়; এই সকল অপভ্রংশ শব্দ ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় সংস্কৃত শব্দে পরিণত হইয়াছে,—প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যে এই শব্দ-বিশুদ্ধির চেষ্টা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। কবীন্দ্র-রচিত মহাভারতে "ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান ভীম দুর্গতি বারণ। পুণ্যকীর্ত্তি গুণাম্বাধী পরাগল খান।" কিংবা, "সূর্য্য সমান জ্যোতিঃ সহস্র বজ্রসম। চারি পাশে স্ফুরতেজঃ যেন কাল যম।" প্রভৃতি ভাবের সংস্কৃতাত্মক পদ প্রথম লক্ষ্য করিয়াছি। কাশীদাসী মহাভারতে এই চেষ্টা বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল;—"চলৎচপলারূপ কিবা বরকায়া", "দ্বিকরকমল, কমলাঙ্ঘ্রিতল" "নিকলঙ্ক ইন্দুজ্যোতিঃ পীনঘনস্তনী", "পত্রপত্র,

মুগ্ধনেত্র পরশয়ে প্রতি" প্রভৃতি পদ প্রায় খাঁটী সংস্কৃত। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের অনুবাদক গিরিধর-কৃত পদগুলি বাঙ্গালা না জানিলেও [illegible] পণ্ডিতমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। দেবনাগর [illegible] কাশী ও পুনার ব্রাহ্মণ-সভায় অনুবাদের রসাস্বাদনে কোনও বিঘ্ন হই[illegible] একটি অংশ এইরূপ :—

"যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ।
কর অভিসার, [illegible] মনোহর বেশ,
গমনে বিলম্বন, [illegible] বিজয়িনী, চল চল প্রাণনাথ-পাশে
* * * * *
অতি তমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়ণি দেহ অঙ্গে"।

কিন্তু এই অনুবাদ-সাহিত্যে কবি আলওয়াল যতটা সংস্কৃত-মূলক ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোনও প্রাচীন কবি তাহা পারেন নাই। "প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুহুত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে। মলয় সমীর, সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত গতি অতি রসভাবে। প্রফুল্লিত বনস্পতি [illegible] তমাল দ্রুম, মুকুলিত চূতলতা কোরকজালে। যুবজন-হৃদয় আনন্দে পরি-পূরিত রঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে।" প্রভৃতি রচনায় দৃষ্ট হয়, সংস্কৃত-সাহিত্যজ্ঞ অনুবাদকগণ গ্রাম্য বাঙ্গালাকে এক নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলওয়াল-রচিত সংস্কৃতাত্মক পদ্মাবতী গ্রন্থখানি পারসী অক্ষরে চট্টগ্রামে লিখিত পাওয়া গিয়াছিল।

কবিগণ অনুবাদকল্পে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিতে যাইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে যে নূতন আদর্শ প্রদান করিলেন, তাহা অনুবাদ-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; সমস্ত সাহিত্য-রাজ্যে সেই আদর্শ গৃহীত হইল। আনন্দময়ী দেবীর রচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা বঙ্গভাষার যে আকার লক্ষ্য করি, তাহা যদি সংস্কৃতের মত ললিত বলিয়া আমরা অঙ্গীকার করিতে নাও পারি, অন্ততঃ তাহার প্রতি ছত্র বুঝিতে যে ২।৩ বার করিয়া শব্দকল্পদ্রুম কি অপর কোনও সংস্কৃত অভিধান দেখিতে [illegible], তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং আনন্দময়ীর সমকালে ভারতচন্দ্র যথন কৃষ্ণনগরে বসিয়া [illegible] শিবের শঙ্কর ভুবনমোহন গঙ্গাধর শেখর দিগম্বর। জয় শ্মশান নাটক, [illegible] ম[illegible]। জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন, [illegible]। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক,

মহেশ্বর [illegible] লিখিয়াছিলেন, তখন উহা সংস্কৃত কি বাঙ্গলা, তাহা কহিয়া যান নাই। বাঙ্গালা পুঁথিতে পাইয়া শ্লোকগুলিকে আমরা বাঙ্গালা বলিয়া [illegible] দিয়েছি।

[illegible] কাশীরাম ও কবীন্দ্রের মহাভারতের সময় হইতে আবার গতি সংস্কৃতের দিকে ফিরাইয়া শব্দ-শোধন করিবার যে চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা এখনও কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রতি বৎসরই প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তর্ক উঠিতেছে, এবং যে [illegible] ব্যবহারসিদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় ভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হইয়া গিয়াছে, এমন পুত্রাদি শব্দগুলিরও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উৎপত্তি-স্থলে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। অনুবাদের চেষ্টার বন্যাই এই উজান স্রোত প্রথম বহাইয়াছিল। ইহা কত কাল চলিবে, বলা যায় না।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যা এত বেশী যে, দেশময় শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও আখ্যান কি ভাবে এত প্রচারলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই সকল অনুবাদ-পুস্তকে উচ্চশ্রেণীর কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; তাঁহারা সংস্কৃত, পারসী ও আরবী পাঠ করিতেন; ভাষা-গ্রন্থের লেখক, পাঠক অনেকস্থলেই নিম্নশ্রেণীর লোক। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির প্রায় সকলগুলিই সমাজের অধস্তন স্তর হইতে উদ্ধার করিয়াছি। সদ্গোপ, তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতির গৃহে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপাদান সযত্নে রক্ষিত ছিল; মধুসূদন নাপিত-রচিত নলদময়ন্তী, গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচা প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায়, ইঁহাদের সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কালীচরণ গোপ, ভাগ্যবন্ত ধুপী, রামনারায়ণ গোপ, মাঝি কাইত প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি-লেখকগণের হস্তাক্ষর বিশেষ প্রশংসনীয়।

অনুবাদ-গ্রন্থের বাহুল্যনিবন্ধন শাস্ত্রোক্ত কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। অশিক্ষিত কালকেতু ব্যাধ যখন কংস নদীর তীরে বুভুক্ষিত অবস্থায় ভাগবতোক্ত প্রমাণ চিন্তা করিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতেছে, কিংবা ফুল্লরা যখন ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে বিবিধ পুরাণ হইতে নজীর উদ্ধৃত করিয়া পতি-ভক্তির উপদেশ দিতেছে, অথবা খুল্লনা ও লহনা দেবী যখন নিজের মতের গুরুত্ব স্থাপন করিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে, তখন তাহা কবিগণের অতিরঞ্জন বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই।

পাপ্রোক্তভাবে আমাদের পল্লীগুলি এখনও পরিপূর্ণ; ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোনও দেশের অধঃস্তর সৎ সাহিত্যের সহিত এরূপ পরিচয় করিতে পারে নাই, এই জন্ত অপর দেশের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিলে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অতীব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে; দর্শনশাস্ত্রেরও দুই একখানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুস্তক দৃষ্ট হইয়া থাকে; সেগুলি অনুবাদ বলিয়া ঠিক স্বীকার না করা গেলেও, সংস্কৃত-গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতিরও প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদের কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম, তাহা হস্তগত করিতে পারি নাই। স্মৃতিগ্রন্থ-সমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে; পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার গৌরীমঙ্গল কাব্যের মুখবন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের যে তালিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে স্মৃতি-অনুবাদক রাধাবল্লভ শর্ম্মার নামে উল্লিখিত আছে। সুতরাং অনুবাদ-চেষ্টা যে নানা দিকে প্রসারিত হইয়া বাঙ্গালার পল্লীসমাজের অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতার আলোকে আলোকিত করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুসংখ্যক গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে; কিন্তু যে সকল পুঁথি গত ৪।৫ শত বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের তুলনায় প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা নগণ্য। আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রসিদ্ধ অনুবাদ-গ্রন্থগুলি ও তাহাদের রচকগণের বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

রামায়ণ।

রামায়ণের প্রথম অনুবাদ-প্রণেতা কৃত্তিবাস ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ-সংক্রান্তির দিন ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন শ্রীপঞ্চমী, চারি দিকে পূজার কাঁসর বাজিতেছিল; সেই উৎসবের দিনে নবাগত শিশুটির প্রতি সরস্বতী যে কৃপা-হাস্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। পিতামহ মুরারি ওঝা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। কবি অনেক-স্থলেই ভণিতায় আপনাকে মুরারি ওঝার নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন। তিনি পিতামহের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"মদরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি। মার্কণ্ডেয় ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।" কবি স্বীয় সুদীর্ঘ আত্মপরিচয়ে তাঁহার পারিবারিক যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহারা বল্লাল কর্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম "শ্রীহর্ষের বংশধর, কৃত্তিবাস অমিত হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে এই ছত্রটি পাওয়া যায়,—"কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।" কবি গৌড়েশ্বরের যে রাজ-সভার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। সোনার লাঠী হাতে রাজদূত নয় মহল পার করিয়া রাজ-সভায় উত্তীর্ণ করিয়া দিল; তখন মাঘ মাস। কেদার খাঁ, জগদানন্দ প্রভৃতি পাত্র মিত্রে বেষ্টিত হইয়া গৌড়েশ্বর রৌদ্র পোহাইতেছিলেন; আঙ্গিনায় বিস্তৃত রক্তবর্ণ মাদুর প্রসারিত; পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়া খাটান ছিল; তন্নিয়ে সিংহাসনারূঢ় গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে হস্তের ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে আদেশ দিলেন; কৃত্তিবাস এই উপলক্ষে যে পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রাজসভা মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং কেদার খাঁ কবির মস্তকে চন্দনের ছড়া বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ইচ্ছানুসারে দান যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। কৃত্তিবাস বলিলেন, তিনি কাহারও দান গ্রহণ করিবেন না,—"যথা যথা যাই গৌরব মাত্র সার।" রাজাজ্ঞায় তিনি সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। "চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া-পণ্ডিত।" রামায়ণ তিনি যৌবনে আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ কাণ্ড পর্য্যন্ত পঁহুছিতে বোধ হয় তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, একখানি পুঁথির শেষ-কাণ্ডের ভণিতায় এই ছত্রটি দৃষ্ট হয়,—"রচিলা কৃত্তিবাস জীর্ণশীর্ণকলেবর।"

কবি নিজে কোনও দান বা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে যে মহা দান দিয়া গিয়াছেন, তাহার অমৃত-ফল সমস্ত বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে পাঁচ শত বৎসর যাবৎ পরিবেশন হইতেছে। তাহাতে এখনও লোকের অরুচি হয় নাই। অন্যান্য যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী লেখকগণের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠাতে আদি অনুবাদকগণের নাম ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে আরও বহু লেখক রামায়ণানুবাদে হস্তক্ষেপ করিলেও, কেহ আদি কীর্ত্তিকে ছাপাইয়া উঠিতে পারেন নাই;— ইহা দ্বারাই তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হইবে।

কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুঁথিগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার অনুবাদে মূল-বহির্ভূত, তরণীসেন, বীরবাহু, মহীরাবণ প্রভৃতির যুদ্ধ ও

রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজা, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন, অঙ্গদের রায়বার, এ সমস্ত কিছুই স্থান পায় নাই; এ সকল অংশ পরবর্ত্তী কবিগণের রচনা; তাঁহার কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যবিষয়ক অধ্যায়ে আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। কৃত্তিবাস অনেকাংশে মূলের অনুগামী হইয়া অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সাধারণ পাঠক বাল্মীকির কবিত্ব যতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তিনি তাহাদিগকে ততটা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন; যাঁহাদের কূপোদকেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহাদের জন্য বৃহৎ সরোবর-খনন মিথ্যা। সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের উচ্চ-কবিত্ব বঙ্গের সাধারণ পাঠক আয়ত্ত করিতে পারিবে না বুঝিয়া, তিনি রত্নাকরের কাব্য-সিন্ধু হইতে ঝিনুকে সেঁচিয়া কয়েকটি লহরী আনিয়া দিয়াছিলেন মাত্র; তাহাতেই এদেশের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার জয়-জয়কার পড়িয়া গিয়াছে।

মিলন।

—:•:—

এ কি রূপ, এ কি রূপ, অনন্তসুন্দর!
নব নব সৌন্দর্য্যের কি লীলা-লহরী!
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে পূরি' অসীম অম্বর,
গম্ভীর মধুর মন্দ্রে বাজে কি বাঁশরী!
এ কি দীপ্তি—এ কি তৃপ্তি সুধা-প্রস্রবণ,
এ কোন নন্দন-গন্ধ জুড়াইল প্রাণ!
এ কি স্পর্শ—অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পবরিষণ,
অমিয়-সাগর-মাঝে এ কি পুণ্য-স্নান!
শত ব্যর্থ অভিসার—বিরহ-বেদন
কি বিস্ময়! সে কি ভ্রান্তি—উন্মত্ত কল্পনা?
তব আলিঙ্গনে বদ্ধ রহি' অনুক্ষণ
দেখিনু কি দুঃস্বপন,—সহিনু যাতনা?
সেই তুমি—সেই আমি, হে প্রাণবল্লভ!
এই সে চরণপদ্ম—নিখিল-দুর্লভ!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

—:o:—

ভারতের পল্লী-কাহিনী।

Morning Post-এর এক জন লেখক, সম্ভবতঃ ইংরেজ, ভারতীয় উপকথার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়া একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সুসম্বদ্ধ মত এবং যে উপকথার উল্লেখ করিয়া লেখক এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিলাম।

লেখক বলিতেছেন, ভারতবাসিগণ উপকথা-বর্ণনে তাঁহাদের উচ্চতম কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। উপকথার ভাণ্ডার পৃথিবীর অন্য জাতিরও যেমন, ভারতবাসীদিগেরও তেমনই। কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ঘটনার পর ঘটনা এক নিশ্বাসে এমন হুহু করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, গল্পের উপসংহার করিবার পূর্ব্বেই নূতন ঘটনার স্রোত আসিয়া পাঠকের কৌতূহল বর্দ্ধিত করে। তাঁহারা গল্পের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধীরে ধীরে এমন কৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন যে, উত্তরোত্তর গল্পের ভাব ও মাধুর্য্যই বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা ঘটনা সকল শুধু নীরস ঘটনারূপে বর্ণনা করেন নাই; সেই সকল ঘটনা লইয়া একটি বেশ সুসঙ্গত পরিণতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা এই সকল ঘটনা এক দিকে যেমন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, তেমনই আবার, তাহার সরলতা ও নিগূঢ় ভাব দেখিয়া কেবল উপকথামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও ইচ্ছা হয় না।

ভারতবাসীরা তাঁহাদের উপকথায় দৈবশক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল উপকথায় দৈব-শক্তি লইয়া মানুষ মানুষকে অভিভূত করিবার বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে যে সেই অমানুষিক শক্তির পেষণে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারও বর্ণনা দেখিতে পাই। ভারতীয় উপকথা ব্যতীত অন্যান্য জাতির উপকথায় এত নিগূঢ় ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাধারণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই চারিটি উপকথার উল্লেখ করিব। সকল জাতিই যাদুকরকে নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে সক্ষম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই বলেন যে, এই যাদুকরেরা পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শক্তির পরীক্ষা করিয়া থাকেন। 'ঋগ্বেদ' ও ইউরোপের 'এডা'র গল্পসমূহে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতবাসীরা এই সকল গল্প এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—প্রথমতঃ দু' জন যাদুকর পাখী হইয়া পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিবার পর, এক জন রাজ-কন্যার হাতের অঙ্গুরী হইল; আবার মানুষের আকার গ্রহণ করিয়া সেই রাজ-কন্যার নিকট হইতে অঙ্গুরী ক্রয় করিল। তখন সেই অঙ্গুরী যবের বীজ হইল। অপর মোরগ হইল, এবং সেই যব খাইতে আরম্ভ করিল। শেষে যবের বীজটি শৃগাল হইয়া মোরগটিকে মারিয়া ফেলিল। এই সকল উপকথায় এমন আশ্চর্য্য রূপান্তর-গ্রহণের নিদর্শন পাওয়া যায় যে, পাঠক নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না।

এই যাদুকরেরা সর্ব্বদাই পরস্পর পরস্পরের হস্তে জীবনাশঙ্কা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত পাঠক নিশ্চিত হইতে পারেন না যে, কে বিজয়ী, বা কে বিজিত হইবে। অবশেষে যখন আমরা মনে করিলাম যে, এই-ই মারা যাইবে, তখন দেখিতে পাই,—সেই আবার উলটিয়া তাহার বিজয়ী শত্রুর জীবননাশ করিয়া আপনাকে মুক্ত করিল। এই প্রকার উপকথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। আর একটি আশ্চর্য্য উপকথা এই;—এক ব্যক্তি কতকগুলি কৃষককে মাঠে চাষ করিতে দেখিয়াই অস্থির হইয়া পড়িল, এবং তাহার এই দুঃখের কথা আর এক জনের নিকট বলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল যে, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়াই তাহার পেটে কামড়ানি ধরিল।

ভারতীয় সাহিত্যে এই মর্ম্মের একটি অতি আশ্চর্য্য গল্প আছে। এক দিন একটি পদ্ম এক রাণীর কোলের উপর পড়ে। তাহাতেই রাণী আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। চাঁদের কিরণে আর এক রাণীর গায়ে ফোস্কা হইল। এক রাজ-রাণীর হামানদিস্তার শব্দ শুনিয়া ফোড়া হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই তিন রাণীর মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা কোমলাঙ্গী? যে রাণীর শব্দ শুনিয়াই ফোড়া হইল, তিনিই প্রধানা। কেন না, অপর রাণীরা স্পর্শজ্ঞান হইতে ক্লিষ্ট হইলেন: কিন্তু তৃতীয়া রাণী শ্রবণমাত্রেই রুগ্না হইলেন। ভারতীয় উপকথার সৌন্দর্য্য এই যে, ইহাতে এক সঙ্গে তিনটি গল্পের অবতারণা করা হইল; কিন্তু অন্যান্য দেশের উপকথায় একটিমাত্র গল্প লইয়াই কথা।

গ্রীস দেশে এই প্রকার গল্পের অভাব নাই। এক জন গোলাপের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই কাহিনীর অতি আশ্চর্য্য পরিণতি দেখা যায়। এক যুবক সাতটি গদী উপর্য্যুপরি পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিলেন, কিন্তু সেই সাতটি গদীর নীচে এক গাছা চুল ছিল; সেই চুল তাঁহার পিঠে ফুটিতে লাগিল। এই যুবকের আর দুটি ভাই ছিল। এক ভাই এক দিন এক রাজবাড়ী ভাত খাইতে গিয়া ভাতে মড়াপচা গন্ধ পাইলেন। বস্তুতঃই গোরস্থানের সন্নিকটে সেই ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। আর এক ভাই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকার গায়ে ছাগ-গন্ধ অনুভব করিলেন। এই বালিকাটি শৈশবে ছাগদুগ্ধ পান করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাহার অনুভব-শক্তি অধিক? ভারতবর্ষে প্রথম ভাইকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত করা হইয়াছে; কেন না, প্রথম ভ্রাতার অনুভবশক্তি তাহার শরীরের ফোস্কায় সপ্রমাণ হইয়াছে।

আর একটি আশ্চর্য্য ভারতীয় পল্লী-কাহিনী আছে।—এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে কুঁদিয়া একটি রমণী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় এক জন সেই মূর্ত্তি ভূষিত করিল; তৃতীয় ব্যক্তি তাহাতে ভাব-ভঙ্গীর যোজনা করিল; চতুর্থ ব্যক্তি প্রাণদান করিল। এখন প্রশ্ন, কে এই সুন্দরী রমণী পাইবার অধিকারী?

ভারতীয় এই কাহিনীর উপর তুরস্ক দেশের লোকে আরও মশলা [illegible] করিয়াছেন। তাঁহারা মীমাংসার জন্ত এক জন দারোগা, পুলিস ও কাজীকে ডাকিয়াছেন। তাঁহারা তিন জনই সেই রমণীকে আপনার বলিয়া লইয়া যাইতে চান, এবং বলেন যে, কেহ নিশ্চয়ই চুরী

করিয়া আনিয়াছে। তখন ভগবানকে বিচার করিবার জন্ত ডাকা হইল। বালিকা যে গাছের গুঁড়িতে লোকিত হইয়াছিল, সেই গাছ ফাঁক হইয়া বালিকাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

মঙ্গোলিয়াবেরা এই গল্প আর একটি গল্পের সহিত মিলাইয়াছে। একটি রাজ-কন্তা কথা কহেন না। তাঁহাকে কথা কহাইতে হইবে। তখন এক রাজা আসিয়া সেই রাজ-কন্তার নিকট এই গল্প করিলেন। কিন্তু রাজ-কন্তা কোনও কথাই কহিলেন না। তখন রাজা এমন অসম্ভব কথা বলিলেন যে, রাজ-কন্তা রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'মেয়ের বাপ মেয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মেয়ের মা তাহাকে সৃজিত করিয়াছে; তাহার শিক্ষক তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, এবং তাহার স্বামী তাহার জীবন দান করিয়াছে।'

ভিক্টর হুগোর অপ্রকাশিত পত্র।

"লে মিসরেবল্" গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য।

সংপ্রতি "লেক্‌রী ম্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্রে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বাস,—ইতিপূর্ব্বে এই পত্রখানি আর কোথাও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। হুগো ইতালীবাসী কোনও বন্ধুর নিকট পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ "Les Miserables" নামক উপন্যাসখানির রচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এই পত্রে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কতিপয় ইতালীয় সমালোচক মত প্রকাশ করেন যে, এই উপন্যাস-খানি ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত চিত্র বটে, কিন্তু ইতালীর সহিত উহার কোনও সংশ্রব ও সামঞ্জস্য নাই। ভিক্টর হুগো তদুত্তরে বলেন যে, 'গ্রন্থখানি কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্ত নহে। উহা সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোকের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে।'

তিনি লিখিয়াছেন, "সামাজিক সমস্যা সীমান্তপ্রদেশের বাহিরেও বিদ্যমান। মানব জাতির হৃদয়-ক্ষত,—যে বিরাট সুগভীর ক্ষত সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বিরাজিত, তাহা পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত নীল ও রক্ত রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যে দেশের মনুষ্য মূর্খ, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ও আশাশূন্য, যে দেশের নারী অন্নের জন্ত আত্মবিক্রয় করে, সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, যে দেশের শিশু পাঠ্যপুস্তকের অভাবে মূর্খ, গৃহের সুখনীড়চ্যুত, সেই দেশে, সেই সমাজের কুটীরে কুটীরে রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিয়া "Les Miserables" বলিয়া বেড়ায়, 'দ্বার খোল, আমি তোমার জন্তই এখানে আসিয়াছি।' সভ্যতার যে স্তরে এখন আমাদের স্থান,—উহা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে স্তরের মানব চিরদুঃখী, চির-হতভাগ্য। সর্ব্ব দেশের সর্ব্বত্রই সে অনন্ত দুঃখ লক্ষ্য করিতেছে, সর্ব্ব ভাষায় তাহার রসনা যন্ত্রণার তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিতেছে।"

"ইতালীর আকাশে যে সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি সুন্দর, তাঁহার রশ্মিজাল মনোরম, স্বীকার করি; কিন্তু আকাশের নীলিমায় দরিদ্রের ছিন্ন বসনের অভাব কি ঘুচে?"

"আমাদের স্থায় তোমাদের মধ্যেও অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অত্যাচার, ধর্ম্মোন্মাদ বিদ্যমান। তোমাদের দেশেও অন্ধ বিশ্বাসের বলে ভিত্তিহীন রীতি নীতির উদ্ভব হইতেছে। অতীতের সুবাসে ও সুগন্ধে চর্চ্চিত না হইলে তোমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোনও বস্তুই স্পর্শ করিতে চাহ না। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও নাই। তোমাদের মধ্যেও অসভ্য মঠবাসী সন্ন্যাসী ও বর্ব্বর ধর্ম্মযাজক বিদ্যমান। আমাদের স্থায় তোমাদের দেশের সামাজিক সমস্যাও জটিল। তোমাদের দেশের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে, ক্ষুধার জ্বালায় কম মরে, কিন্তু ব্যাধির যন্ত্রণায় মৃতের সংখ্যা অধিক। আমাদের অপেক্ষা তোমাদের দেশের জলবায়ুর অবস্থাও অধিক উন্নত নহে। প্রোটেষ্টাণ্ট-রূপে যে গাঢ় মেঘমালা ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইতালীতে তাহাই ক্যাথলিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কেবল সংজ্ঞার পার্থক্যমাত্র। বিশপ ও ভেস্কোভোর (Vescovo) মধ্যে অন্য কোনও পার্থক্য নাই। উভয়েই সংস্কারের বিরুদ্ধবাদী। বাইবেলের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা ও ভগবদ্বাক্যের ভিন্ন অর্থ,—এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য।

"তোমাদের দেশে দরিদ্র নাই? তোমাদের মধ্যে পরান্নভোজীর সংখ্যা অল্প? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, দেখিতে পাইবে, চক্ষের সম্মুখে মানদণ্ড দুলিতেছে, উহার এক অংশে দারিদ্র্য-পীড়িত মুমূর্ষু, অপরাংশে পরান্নভোজী,—উভয়েরই পরিমাণ সমান।

"আমাদের স্থায় তোমাদের দেশেও কি সমর-ব্যয়ের বিরাট তালিকা, শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে কৌতুকোদ্দীপক ব্যয়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত হয় না? তোমাদের নিশ্চেষ্ট বশ্যতাস্বীকারের ফলে কি অনায়াসে বর্ব্বর ক্ষাত্র-নীতির উদ্ভব হয় নাই? তোমাদের দেশের সামরিক-বিধান-বলে সৈন্যগণ মহামতি গারিবল্ডীর উপরেও অগ্নিবর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—তখনও শাসন-শৃঙ্খলা অভগ্ন ছিল না কি? গারিবল্ডীর প্রতি অগ্নিবর্ষণ করা, আর ইতালীর মূর্ত্তিমান গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ করিবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করা, একই কথা নহে কি?

"তোমাদের সামাজিক শৃঙ্খলার বিষয় আলোচনা করা যাক্। তোমাদের দেশের রমণী ও শিশুদিগকে লইয়া প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। এই দুই দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য, উহাদের রক্ষাকল্পে সমাজের মনোযোগ প্রভৃতিতে সভ্যতার ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারী নগরীর বারবনিতাদিগের অবস্থা কি নেপল্‌সের অবিদ্যাকুলের অপেক্ষা শোচনীয়? আমাদের স্থায় তোমাদেরও কি দুইটি বিষয়ে ধর্ম্মযাজকের প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিচারকের দ্বারা বিচারিত সামাজিক ব্যবস্থা, এই দুইটি বিষয়ের কি নিদারুণ অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই? হে ইতালীয়গণ! ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ জনসাধারণের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। হায় বন্ধু! হায় ভ্রাতঃ! তোমরা আমাদেরই স্থায় হতভাগ্য, আমাদেরই ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত!"

অতঃপর হুগো লিখিয়াছেন,—'Les Miserables' আমাদের ন্যায় তোমাদেরও অবস্থার দর্পণস্বরূপ। অবশ্য কেহ কেহ এই গ্রন্থের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন সত্য; তাহার কারণও আমি অবগত আছি। দর্পণে সত্য-প্রকটিত স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। তাই দর্পণ অনেকের ঘৃণার সামগ্রী। কিন্তু তথাপি সে মানবের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ; লোকে তাহার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ নহে। আমার বক্তব্য এই যে, আমি জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ফলে

সর্ব্বলোকের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। কেবল কতকগুলির [illegible] জন্য আমার [illegible] ছিল না। জীবনের পথে আমি যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্ত মানবজাতির প্রতি আমার সার্ব্বজনীন প্রীতি ধীরে ধীরে ততই বর্দ্ধিত হইতেছে।"

পত্রের শেষাংশে লেখক দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে লিখিয়াছেন,—'আমাদের সকলেরই সহিত দুঃখের সংস্রব। যখন ইতিহাস প্রথম রচিত হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র যখন সর্ব্বপ্রথম মানব-মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতেই চিরন্তন দুঃখ মানবজাতির ভূষণ হইয়াছে। হায়! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন মানবদেহ হইতে দুঃখের ছিন্ন জীর্ণবাস খসিয়া পড়িবে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে আনন্দের নবীন স্বর্গবিভার উজ্জ্বল বসনে মানবদেহ সুশোভিত হইবে!"

এরূপ পত্র সযত্নে রক্ষা ও প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা না বলিলেও চলে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:০:—

ভারত-মহিলা।—বৈশাখ। এই সংখ্যায় 'ভারত-মহিলা' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। 'ভারত-মহিলা'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীমতী হেমলতা সরকারের 'নারীজাতির শিক্ষা' আলোচনার যোগ্য। 'বীরকুমার-বধ'-রচয়িত্রীর 'শাপাবসান' নামক কবিতাটি চলনসই। শ্রীযুত হরিদেব শাস্ত্রীর 'দয়াময়ী বৌদ্ধমহিলা' উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীযুত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রৌঢ় বয়সে কবিতা-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন;—'বারাণসী-দর্শনে' তাহার প্রমাণ। শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'প্যারীসুন্দরী' মুমূর্ষু বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। "প্যারীসুন্দরী কুষ্টিয়া অঞ্চলে নীলকর-বিষধরের বিষদন্ত চূর্ণ করিয়াছিলেন। এই দুর্দ্দিনে প্যারীসুন্দরীর অবদান বাঙ্গালীর পঞ্চম বেদে পরিণত হউক। 'গার্হস্থ্য-বন্ধন' গৃহলক্ষ্মীদের উপযোগী ও উপকারী। 'ঐতিহাসিক বীরবালা' প্রবন্ধে এবার 'সোনাবিবি'র কাহিনী কথিত হইয়াছে। শ্রীমতী রাজকুমারী দাসের 'গীতোক্ত কর্ম্মযোগ' ও শ্রীযুত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর 'অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হুকহুকী মাতা' উল্লেখযোগ্য। এবারকার 'ভারত-মহিলা' চারিখানি চিত্রে সুশোভিত;—১ম,—বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি। ২য়,—কাশী। ৩য়,—মৃত যীশুখৃষ্ট। ৪র্থ,—মহিলা-কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। চিত্রগুলি প্রশংসনীয়।

আরতি।—বৈশাখ। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ভারতী' নামক কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 'ভারতে' ও 'প্রভাতে', 'প্রতিষ্ঠিত' ও 'উদ্ভাসিত', 'তাপস' ও 'তমসে' মিল অত্যন্ত কষ্টকল্পন,—এত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কবিতা লিখিতে নাই 'ধর্ম্মসমালোচনা'র বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত গঙ্গনাথ দেবশর্ম্মার 'পূর্ণানন্দগিরি ও ৺কামাখ্যা মহাপীঠ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত দুর্গাদাস ঠাকুর 'দশমহাবিদ্যা বা শক্তিতত্ত্বে' তন্ত্রের রহস্য

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' উল্লেখযোগ্য,— প্রাদেশিক 'মাসিকে'র উপযোগী। প্রত্যেক বঙ্গের প্রত্যেক জেলার এইরূপ স্থানীয় ইতিহাস প্রকাশিত দেখিবারই আশা করি। দুঃখের বিষয়, মফস্বলের পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। শ্রীযুত পাঁচকড়ি দের 'গোবিন্দরামের কীর্ত্তি' নামক উপন্যাসের সূচনায় কোনও বিশেষত্ব নাই।

জাহ্নবী।—বৈশাখ। তৃতীয় বর্ষে 'অশ্রুকণা'র কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 'জাহ্নবী'র সৌভাগ্য, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের সৌভাগ্য কি না, বলিতে পারি না। সম্পাদকের গুরু-ভার কবি-কল্পনার সুধা নহে, গরল;—ইতিপূর্ব্বে কবি-সম্পাদকের জীবনে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। গ্রাহক, প্রবন্ধ, প্রাহক ও পাঠকের তাড়ায় 'মানসী' স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হন। তথাপি আশা করি, সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'জাহ্নবীর' পূত ধারায় বাঙ্গালা সাহিত্য সরস উর্ব্বর ও পবিত্র হউক। শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর 'মাঙ্গলিক' পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্নপ্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন,—'দেশের অন্ন দেশে থাকুক, দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠা উদরপূর্ণ করিয়া আহার পাউক।' পবিত্র কামনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের অন্ন দেশে রাখিবার উপায় কি? অবাধ-বাণিজ্য রহিত হইলেই নিরন্নের অন্নসংস্থান হইবে, এমন আশা করা যায় না। নিরন্ন যাহাতে অন্ন ক্রয় করিতে পারে, তাহার তদুপযোগী অর্থ-সংস্থান আবশ্যক। মহাজনের গোলায় ধান মজুদ থাকিলে নিরন্নের ক্ষুধা মিটিবে না। শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গীতায় ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে হীরেন্দ্র বাবুর 'গীতায় ঈশ্বরবাদে'র সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'কেন্দ্রবিন্দু' সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন,—'পুংকীট ও স্ত্রীডিম্বের কেন্দ্রবিন্দু যদিও অতীব ক্ষুদ্র, তথাপি উপরি-উক্ত বংশানুক্রমিক উপাদানের তুলনায় উহাও কত বৃহৎ! উহারই মধ্যে বহু পুরুষের দৈহিক উপাদান সঞ্চিত আছে; সুতরাং সে উপাদান এত ক্ষুদ্র, এত সূক্ষ্ম যে, কল্পনাই করা যায় না। বৈদান্তিক স্থূলদেহের অভ্যন্তরে এক সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহা কি তাহাই?' শশধর বাবুই এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি মন্দ নহে। শ্রীযুত জলধর সেনের 'সুষমা' নামক গল্পটি চলনসই,— সুপাঠ্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ' নামের তালিকা। শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'সাহজাহানের অবরোধ' সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। সর্ব্বশেষে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশ' নামক একটি কবিতা,—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।—

'আমার ভারতভূমি!
ডালা ভরি' লয়ে বড় ঋতুদল
অঞ্চলে তব ঢালে ফুলফল,
নীরবে আশিষ করে হিমাচল
তব মস্তক চুমি।

তব কোলে বাস মম।
ধন্য সে কোল ঋষির পরশে
দেবতা পূজার পুষ্প বরষে,
গঙ্গাধারার পুলক হরষে,
সে কাম্য পুণ্যতম।

সিন্ধু তোমার পায়ের ধূলায়,
নিত্য তাহার ললাট বুলায়,
চরণে মলয় চামর ঢুলায়,—
আমার জননী তুমি
হে মোর ভারতভূমি!

দেবমানবের আনন্দধাম
যে কোলে জনম লভিয়াছে রাম,
যে কোলে ভীষ্ম লভিলা বিরাম
সেই কোলে নমোনমঃ—
সেই কোলে বাস মম।'

কিন্তু 'হিমাচল ভারত-ভূমির মস্তক চুম্বিয়া আশিষ করিতেছে'—কল্পনাটি সুন্দর হইলেও একটু উদ্ভট—অসম্ভব। হিমালয় যেদিন ভারতভূমির মস্তক চুম্বন করিবে, সে শুভ মহা-প্রলয়ের দিন কবে আসিবে? তখন ভারতে 'স্বদেশী' থাকিবে না, গোয়েন্দাও থাকিবে না; 'জাহ্নবী' থাকিবে না, সাহিত্যও থাকিবে না; ক্রীতদাসের অধীনতা থাকিবে না, বিদেশীর যথেচ্ছাচার—মায়ার শাসনও থাকিবে না। হায় দেবতা, ভারতভূমির সে শুভদিন কবে আসিবে, যে দিন চুম্বনলোলুপ হিমালয়-রূপ হামান-দিস্তায় ভারতভূমির সব গুঁড়া হইয়া যাইবে!—আমরা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিব। কিন্তু 'সিন্ধু তোমার পায়ের ধূলায়, নিত্য তাহার ললাট বুলায়, চরণে মলয়, চামর ঢুলায়, অতি সুন্দর, মহাকবির উপযুক্ত।

বঙ্গদর্শন।—বৈশাখ। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য' বড় জটিল। লেখক 'সৌন্দর্য্যবোধ' ও 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধেও তাঁহার বক্তব্য বিশদ হয় নাই। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রেখাধ্যায়' লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। আর স্বভাব-কবির স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসে এমনতর শুষ্ক কারিগরী-সাহিত্যও সরস ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গের জমিদার' প্রবন্ধ আলোচনার যোগ্য। লেখক বিশেষজ্ঞ, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তাঁহার পরামর্শ জমীদারগণের চিন্তনীয়। গবর্মেণ্ট অবশ্য প্রজার পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন না। অতএব, সে আশায় উৎফুল্ল হইব না। 'রাজ-তপস্বিনী' ও 'হীরামণির অন্বেষণ' চলিতেছে। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। প্রতিভার বন্দনা,—ভক্তির উচ্ছ্বাসে পবিত্র হইয়াছে। 'অভাবনীয়' গল্পটি এত অভাবনীয় যে, বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া কৃত্রিমতার রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। স্বচ্ছ সুন্দর সরল ভাষায় চিরপ্রিয় লেখকের পরিচয় পাইয়া আশায় আনন্দে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের নিতান্ত-পর কৃত্রিমের দেশে মানব-হৃদয়ের পবিত্র ভাব-গঙ্গা-সহানুভূতির সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। যে গল্পে সহজ-বিশ্বাস ও তজ্জনিত সহানুভূতির অভাব, তাহাতে কৌতুক উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু তৃষাতুর তৃপ্তির পিপাসা কোনও মতে চরিতার্থ হয় না। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'প্রাচীন সামাজিক চিত্রে'র 'বহুবিবাহ ও সপত্নীদ্বেষ' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

শীতাতপে দেহ রক্ষা।

করিবার জন্য আপনি কি

সার্ট বা কোট

ব্যবহার করেন ?

আপনার সার্ট বা কোটের পকেটে

রুমাল আছে কি ?

রুমালে আপনি দুই এক বিন্দু

এসেন্স ব্যবহার

কর্ত্তব্য মনে করেন না ?

রুমালের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা

উপযোগী এসেন্স কি ?

সহস্র সহস্র ভদ্রলোক একবাক্যে

স্বীকার করিয়াছেন,

রুমালের জন্য এসেন্স দেলখোস

সর্ব্বোৎকৃষ্ট এসেন্স।

এইচ, বসু

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার;

দেলখোস হাউস।

৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮শ ভাগ। আষাঢ়, ১৩১৪। ৩য় সংখ্যা।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ., শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., শ্রীসরোজনাথ ঘোষ,
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে, শ্রীম—, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম. এ.,
শ্রীসতীশচন্দ্র ও সম্পাদক।

সূচী।

কলিকাতা,
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

মাগো! প্রাণ যে যায়!

রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় এ আকুল আর্ত্তনাদ সকল সংসারেই শুনিতে পাওয়া যায়। এ কাতর ক্রন্দন শুনিতেও প্রাণ ব্যথিত হয়, রোগীর যাতনা দেখিয়াও স্থির থাকিতে পারা যায় না। যৌবনের অবিবেচনাসম্ভূত রোগসমূহে রোগী নীরবে নির্জ্জন গৃহে এইরূপ হৃদয়ভেদী চীৎকার করে, আর লজ্জায় নিজের রোগের কথা অপরকে বলিতে না পারায়—অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিতে থাকে—

কেহ কি রক্ষা করিবার নাই?

কিন্তু এ আক্ষেপোক্তি গৃহকোণে বসিয়া করিলে কি হইবে? যখন রোগ হইয়াছে, তখন তাহার ঔষধও আছে, বুঝা উচিত। যখন দেহে সাংঘাতিক বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়া-সাধক ঔষধও আছে। কিন্তু আবার যে সে বিষ নহে। উপদংশ-বিষ অতি ভয়ানক;—ইহা বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। উপদংশ-জনিত যাতনার কথা আর কি বলিব—

দস্যুর ভীষণ সাংঘাতিক অস্ত্রে

আপাদমস্তক জর্জ্জরিত হইলেও বুঝি এত কষ্ট হয় না। লজ্জায়, নীরবে, অনেক অপরিণামদর্শী যুবক, যত্র তত্র স্থানে সুলভে প্রাপ্য টোট্‌কা ও বাজে ঔষধ সেবন করিয়া রোগকে জটিল করিয়া তুলেন। তখন মনে ভাবেন,—ভীষণ রোগ হইতে আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ইহাতেই—

বুঝি এ জীবনের শেষ!

কিন্তু রোগীর উপাধানের নিম্নে—যে সুধাপাত্র রহিয়াছে, তাহাতে রোগীর দৃষ্টি নাই। দুই বিন্দু অমৃত যে দেবভোগ্য ও সর্ব্বরোগবিনাশক! অমৃতে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে—বিষকে অমৃত করিয়া তুলে। এ অমৃত দেবাসুরযুদ্ধ সম্ভূত সমুদ্রমন্থিত অমৃতের অনুরূপ। এ অমৃত আমাদের আসামুদ্র ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলে বিখ্যাত "অমৃতবল্লী-কষায়।" উপদংশের সকল অবস্থায় ইহা সমানভাবে উপকারী। পারদ-দোষজাত ক্ষত আরাম করিতে ইহা অমোঘ। শরীরে নূতন বল, স্ফূর্ত্তি ও শক্তি আনিয়া দিতে ইহা অদ্বিতীয়। যাহারা এই ভীষণ রোগ বা ইহার পরবর্ত্তী কষ্টকর উপসর্গ সমূহে ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অমৃতবল্লী কষায় ও বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। মূল্য প্রতি শিশি—অমৃতবল্লী-কষায় ১॥০ দেড় টাকা, ডজন ১৫৲ পনর টাকা। বৃহৎ অমৃতবল্লী-কষায় প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডজন ২০৲ কুড়ি টাকা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত কবিরাজ।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

২য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
১২। বিষবৃক্ষ	১॥০	১৭। ইন্দিরা	১॥০
১৩। আনন্দমঠ	১॥০	১৮। কৃষ্ণচরিত্র	৩৲
১৪। কপালকুণ্ডলা	১।০	১৯। লোকরহস্য	১।০
১৫। চন্দ্রশেখর	১॥০	২০। বিবিধ প্রবন্ধ	২৲
১৬। রাজসিংহ	২৸০	২১। পদ্য-গদ্য	৸০

সর্ব্বসাকল্যে মোট ১০ খানি পুস্তক ১৭৲ টাকা মূল্যের একণে, পৃথক লইলে কেবল ৩৲ তিন টাকা মাত্র মূল্যে পাইতেছেন। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ সহ সাড়ে তিন টাকা মাত্র; কাপড়ের বাঁধান ৩।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা।

৩য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সমগ্র বঙ্কিমের ব্যাখ্যা)	২৲	২৫। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	১৲
২৩। সাম্য	।০	২৬। বিবিধ বিষয়	॥০
২৪। বিজ্ঞানরহস্য	॥০		

এই পাঁচখানি পুস্তকের মূল্য ৪।০০ টাকা, ইহা কেবল ৸০ আনায় বিক্রয় করিতেছি। ডাকমাশুল ৵০ আনা; বাঁধান ১৲ টাকা।

দেখুন!

একণে উক্ত তিন ভাগে সম্পূর্ণ সমগ্র উৎকৃষ্ট সংস্করণ ভাল কাগজে সুন্দর ছাপা সমগ্র তিন ভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেবল ৫৲ টাকায় দিব; রাজসংস্করণ ৬৲ টাকা। পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থাবলীর মূল্য উপরে লিখিত হইল। একত্র সমগ্র তিন ভাগ গ্রন্থাবলী না লইলে এতাধিক সুলভে পাইবেন না। তিন ভাগের মাশুলাদি ১৲ এক টাকা। মোট ৬৲ ছয় টাকা দিলেই ঘরে বসিয়া এই রত্নভাণ্ডার পাইবেন।

সত্বর না লইলে এ সুযোগে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী কার্য্যালয়;—

১১৷১৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী।

ত্রৈকালীন, পালাজ্বর, সকল প্রকার জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। ইহা জ্বরে ও বিজ্বরে সেবনীয়।

জনপ্রবাদ যে, কুইনাইন ভিন্ন জ্বরের ঔষধ নাই; কিন্তু আমাদের কবিরাজমণ্ডলী বহু পরীক্ষার পর বিনা কুইনাইনে জ্বরের এই অদ্বিতীয় মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা শরীরের সকল প্রকার জ্বর ঠিক কুইনাইনের ন্যায় বন্ধ করে, অথচ কুইনাইন সেবন জন্য যে সকল অপকার হয়, তাহার সম্ভাবনা থাকে না, এবং শরীরের জ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষ নষ্ট করে। অন্য ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই ঔষধটি পরীক্ষা করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

মূল্য বড় কৌটা ৪২ বটী ॥৵০; ছোট কৌটা ২১ বটী ।৵০; ডাঃ ।০।

ঊষাকুসুম তৈল।

মস্তিষ্ক ও কেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।

এই পরম সুগন্ধি কেশ-তৈল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নির্দ্দোষ দ্রব্যসমষ্টিতে প্রস্তুত। ইহা ব্যবহারে কেশক্ষয়, কেশের অকালপক্কতা, টাক, মস্তক-ঘূর্ণন, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন চঞ্চল করা, অতি মাদক সেবন জন্য বা দীর্ঘকাল প্রমেহাদি হেতু মস্তিষ্কের পীড়া ও বায়ু-জনিত শিরোরোগ অতি সত্বর নিবারিত হয়।

আমাদের ঊষাকুসুম তৈল কি কি বিষয়ে অদ্বিতীয়?

১। মন-বিমোহনকারী, বহুক্ষণস্থায়ী সুগন্ধে—

২। কেশ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার আরোগ্যে—

৩। মস্তিষ্ক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার উপশমে—

৪। শ্রমান্তে শরীর ও মনের অবসাদ-দূরীকরণে—

৫। মন প্রফুল্ল ও চিন্তাশূন্য রাখিতে—

৬। কেশপাশের সংবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ভূতিতে—

৭। কেশের বিবর্ণতা, অকালপক্কতা ও টাক নিবারণে—

৮। অনিদ্রাদি বায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া নাশে।

যেরূপ প্রবল মস্তিষ্কপীড়াই হউক না কেন আমাদের "ঊষাকুসুম তৈল" সামান্য একটু কপালে মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপশম হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার-সমিতি

২৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় পুরাবস্তু।

অস্মদ্দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্বদেশের ইতিহাস অপেক্ষা বিদেশের ইতিহাসে অধিক অভিজ্ঞ। স্বদেশের ইতিহাসের কথা হইলেই তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, "আমাদের দেশের পাঠোপযোগী ইতিহাস নাই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন।" কিন্তু আমরা সে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টামাত্র করি না। অথচ এ কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, কোনও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার অতীত ইতিহাসের মত পথনির্দ্দেশক আর নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে পরিমাণ উপকরণ বিদ্যমান, তদপেক্ষা অনেক অল্প উপাদান লইয়া মিশরের, গ্রীসের ও রোমের ইতিহাস পুনর্গঠিত হইয়াছে। অত্যল্প দিন পূর্ব্বেও বাইবেলে বর্ণিত হেটাইট সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষিত জনসাধারণ সন্দিহান ছিলেন কিন্তু সুধীজনের অধ্যয়নের ফলে অত্যল্প উপাদানের সাহায্যে আজ তাহার ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে; আজ সে সাম্রাজ্য কল্পনার স্বপ্নলোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে উপনীত।

জগতে কোন্ প্রাচীন জাতি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য আপনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে? সকল প্রাচীন জাতিই শিল্পে ও সাহিত্যে ইতিহাসের উপকরণমাত্র রাখিয়া গিয়াছে। ভারতে সেরূপ উপাদানের অভাব নাই; বরং তাহার প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। যখন কোনও বহুকালব্যাপী সভ্যতা বিলুপ্ত হয়, তখন তাহার সকল চিহ্ন পবনহিল্লোলের মত শেষ হইয়া যায় না; পরন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে, এমন কি, নিত্যব্যবহার্য্য গার্হস্থ্য দ্রব্যাদিতেও তাহার বিশেষত্বব্যঞ্জক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। আবার প্রতীচ্য কোবিদগণ যে ভাবে মিশরের, গ্রীসের ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার বিলোপের কথা বলেন, সে ভাবে দেখিলে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজও জীবিত।

ভারতের ধূলি শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষসমষ্টি; ভারতে সর্ব্বত্র ইতিহাসের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতের সাহিত্য বিরাট—বিপুল; কত পুঁথি

অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কত পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কত! আর কোনও দেশে এরূপ বিপুল প্রাচীন সাহিত্য ছিল না। আবার ভারতে স্তূপ ও মন্দিরের সংখ্যা করা যায় না। ইতিহাস-রচনা বিষয়ে স্থপতি-শিল্পের সাক্ষ্য সাহিত্যের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয়, অধিক প্রামাণ্য। প্রক্ষেপের ও সংশোধনের ফলে বহু গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। সাহিত্যে প্রক্ষেপ ও সংশোধন সহজে বোধগম্য হয় না; কিন্তু সুশিক্ষিত দর্শকের দৃষ্টি স্থপতির কৃত কার্য্যে প্রক্ষেপ বা সংশোধন অতি সহজে বুঝিতে সমর্থ হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সত্যই বলিয়াছেন যে, লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবে পুরাবস্তুরাজিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য উপকরণ। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইতিহাসের হিসাবে যে সকল জাতি আপনাদের বিবরণ ক্ষণবিধ্বংসী গ্রন্থপত্রে রক্ষা না করিয়া দীর্ঘকালস্থায় প্রস্তরে বা প্রাসাদে রক্ষা করে, সে সকল জাতি সৌভাগ্যবান। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অনুশাসনসমূহ অক্ষয় অক্ষরে ভারতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। উড়িষ্যার গুহামন্দিরের কথায় হান্টার বলিয়াছেন, "ইতিহাসের এই সকল উপকরণ পর্ব্বতেরই মত অক্ষয়।" ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ উপাদান বিদ্যমান। ভারতের কোথায় মন্দির, স্তূপ, গুহামন্দির বা অনুশাসন নাই? বর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির, নিদাঘের তপন-তাপ সে সকল নষ্ট করিতে পারে নাই; ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত, বিজাতীয়ের বা বিধর্ম্মীর অত্যাচার সে সকল লুপ্ত করিতে পারে নাই। তাহারা কাল-জয়ী।

স্থপতিবিদ্যানুরাগী ফার্গুসন বলিয়াছেন, "ভারতে যেরূপ বহুবিধ স্থাপত্য-প্রণালী লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না; আর কোথাও স্থাপত্য-প্রণালী এত পরিবর্ত্তনশীল, বা স্থির নিয়মের অনুবর্ত্তী নহে। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা হেতু তাহাদিগকে সহজলক্ষিত বিশেষত্ববিশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা কষ্টসাধ্য নহে। তাহাদের পরিণতিও স্বচ্ছন্দে লক্ষ্য করা যায়; এবং একবার এক বিভাগের কালনির্ণয় করিতে পারিলে, অন্য সকল বিভাগের কাল-নির্ণয়ে আর কালবিলম্ব হয় না।"

অন্যত্র ফার্গুসন বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই স্থাপত্যের শ্রেণীবিভাগ স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। ভারতীয় স্থাপত্যের পারম্পর্য্য ও আনুমানিক কালনির্ণয়ও তৎকালে স্থির হইয়াছিল। তাহার পর

চিত্রের সহায়তায় ও অধুনা-আবিষ্কৃত অনুশাসনাদির সাহায্যে আমি তৎকালীন জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ভারতের যে কোনও প্রাচীন সৌধের চিত্র পাইলে আমি তাহার যে স্থান নির্ণয় করিতে পারি, তাহা সে স্থান হইতে ২৫ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত হইবে; এবং আমি তাহার যে কালনির্ণয় করিব, তাহা সেই সময় হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইবে।"

সত্যই ফার্গুসন, কানিংহাম প্রভৃতি অতি যত্নে ভারতীয় পুরাবস্তুর আলোচনা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ভারতের ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি সেই সকল উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতের ইতিহাস রচনা করিবার উপযোগী লেখকের আবির্ভাব হয় নাই। আদি "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত কয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণকালে বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন,—"অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক, বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা দিতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোনও সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না!"

প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্য লোকপ্রসিদ্ধ। যদিও বহুশতাব্দীব্যাপী পরাধীনতা, বিদেশীয় ভাবের ও আদর্শের প্রচলন, শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের শিল্পের অবনতি হইয়াছে, তথাপি এখনও লোকের শিল্পানুরাগ ও শিল্পনৈপুণ্য বিনষ্ট হয় নাই। তাই আজ ভারতে শিল্প যেরূপ জাতীয় জীবন অধিকার করিয়া আছে, তেমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভারতে শিল্প বিলাসবৈভব নহে, পরন্তু সমাজের সর্ব্ব স্তরে সকলের তাহাতে সমান অধিকার।

ধর্ম্মে ও শিল্পে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ভারতবর্ষেরই প্রাধান্ত ছিল। ভারতের শিল্পপ্রভাবে চীনে, কোরিয়ায় ও জাপানে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প বিকশিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাব চীন হইতে কোরিয়ায় ও কোরিয়া হইতে ক্রমে জাপানে যায়। বেগবতী স্রোতস্বতী যেমন শীর্ণধারা হইতে ক্রমে বিপুলবারিবাহিনী জললীলাময়ী তটিনীতে পরিণত হইয়া সমস্ত দেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে, ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় ভাব তেমনই ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রাচ্য দেশে আপনাদের প্রভাব প্রচারিত করিয়াছিল। অদ্যাপি প্রাচ্য ভূখণ্ডে নানা দেশের আচারে, ব্যবহারে, শিল্পে, সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও দেশব্যাপী পরিবর্ত্তনের অবসানে যখন প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস উদ্ধারের সময় আসিল, তখন ভারতের রাজনীতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত। তখন প্রাচ্য সভ্যতায় ও প্রাচ্য ভাবে অজ্ঞ ইংরাজ ভারতের শাসনদণ্ড, গৃহবিচ্ছেদদুর্ব্বল মুসলমানের হস্ত হইতে ছলে, বলে, কৌশলে আপনি লইয়াছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির জাতীয় গর্ব্ব হেতু তাহারা অপরাপর সভ্যতার গুণ বিষয়ে অন্ধ, তাহাদের বিশ্বাস, জগতের যত কিছু সুখ, সৌন্দর্য্য, সম্পদ, সবই তাহাদের ভোগার্থ; তাহারা প্রকৃতির রচনার চরম পরিণতি। তাই তাহারা বিজিত জাতির প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে আলোচনার চেষ্টামাত্র করে নাই। তখন, রাজ্য-জয়-কালে, দেশব্যাপী সমরকোলাহলের মধ্যে তাহাদের সে অবসরও ছিল না। কাযেই প্রবৃত্তি ও অবসরের অভাবে তাহারা সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতবাসীরাও আপনাদের অতীত ইতিহাস বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। পরাধীনতা বহু অমঙ্গলের কারণ। পরাধীন জাতি আপনাদের অতীত গৌরব বিষয়ে অন্ধ হইয়া পড়ে; বর্ত্তমান [illegible] লজ্জা প্রযুক্ত তাহারা অতীত সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই, ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভে, ইংরাজ ও ভারতবাসী [illegible] প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস, সমৃদ্ধ সাহিত্য, সমুন্নত শিল্প ও প্রাচীন সভ্যতা,—এ [illegible] স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছিল।

এই সময় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কয় জন জ্ঞানপিপাসু ইংরাজের যত্নে বাঙ্গালায় এসিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হইল। এসিয়াখণ্ডের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির হইল। সার উইলিয়ম জোন্স এই উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, সভ্যগণ এসিয়াখণ্ডে প্রাকৃতিক বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিবেন, অনুসন্ধান ও আবিষ্কার দ্বারা ভৌগোলিক ভ্রম অপনীত করিবেন ; যে সকল জাতি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই ভূখণ্ড অধ্যুষিত বা নিপীড়িত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিবেন ; তাহাদিগের শাসনপ্রণালীর ও অনুষ্ঠানের তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন ; নানা শাস্ত্রে তাহাদিগের অভিজ্ঞতার বিষয় ও নীতি হইতে সাহিত্য পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞানের পরিমাণ বিচার করিবেন ; এবং চিকিৎসা ও রসায়নাদিতেও তাহাদিগের কৃত কার্য্যের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রবিদ্যা, কবিতা প্রভৃতি হইতে মানব-জীবনের অতি সাধারণ আরামবিধায়ক বিষয়ও অনুসন্ধানের বিষয় হইবে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সভা সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তখন প্রাচ্যতত্ত্ব মুষ্টিমেয় ইংরাজের চর্চ্চার বিষয়মাত্র রহিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হইল, তখনও সাধারণ ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষ অজ্ঞানা রাজ্য—দীর্ঘ চারি মাসের পথ, সে স্থানে যাহারা যায়, তাহারা অনেকে আর ফেরে না ; যাহারা ফেরে, তাহারাও সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয় ! এমন কি, এই সভা রাজানুগ্রহলাভ করিলেও, অতি সাধারণ ব্যবহারজীবী বা ধর্ম্মযাজকের ভাগ্যে যে সম্মান বা সাহায্যলাভ ঘটে, জোন্স, কোলব্রুক, বা উইলসনের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তখনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ এমনই অজ্ঞ ও উদাসীন!

যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় সভা অদম্য উদ্যমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহ-সহকারে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কানিংহাম তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানবিবরণীর মুখবন্ধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি উপাদেয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, সে কার্য্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলশ্রম, তাঁহারা কেহই সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

সভা-সংস্থাপনের দশ বৎসর পরে সভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী সভ্য

সার উইলিয়ম জোন্সের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তৎকালে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রজ্বালিত দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু কাহারও আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। জ্ঞানমন্দিরে তিনি যে আলোকশিখা জ্বালিয়াছিলেন, কোলব্রুক তৈলদানে তাহার ঔজ্জ্বল্য অনাহত রাখিবার ভার লইলেন। তখনও কোলব্রুক গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই; কিন্তু তিনি জোন্সের আরব্ধ হিন্দু বিধি-সম্বন্ধীয় অসমাপ্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার ভার লইলেন।

কোলব্রুক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই হোরেস হেম্যান উইল্‌সন সভার সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছিলেন। উইল্‌-সনের পর ডাক্তার মিল সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

এই সময় ভারতীয় পুরাবস্তুর আলোচনায় নূতন যুগের আরম্ভ হয়। পণ্ডিতমণ্ডলীর অজস্র চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের যে বর্ণমালার স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই, কুশাগ্রবুদ্ধি প্রিন্সেপ তাহার তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এই ব্যাপার বিশেষভাবে স্মরণীয়। একান্ত দুঃখের বিষয়, চল্লিশ বৎসরমাত্র বয়সে আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রিন্সেপের মৃত্যু ঘটে। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে যে ভারতের ইতিহাসের অনেক জটিল তত্ত্ব সরল করিতে পারিতেন,—অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিকট ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার ঋণ শত গুণে বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন, তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে উত্তর-ভারতে জেমস্ ফার্গুসনের, মার্কহ্যাম কিটোর, এডোয়ার্ড টমাসের ও সার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের, দক্ষিণ-ভারতে সার ওয়ালটার এলিয়টের; পশ্চিম-ভারতে কর্ণেল মিডোস টেলারের, ডাক্তার ষ্টিভেন্সনের ও ডাক্তার ভাউদাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন,—"অন্যান্য বিষয়ের মত পুরাতত্ত্বেও উৎসাহী ব্যক্তিদিগের আদর্শে গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট কখনই সহজে কোনও বিষয় শিক্ষা করেন না; এ ক্ষেত্রেও গবর্মেণ্ট ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। জোন্স, কোলব্রুক, উইল্‌সন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি এই সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গ প্রথমে সাহিত্যিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। বর্ণমালার পুনর্গঠনে, পাণ্ডুলিপির অনুবাদে ও অনুশাসনের অর্থসংগ্রহে তাঁহাদের কার্য্য নিবদ্ধ ছিল। তখন

সংস্কৃতচর্চ্চা বিশেষ অদৃত ছিল। ইঁহারা কিরূপ গুরুশ্রম করিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অতিশ্রমে চল্লিশ বৎসরমাত্র বয়সে প্রিন্সেপ ও কিটো, উভয়েরই মৃত্যু হয়। ইহার পর গৃহ ও স্মৃতিস্তম্ভ-বিষয়ক অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। বর্ণনা, রেখাচিত্র, চিত্র, ফটোগ্রাফ ও ছাঁচ ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়দিগকে ভারতের সম্পদবিষয়ে জ্ঞাত করাইয়া দেয়। এই বিভাগে ফার্গুসনের ও কানিংহামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসনের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার কয় বৎসর পরেই কানিংহাম ভিলসা স্তূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ইঁহাদিগের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। কিন্তু এরূপ কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যাতীত; কাযেই তাঁহাদিগের কার্য্য অনেকস্থলে আংশিক, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। রচনা-প্রসাধন-নিপুণ কোলব্রুক তাঁহার অভ্যস্ত মধুর গম্ভীর ভাষায় প্রথম রচনা পাঠ ও সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা যেমন সুখদ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ ও আবশ্যক। উপকরণের অভাব নাই—উৎসাহী, জ্ঞানলিপ্সু কর্ম্মীরই অভাব। যাঁহারা ভারতীয় পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। ভারতবাসীদিগের পক্ষে স্বভাবতঃ এই আলোচনায় আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ, তাঁহারাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারেন; কিন্তু পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্রতী ভারতবাসীদিগের নাম অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনা করা যায়। এই সম্পর্কে বাঙ্গালীর কলঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বলা বাহুল্য রাজা রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসাধারণ, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়। কিন্তু তাঁহার পর আর কেহ বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচনে প্রয়াসী হয়েন নাই। সময় সময় কেহ কেহ ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই তাদৃশ ক্ষমতা, নৈপুণ্য, উৎসাহ বা উদ্যম সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অনেকেই শ্রম-পরাঙ্মুখ হইয়া আবশ্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। জটিল বিষয় সরল করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু অত্যল্প কৃতকর্ম্মের জন্য অত্যধিক যশের আশা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের অকালমৃত্যুজনিত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমোক্ত লক্ষণাস্ত্রের ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস

আলোচনার পথ সুগম করেন; দ্বিতীয়োক্ত পাটলিপুত্রে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অন্তরায় অধিক নহে। উপকরণের অভাব নাই। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণীগুলি আবশ্যক বিষয়ে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সকল বিবরণীতে বর্ণিত বিষয়গুলি স্থান-বিভাগানুসারে বিভক্ত; কারণ, এক একখানি বিবরণী এক একটি স্থানের পুরাবস্তুসম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণে পূর্ণ। এখন এই সকল বর্ণনা হইতে বর্ণিত দ্রব্যগঠনপ্রণালী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রচনার ক্রম-বিকাশের পরিবর্ত্তনের ও অবনতির কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। এক প্রণালীর উপর অপরের প্রভাব ও এক হইতে অন্যে পরিণতি লক্ষ্য করাও কর্ত্তব্য। যে সভ্যতার একের উদ্ভব ও যাহাতে তাহার বিকৃতি, তাহা বুঝিতে হইবে। সার উইলিয়ম মার্টিন কনওয়ে সত্যই বলিয়াছেন, "প্রাচীন মিশরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত পিরামিডের নির্ম্মাণের কারণ, দ্বাদশ বংশের ক্ষোদিত সমাধি-রচনার আবশ্যকতা, বা টলেমীদিগের স্মৃতিমন্দিরের তাৎপর্য্য বুঝিবার উপায় নাই। বাবিলোনিয়ার স্তরবিভক্ত মন্দির, আসীরিয়ার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ, হেটিট ও ফোনিশীয়দিগের কীর্ত্তির অবশেষ, এ সকলই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ফল। সেই সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে তাহাদের অর্থ বুঝিতে হইবে; আবার তাহাদের সহায়তায় সেই সভ্যতার গুপ্ততত্ত্ব স্বপ্রকাশ হইবে। দক্ষিণ-ভারতের ভীমকায় মন্দির-নির্ম্মাণের কারণ, গুহামন্দির-রচনার তাৎপর্য্য, হিন্দুস্থাপত্যের প্রারম্ভ ও তাহার দৃশ্যমান আদর্শের মধ্যে পঞ্চ শতাব্দীর ব্যবধানের হেতু, পশ্চিম-ভারতের-গুহামন্দিরে চিত্রের ও পূর্ব্ব-ভারতে গুহামন্দিরে ভাস্কর্য্যের প্রাধান্য কেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিহার-মধ্যবর্ত্তী বৌদ্ধচৈত্যের প্রতিমার আধারে পূর্ণ প্রতিমামন্দিরে পরিণতি—এ সকল বুঝিতে হইলে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের আলোচনা আবশ্যক; ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস অবশ্যজ্ঞেয়।

অতীত যুগের ভিত্তিগর্ভগত উপাদানের পুনরুদ্ধার করিয়া অতীত ইতিহাসের রচনা করিবার যোগ্যপাত্রের আবির্ভাব অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সভ্যতায় ভারতবাসীরই স্বত্বাধিকার। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীদিগকেই এ কার্য্যে অগ্রণী হইতে দেখা যায় না। ইহা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফল।

বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর শত-বার্ষিকী সমালোচনীতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন যে, প্রারম্ভে দুষ্ট-শিক্ষার ফলে যে অনুসন্ধানের ফল ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে হয়, ভারতবাসীরা সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবাসী কখনও ইংরাজী ভাষায় ভাবপ্রকাশ অলঙ্ঘনীয় বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করেন নাই। পুরাতত্ত্বের মত বিষয়-সম্বন্ধীয় রচনায় রচনাসৌন্দর্য্য অত্যাবশ্যক নহে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সুধী-সমাজ ভারতবাসীর রচনায় মৌলিক-তত্ত্ব-প্রাপ্তির আশায় অনেক ত্রুটী অবহেলা করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়েই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, দুষ্ট শিক্ষাই ভারতবাসীদিগের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অপ্রবৃত্তির কারণ। তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয় না; জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু বিলুপ্ত হয়; তাহাতে শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে না। সুখের বিষয়, দেশবাসীরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই শিক্ষা প্রকৃতপথে পরিচালিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, ইহাতে যে সুফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ইহার দুর্ব্বল প্রারম্ভকে সযত্নে রক্ষা করা দেশবাসিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। আমরা ইহার পরিণতির আশায় আশান্বিত। ভারতীয় পুরাবস্তুতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব জাতীয় শিক্ষাগারে অধীত হইবার পক্ষে কারণ-নির্দ্দেশ অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে বর্ব্বরতার অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভকালের কথায় লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন,—কর্ম্মচারীদিগের মনে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাবের ও বর্ব্বরতার প্রাধান্যের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে মূল্যবান মর্ম্মরের লোভে তাজমহল ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইয়াছিল! লর্ড হেষ্টিংস ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জকে উপহার দিবার জন্য আগ্রার প্রাসাদের শাহজাহানের মর্ম্মর-স্নানাধার উৎপাটিত করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তাহা প্রেরিত হয় নাই। বেণ্টিঙ্ক তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করান। তাঁহারই শাসনকালে কৃষি-পরীক্ষার জন্য আগ্রার ইঞ্জিনীয়ারকে সেকেন্দ্রায় উদ্যান ব্যবহারার্থ দিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পর দিল্লীর লোকপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদ ভূমিসাৎ

করিবার প্রস্তাব হয়; সার জন লরেন্সের চেষ্টায় সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় সাঁচির স্তূপ-তোরণ রক্ষা পায়। আলিগড়ে নগরের উন্নতির জন্ত ছয় শত বৎসরের প্রাচীন একটি মুসলমান-যুগের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যে বিপণী-গৃহরাজি নির্ম্মিত হয়, সে সকলের অধিবাসী জুটে নাই! [illegible]বার বড়লাটের আজমীর-গমনকালে তোরণ-রচনার জন্ত সেখানকার স্থানের হিন্দু-মুসলমান মসজিদের স্থাপত্যসৌন্দর্য্যশালী স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া আনা হয়!

এই সকল বর্ব্বরোচিত কার্য্যের প্রধান কারণ এই যে, তখনও ভারতে চিরস্থায়িভাবে অবস্থান ইংরাজের নিকট স[illegible]সাধ্য বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার পর, একবার এক প্রকার কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা আর সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সুখের বিষয়, এখন গবর্মেণ্ট পুরাবস্তুর সংরক্ষণ প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করেন; এখন কোনও কোনও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অট্টালিকা-রচনায় যথাসম্ভব ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেন, এবং কোনও কোনও ইংরাজ স্বজাতীয়দিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদিগকে বর্ব্বর আখ্যায় আখ্যাত করেন।

যৎকালে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে নূতন সাম্রাজ্যের সংস্থাপন ও বিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালেও সময়ে সময়ে কোনও কোনও শাসনকর্ত্তা পুরাবস্তু-সংরক্ষণকল্পে অর্থব্যয় করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টো তাজমহলের সংস্কারের জন্ত একটি সমিতি গঠিত করেন। লর্ড হেষ্টিংস ফতেপুরসিক্রীতে ও সেকেন্দ্রার সংস্কার করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। লর্ড আমহর্ষ্ট কুতব-মিনারের সংস্কারের চেষ্টা করেন। লর্ড হেষ্টিংস ভারতের প্রধান প্রধান পুরাবস্তুর পরীক্ষা ও লিপিবদ্ধকরণে ডিরেক্টরদিগকে সম্মত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কার্য্য সময়ে সময়ে ঘটিত, তাই কখনও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সামান্ত সংস্কার ও কয়েকখানি চিত্রসংগ্রহেই সকল চেষ্টার শেষ হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং উত্তর-ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন, এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জেনারল কানিংহামকে পুরাবস্তু-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ মন্তব্যে তিনি বলেন, পূর্ব্ব বৎসর উত্তর-ভারতের পুরাবস্তু সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ণেল কানিংহামের কথা হয়। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পুরাবস্তুর বিষয় অবহেলা

দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ এই সকল পুরাবস্তুর অধিকাংশই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। এই অবহেলা অর্থে, সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা নহে। সেরূপ কার্য্যের ব্যয়ভার বহন করা অনেক স্থলে গবর্মেণ্টের সাধ্যাতীত। কিন্তু গবর্মেণ্ট তদপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য কর্ত্তব্যের পালনেও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য এই সকল পুরাবস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করাইতে পারেন। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপায় হইবে; এবং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতবর্ষ সুগম হইলে, সেই ইতিহাসের চর্চ্চায় বহু কোবিদ রত হইবেন। বিহার, কনোজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিরাট ধ্বংসাবশেষের সবিশেষ অনুসন্ধান না করা সভ্য গবর্মেণ্টের কলঙ্কের কথা। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যাহা কিছু সাধিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। ভারতে ইংরাজের মত অবস্থাপন্ন হইলে অন্য য়ুরোপীয় গবর্মেণ্ট এ কার্য্যে এরূপ অবহেলা করিতেন না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর নিবেদনে ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের বিশদ মন্তব্যে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্ কতকগুলি পুরাবস্তুর পরীক্ষা ও বর্ণনের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু যাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার অন্য কার্য্যের বাহুল্য ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি কারণে সে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। অল্প কিছু ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন ও কতকগুলি চিত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং মেজর কিটো ও জেনারল কানিংহাম এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। বৎসর দুই কাল মধ্যেই গবর্মেণ্ট এ বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এই মন্তব্যে প্রকাশ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তুর বর্ণন ও চিত্রাঙ্কন, অনুশাসনের অনুলিপি-প্রকাশ, পুরাবস্তুর যথাসম্ভব ইতিহাস-উদ্ধার ও তৎসম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীর সংরক্ষণই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য।

এই সময় হইতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণীর প্রকাশ আরব্ধ হয়। এই সকল বিবরণী প্রচুর শ্রমের ফল জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। বিংশ বর্ষেরও অধিককাল জেনারল কানিংহাম এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র পুরাবস্তুর সংরক্ষণ ও তালিকা-প্রণয়নসম্বন্ধে আদেশ প্রদত্ত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ডাক্তার বার্জেস এই ভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি কানিংহামের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও দেশীয়-শাসিত রাজ্যেও এই কার্য্যের

অনুষ্ঠান হয়। কোথাও বা স্বতন্ত্র পুরাতত্ত্ববিভাগ সংস্থাপিত হয়; কোথাও বা বৃটিশ গবর্মেণ্টের পুরাতত্ত্ববিদের সাহায্য লওয়া হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করেন। এবং তাঁহারই শাসনসময়ে সার জন ষ্ট্রেচী আগ্রার সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার পর সার অ্যাণ্টনী ম্যাকডোনেল এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লর্ড লিটন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার মতে, জাতীয় প্রাচীন কীর্ত্তির সংরক্ষণ গবর্মেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য। তাই তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সংস্কার কার্য্যের জন্য ৩৭৫০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। তিনি এক জন পুরাবস্তু-পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব তাঁহার পরবর্ত্তী লর্ড রিপণের শাসনকালে কার্য্যে পরিণত হয়।

বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সাহায্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল পুরাতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন। এবং বেঙ্গল গবর্মেণ্টই তাঁহাকে রাজ-সম্মানে সম্মানিত করেন।

পরলোকগত সার জন উড্বরণ্ উড়িষ্যার ও গৌড়ের পুরাবস্তুর সংস্কারে বিশেষ সহায়তা করেন।

লর্ড এলগিনের শাসনকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগে এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

লর্ড কর্জ্জন এই বিষয়ে বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পুরাবস্তুর সংরক্ষণ গবর্মেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন,— "পূর্ব্বকালের কীর্ত্তি আমরা বর্ত্তমানে ন্যাস-রূপে রক্ষা করিব। যদি আমাদের ক্রটীতে সে সকল বিনষ্ট হয়, তবে উত্তরবংশীয়গণ আমাদিগকে দায়ী করিবে।" তিনি ভারতীয় পুরাবস্তু-সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রণয়ন করেন, এবং অধ্যয়ন-সৌকর্য্যের জন্য কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারের অশেষ উন্নতি করিয়া, তাহার একরূপ পুনর্গঠন করেন। তাঁহার শাসন-সময়ে পুরাতত্ত্ব-বিভাগে প্রচুর কার্য্যকারিতা লক্ষিত হইয়াছে, এবং এক্ষণে যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চিত্রে ও বিষয়-গৌরবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আশা করি, অচিরে ভারতবাসী পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্বাধিকারের অধিকারী হইয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারসাধন করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য।

কৃত্তিবাসের রামায়ণানুবাদের কিঞ্চিন্ন্যূন শতাব্দীকাল পরে আসামবাসী শঙ্কর নামক কবি রামায়ণের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই অনুবাদখানি আসাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল; ভাষার দুরূহতা সত্ত্বেও, বলা উচিত, এই অনুবাদখানি সম্পূর্ণ মূলানুগ, কিন্তু সংক্ষিপ্ত।

শঙ্কর।

পূর্ব্ব-বঙ্গে এক সময় ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত ছিল। ইঁহারা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত ঝিনারদি গ্রামে বৈদ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল "গুণরাজ"। গঙ্গাদাস সেন স্বীয় ভণিতায় অনেক স্থলেই পিতা ও পিতামহের গর্ব্ব করিয়াছেন,—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর।" এই পিতা ও পুত্রের বিরচিত রামায়ণের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর; এবং ইহার বহুসংখ্যক পুঁথি পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীবর, জগদানন্দ নামক ব্যক্তির নামে স্বপ্রণীত রামায়ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—"শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্ব।"

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস।

শ্রীযুত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় এই কবির কৃত রামায়ণের অনুবাদখানির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ইহার ভাষা অতি মধুর।

দ্বিজ দুর্গারাম।

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামবাসী জগৎরাম রায় রামায়ণের আর একখানি অনুবাদ করেন। শিবচন্দ্র সেনের "সারদামঙ্গল" রামায়ণের একখানি সুখপাঠ্য অনুবাদ। কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। শিবচন্দ্র কাঁটাদিয়া গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন; এই গ্রাম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত।

জগৎরাম রায়।

শিবচন্দ্র সেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অদ্ভুতাচার্য্য নামক জনৈক কবি রামায়ণের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। অদ্ভুতাচার্য্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। এরূপ প্রবাদ আছে, সাত বৎসর

অদ্ভুতাচার্য্য।

বয়সেই ইনি রামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশ পাইয়া রামায়ণ-রচনা আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না। ভগবৎপ্রসাদে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার নাম হইয়াছিল, অদ্ভুতাচার্য্য।

শঙ্কর কবিচন্দ্র।

কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পানুয়া (পোঃ লেগো) গ্রামবাসী শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রচলিত বটতলার কৃত্তিবাস-কৃত বলিয়া যে রামায়ণখানি পরিচিত, তন্মধ্যে অনেকাংশ এই শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। "অঙ্গদ রায়বার" কবিচন্দ্র-কৃত। শঙ্কর, বাল্মীকির মূল কাব্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে রামায়ণ-ঘটিত উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় রামায়ণ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি শঙ্করের দৌহিত্র-কুলোদ্ভব শ্রীযুত মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইবে।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেটেরী গ্রামবাসী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি রামায়ণের অনুবাদ প্রণয়ন করেন; এবং প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অপর এক জন কবির কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণের একখানি অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

কৃত্তিবাসের পরে যতগুলি অনুবাদ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম-রসায়ন"খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রঘুনন্দন মূলের সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস প্রভৃতি কবির হিন্দী রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রামরসায়নের সঙ্কলন করেন। তাঁহার রচনা বিচিত্র ছন্দোময়; ললিত শব্দ-চয়নেও ইনি সিদ্ধহস্ত। রচনার নমুনা এইরূপ,—

"এথা রঘুবর করিতে সমর, সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুণ বাকল পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকট কঠিন কবচ শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥"

এই ছন্দটি ললিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যুদ্ধাথীর সমর-সজ্জা-বর্ণনার উপযোগী নহে।

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ব্যতীত দ্বিজ দয়ারাম, ফকিররাম কবিভূষণ,

ভিকন গুরুদাস, দ্বিজ তুলসী, কাশীনাথ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবির-কৃত রামায়ণের অংশানুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত রামায়ণের অনুবাদ কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। অসামান্য প্রাঞ্জলতা ও কারুণ্যের উদ্দীপনার জন্য কৃত্তিবাসের যশোভাতি উজ্জ্বল হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্ররাজির ন্যায় অপ্রকাশ রহিয়াছেন। রাজচক্রবর্ত্তীর প্রাসাদ হইতে কৃষকের কুটীর পর্য্যন্ত গত পাঁচ শত বৎসর কাল যে পুস্তক অবাধগতি লাভ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, সে পুস্তক সমালোচনার প্রতীক্ষা রাখে না। সমালোচককে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কথায় প্রণতি ও বিনয় জানাইয়া নীরব থাকিতে হয় :—

"কর জোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস।
যাহা হইতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥

২। মহাভারত।

সঞ্জয়।

নসিরুদ্দিন খাঁর আদেশে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাভারতের যে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সঞ্জয়-কৃত "ভারত-পঞ্চালী"ই প্রাচীনতম। অতি অন্ধকার যে ভারত সাগর, পাঁচালী সঞ্জয় তারে করিল উজ্জ্বল।" প্রভৃতি ভণিতার পদ পাঠ করিলে প্রতীতি হয়, সংস্কৃতানভিজ্ঞ অসংখ্য নর-নারীর নিকট যে রত্নের আকর তিমিরাবৃত ছিল, সঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথমে সেই রত্নখনি আলোকিত করেন; তৎ-কৃত অনুবাদেই এই দুর্গম পথ সর্ব্বপ্রথম সুগম হয়। এই মহাভারতখানি অতি সংক্ষিপ্ত; অথচ ইহার প্রচার এক সময়ে অত্যন্ত অধিক ছিল। ত্রিপুরার সোনামুড়া, ময়নামতী প্রভৃতি পাহাড়ের নীচে জঙ্গল-কণ্ঠলগ্ন পল্লীমালায়, বঙ্গসাগরের তরঙ্গ-চুম্বিত চট্টল রাজ্যে ও প্রাচীন শ্রীহট্ট ও বিক্রমপুরের শ্যামশস্যভারস্নিগ্ধ বিস্তৃত জনপদের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন সঞ্জয়-ভারতের পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। সঞ্জয়ের পরিচয় এই একটিমাত্র ছত্রে অতি যৎসামান্যই পাওয়া গিয়াছে,—

"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম
সঞ্জয় ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম।"

কবীন্দ্র-পরমেশ্বর-কৃত মহাভারতের অনেকাংশের অনুবাদ ও শ্রীকরনন্দীর-

কৃত অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদের কথা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহারা ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধপর্ব্ব, নিত্যানন্দ, ষষ্ঠীবর ও কবিচন্দ্রের রচিত সমগ্র ভারত, রাজেন্দ্র-রচিত আদিপর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, মধুসূদন নাপিতের বনপর্ব্বের অনেকাংশ, দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব্ব, ভৃগুরাম দাসের সংক্ষিপ্ত ভারত, কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের প্রণীত ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্ব প্রভৃতি ৩১ জন কবির-রচিত ভারত-প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং এই সকল কাব্যের অধিকাংশই পুঁথির আকারে রহিয়াছে। যাঁহারা পল্লীভবনে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা গঠনের জন্ত খড় কাঠ সংগ্রহ করিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের প্রযত্নে প্রাচীনকালে নিম্ন-শিক্ষা বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সময়ে যাঁহাদের কাব্যবর্ণিত বিষয় ও গ্রন্থের ভাষা হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, সেই সকল প্রাচীন কবিগণের বহুমূল্য গ্রন্থগুলির সমস্ত মুদ্রিত করিবার বিশেষ চেষ্টা বঙ্গবাসীর সর্ব্বপ্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত মহাভারত-রচকগণের মধ্যে কবিচন্দ্র ও ষষ্ঠীবরের কর্ম্মঠতা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা কত সংস্কৃত গ্রন্থের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রামায়ণ, মহাভারত, শিবায়ন, ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ কবিচন্দ্র রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহার কোনও-খানিই ৪০০ পৃষ্ঠার ন্যূন নহে। ইঁহাদের সংবাদ শিক্ষিতসম্প্রদায় এখনও অবগত নহেন; কিন্তু ত্রিতলবাসীরা যেন ভুলিয়া না যান, গৃহের প্রধান অবলম্বন ভিত্তি, তাহা ভূপ্রোথিত থাকিলেও, তাহার গৌরব সর্ব্বাগ্রে।

যাঁহারা মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা-উপাখ্যানটি অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি এই আখ্যানে ভট্টিকাব্য ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক হইতে অনেক ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ণনাগুলি সমুজ্জল করিয়াছেন। তাঁহার রচনার নমুনা এই প্রকার,—

> শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাস।
> [illegible] ফুলে [illegible] নাহি অবকাশ।
> [illegible] ফুল সব নড়ে।
> [illegible]

বন বৃক্ষ শাখাশাখি অতি মনোহর।
থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর।
নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে।
লক্ষে লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে।
হেন জল না দেখিনু নাহিক কমল।
হেন পথ না দেখিনু নাহিক ভ্রমর।
হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া।
কেবা মোহ না যায়ত সে সব দেখিয়া।"

পূর্ব্ব-বঙ্গে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, পশ্চিম-বঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত তদ্রূপ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। পশ্চিম-বঙ্গের বহু স্থান হইতে এই মহাভারতের পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে; এমন কি, পূর্ব্ব-বঙ্গেরও স্থানে স্থানে এই মহাভারত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীদাসের জামাতা। কাশীদাসের জামাতার নাম 'নিত্যানন্দ' থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু তিনিই যে প্রসিদ্ধ ভারতানুবাদক, তাহা কিরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে? বরং তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। একটি এই যে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র "গৌরীমঙ্গল" নামক একখানি কাব্যের রচনা করেন; তাহার ভূমিকায় তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' কবিদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।

ইহা দ্বারা নিত্যানন্দকে কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জামাতার পুঁথি আদর্শ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি লোপ করিবার চেষ্টায় কাশীদাস লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

কাশীদাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণাস্থ সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীদাসের পুত্র স্বীয় পুরোহিতদিগকে যে বাস্তু-ভিটা প্রদান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কাশীদাস ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিরাটপর্ব্বের রচনা করেন; একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই সময়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সিঙ্গি গ্রামে এখনও তাঁহার বাস্তু-ভিটা ও তৎকর্ত্তৃক খনিত একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে; এই পুষ্করিণীর নাম "কেশে পুকুর"। কাশীদাসের পিতার

নাম কমলাকান্ত; অপর দুই ভ্রাতা গদাধর ও কৃষ্ণদাস। ইঁহারাও কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাসও মহাভারতের কোনও কোনও পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কতক অংশ রচনা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন; একটি প্রাচীন কবিতায় এই কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা নানা কারণে সেই দুই পংক্তি অত অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি।—প্রচলিত বটতলার ছাপা কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে ভণিতায় এই দুইটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—

ধন্য হোক কায়স্থকুলেতে কাশীরাম।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ।

অপরাপর পর্ব্ব সম্ভবতঃ গদাধর, নন্দরাম ও ভৃগুরাম প্রভৃতি তাঁহার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন কবিগণের রচিত সমগ্র মহাভারত এখন কাশীদাসের নামে পরিচিত হইয়াছে।

কাশীদাসের নামে যে মহাভারত চলিতেছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট বিশেষ ঋণী। নিত্যানন্দের রচনা অতি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া এই মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে। উভয় মহাভারতের একটা অংশ পাশাপাশি রাখিয়া সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল—

গান্ধারীর বিলাপ।

নিত্যানন্দ ঘোষের স্ত্রীপর্ব্ব।	"কাশীদাসী" মহাভারত হইতে গৃহীত।
কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।	কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥	উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।	কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥	বিচিত্র-বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।	দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥	ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ [illegible] কাঁদে।	দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে [illegible] চাঁদে॥	দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম [illegible] তনু।	শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
[illegible]	দেখিয়া যাহার রূপ [illegible] ভানু॥
[illegible]	এবে সব ধূলায় [illegible]।
[illegible]	[illegible]

ঐ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা।
[illegible] শুনি যার [illegible] বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
যাএ এড়ি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় আজ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র মায়ের একুই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হিয়ায়॥
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মাঝে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রের সমান শোক নহে শতেক॥
গর্ভধারী হয়্যা যেবা করাছে পালন।
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম॥

ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা [illegible]
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক ইন্দু॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠস্বর শুনি যেন ব্যাসের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীর বেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি।
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় আজ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এক কালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হলে দেখাতেম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করিছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরম॥

ইহা ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী রচিত মহাভারতের অনেক স্থান কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাইতেছে। প্রধান কবিগণ অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভাব আত্মসাৎ করিয়া তাহাতে দখলী স্বত্ব স্থাপন করেন। সর্ব্ব দেশেরই শ্রেষ্ঠ কবিগণের সে অধিকার আছে;—কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে এরূপ অধিকার স্বীকার করা যায় না। একে ত অনুবাদ জিনিসটা মৌলিক নহে, ভাষান্তরিত করিতে যাইয়া যদি পুচ্ছগ্রাহিতা করিতে হয়, তবে আর বাহাদুরী কি? তাহা ছাড়া কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির যেরূপ ভাবগত মিল দেখা যাইতেছে, তাহাতে [illegible] ব্যাপারটিকে [illegible] না বলিয়া [illegible] নাম দিলেও অসঙ্গত হয় না।

যে কয়েক [illegible] কাশীদাস [illegible], [illegible] অনেক [illegible]

বিশেষ [illegible] আছে। তিনি অনূদিত সংস্কৃত [illegible] শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি। [illegible] যুগনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।" "নিরুপম ইন্দুজ্যোতি [illegible]" প্রভৃতি রচনায় তিনি শব্দালঙ্কারে বঙ্গীয় কবির যে রুচি প্রবর্তিত করেন, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় কাব্যকাননে অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতির প্রাচুর্য্যে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে পর্ব্বগুলি তাঁহার রচিত নহে, অথচ তাঁহার নামে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল পর্ব্বেই পুচ্ছগ্রাহিতা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত অংশগুলির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহাকেই মহাভারত-অনুবাদকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

৩। ভাগবতের অনুবাদ।

ভাগবত অনুবাদকগণের মধ্যে মালাধর বসু আদি কবি। সাত বৎসরের চেষ্টায় ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন। মালাধর বসু কুলীন গ্রামনিবাসী ছিলেন। এই গ্রামখানি গড়ে বেষ্টিত ছিল, এবং তথাকার বসুবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। জগন্নাথ তীর্থের যাত্রীদিগকে বসু মহাশয়দিগের নিকট 'ডুরী' লইয়া যাইতে হইত। মালাধরের ভ্রাতা গোপীনাথ বসু হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ করার পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দান করেন, তাহা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে।

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধব মিশ্র ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ রচনা করেন। মাধব মিশ্রের পিতার নাম কালিদাস মিশ্র। ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পিতৃব্য ছিলেন। মাধব মিশ্র মহাপ্রভুর টোলে পাঠ করিয়াছিলেন। ভাগবতের অনুবাদ ইনি মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ করেন।

বিষ্ণুপুরী-কৃত সংস্কৃত "রত্নাবলী" বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত গ্রন্থ। ইহা ভাগবত-অবলম্বনে বিরচিত হয়। শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী লাউড় নামক স্থানের রাজা [illegible] সিংহ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া "কৃষ্ণদাস" নামে পরিচিত হন। ইনি রত্নাবলীর একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই কবি "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত।

গৃহে রাখিবেন, এ সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। নিখিল বিশ্বে এক ললিতা ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর ত কেহ ছিল না। কিন্তু বিধাতার খেলা-ঘরে মানুষ যাহা গড়িয়া তুলে, দেবতার নির্দ্দয় কঠোর অলক্ষ্য হস্তস্পর্শে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। ললিতার কপাল পুড়িল। পিতার স্নেহপ্রাণ হৃদয় এই নিদারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভগবানের নাম লইয়া ব্রাহ্মণ তখনই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বালিকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কাব্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ললিতা গীতাও পাঠ করিল। পিতার অবিচল পরিশ্রম ও যত্নে মেধাবিনী ললিতা বহু গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিল; ধর্ম্মশিক্ষায়ও অনেক উন্নতি হইল। কিন্তু অধিক দিন পিতার স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় তাহার অদৃষ্টে সহিল না।

বাইশ বৎসর বয়সে ভরা যৌবনের বোঝা লইয়া ললিতা বিশাল সংসার-সমুদ্রে একাকিনী ভাসিয়া চলিল। পিতৃশোকাতুরা বিধবা শিক্ষা ও সংযম-বলে নিদারুণ শেলাঘাত সহ্য করিয়া ভূমিশয্যা ত্যাগ করিল। পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণও ত আবশ্যক। গৃহে প্রাচীনা পরিচারিকা রঙ্গিয়া তাহার একমাত্র অভিভাবক, সঙ্গিনী, বা সহচরী স্বরূপ রহিল।

মহাভারতের পবিত্র কাহিনী ললিতা শতবার পাঠ করিয়াছে, কিন্তু তাহা চিরনূতন। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যের পুণ্য চরিত্র, অতীত উন্নতিযুগের ইতিহাস, পবিত্র ধর্ম্মভাব এই মহা গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রে কি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত! হিন্দুর অতীত শৌর্য্য, বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠার কাহিনী, মহত্ত্বের মহিমা ললিতার হৃদয়ে কি গভীর অপূর্ব্ব ভক্তির সঞ্চার করিয়া দিত! তাই অবসর পাইলেই ললিতা প্রত্যহ হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল অতীত কাহিনীর মহাগ্রন্থ পাঠ করিত।

ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, চিরকুমার ভীষ্মের পবিত্র কাহিনী পাঠ করিতে করিতে বিধবার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। এমন বীর, এমন ধীর, এত উদার, এত মহান্ আর কে? কতবার সে ঋষিকল্প শান্তনুনন্দনের বিচিত্র আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব সংযমের কথা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি কখনও তাহা পুরাতন হইল না। মহাসমুদ্রের অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ন্যায়, শারদ অপরাহ্ণের আকাশে পরিবর্ত্তনশীল শোভন মেঘমালা ও আলোকদীপ্তির ন্যায়, তাহা নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত!

পড়িতে পড়িতে সহসা ললিতা চকিতা হরিণীর ন্যায় মুখ তুলিয়া উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ও কি! কিসের শব্দ?

ললিতা নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। সেই অবিচ্ছিন্ন তিমিরগর্ভ হইতে কোনও দেববীণার মধুর ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর তান ক্রমশঃ উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া নীরব নৈশ আকাশ মুখরিত করিতেছিল। এ কি সুর-সৃষ্টি! কি মর্ম্মস্পর্শী, করুণ, কোমল, উদার অভিনব রাগিণী বাজিতেছিল! কে বাজায়?

মহাভারত তুলিয়া রাখিয়া বিধবা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে চারি দিক নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বাতায়নের নিম্নে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। তথা হইতে প্রত্যহ প্রভাতে ললিতার পূজার পুষ্প আহরিত হইত। উদ্যানের পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা গোমতী। বীণার তান উদ্যানের বাহিরে অতিনিকটস্থ কোনও স্থান হইতে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। বীণা কখনও উপলঘাতিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ন্যায় অস্ফুটকলরবে নৃত্য করিতেছিল; কখনও বিশাল জলপ্রপাতের ন্যায় ঝর্ ঝর্ শব্দে যেন নিঃশব্দ প্রকৃতির বন্দনা করিতেছিল; কখনও ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনাকে বিদীর্ণ করিতে চাহিতেছিল। বাদকের অঙ্গুলিতে কি তাহার প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল? রাগিণীর প্রতি ঝঙ্কারে ললিতার হৃদয়ের এক একটি অপরিচিত অংশ যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আজ চিরপরিচিতের মত তাহার মানস-নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

এ কি কোনও দেবতার বীণাধ্বনি? মানব-হস্তে এরূপ বিচিত্র সুর-সৃষ্টি অসম্ভব। এত পবিত্র, মধুর, সুন্দর, শান্তিসুধাপূর্ণ বীণারব যদি কোনও মানবের অঙ্গুলিতাড়নে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তিনি পুরুষ বা নারী, যেই হউন না কেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন, তিনি পূজার যোগ্য।

বন্দনার রাগিণী, স্তুতির ঝঙ্কার সহসা পরিবর্ত্তিত হইল;—বীণা আর এক নূতন ছন্দে বাজিতে লাগিল। সে ছন্দ, সে রাগিণী ললিতার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। সে যেন আহ্বানের সুর, জাগরণের সুর। ললিতার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে রাগিণীর স্রোত যেন পুণ্য জাহ্নবীধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, বীণা যেন ডাকিতেছে,—'উঠ, জাগ, আর কত ঘুমাইবে? এখন আর তন্দ্রাঘোরে মগ্ন থাকিও না। পূর্ব্ব গগনে আশার অরুণ দীপ্তি ফুটিয়াছে। নিদ্রার মায়া-আবরণ ফেলিয়া দাও। অন্ধকারের শেষ—নিদ্রার সমাপ্তি। এখন উঠ, জাগ; প্রাণ ভরিয়া দিব্য জ্যোতিঃ,—মুক্তির আলোক দর্শন কর।'

তুমি কে, কোন্ দেবতা, আজ কোন্ অদ্ভুত শক্তিবলে ললিতার হৃদয়ে রাগিণীর সুরে এই অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ করিলে? সত্যই কি বীণার রবে, বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শে এই নবভাবের স্ফুরণ, না ললিতার অধ্যয়নক্লান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? বিধবা ভাবিতেছিল, কবে তাহার আশাশূন্য অন্ধকার, দীর্ঘ রজনীর প্রভাত হইবে? কবে সে নবীন আশার অরুণ রাগে মুক্তির পথ দেখিতে পাইবে! তাহার জীবনের কালনিশি ত প্রভাত হয় না!

বীণা নীরব হইল। ললিতার মানস-কক্ষের সমস্ত আলোকও যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাহার বোধ হইল, এতক্ষণ যেন সে স্বপ্নঘোরে কোন ইন্দ্রলোকে, আলোকসমুজ্জ্বল পুষ্পগন্ধব্যাকুল নন্দনবনে বিচরণ করিতেছিল; স্বপ্নভঙ্গে আবার অস্থিকঙ্কালময় চিরপরিচিত শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়াছে!

২

প্রাচীললাটে শঙ্খ্য সত্যই তখন উষার কনক-মুকুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কৃষক-ললনার গোধূম-পেষণযন্ত্রের শব্দ কুটীরে কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। উষার বাতাস নিদ্রাশ্রান্ত নগরীর অঙ্গে নূতন জীবনপ্রবাহ বহন করিয়া আনিতেছিল।

সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

স্নানান্তে বিধবা পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া পূজায় বসিল। কিন্তু আজ ভগবানকে সে কোনও মতেই প্রাণ ভরিয়া একান্ত বিশ্বস্তভাবে ডাকিতে পারিতেছে না কেন? ডাকিতে গেলেই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। অন্তর আকাশেও যেন একখানি জলভরা মেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। পরলোকগত পিতার কথা মনে করিয়া ললিতা শেষে খুব খানিকটা কাঁদিল। এই ক্রন্দনের কোনও কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না বটে, কিন্তু মনের অনেক ভার লঘু হইল। তখন সে গৃহকার্য্যে মন দিল।

সন্ধ্যার অঞ্চলস্পর্শে অপরাহ্ণের ম্লান আলোকরেখা মুছিয়া গেল। গোমতীর স্বচ্ছ সলিল কালো হইয়া আসিল। দূরে পথের রেখা আর দেখা যায় না। ললিতা তখন গৃহে প্রদীপ জ্বালিল। দিনের বেলা সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে আবার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্য দিন ললিতা এমন সময় পড়িতে বসিত; কিন্তু আজ সে আগ্রহ কিছু শিথিল। তাহার মন যেন কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিল। রজনী শুইয়া পড়িল। ললিতার কি প্রাণবিরোধ নাই ?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আর ভাল লাগে না। যুবতী কোলের কাছে একখানি গ্রন্থ টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে—" কই ? আকাশের কোনও স্থানে এতটুকু মেঘের রেখাও ত দেখা যায় না। কেবল অবিচ্ছিন্ন নীল আকাশ, শুভ্রফেনিত ছায়াপথ। আষাঢ়ের মেঘমেদুর অম্বরে আশার আলোক হয় ত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্ত নির্ম্মল আকাশ নিতান্ত নিষ্ঠুর। মিথ্যা আবরণে তাহার কোনও অংশ আচ্ছন্ন নহে। মেঘদূত মুদিয়া রাখিয়া ললিতা আবার চিন্তামগ্ন হইল।

কোথায়, তুমি কোথায় ?—কে সে ? যুবতী কাহার কথা ভাবিতেছে ? ললিতা ত তাহা জানে না। কিন্তু তাহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ হইতে কেহ যেন আর্ত্তচীৎকারে বলিতেছিল,—তুমি কে, তুমি কোথায় ? কবে তুমি আসিয়াছিলে, কখন ফিরিয়া গিয়াছ ? আবার কখনও আসিবে কি না, জানি না। তুমি রমণী কি পুরুষ, সূক্ষ্ম কি স্থূল, তাহাও জানি না ; কিন্তু শুষ্ক হৃদয়ে, শূন্য অন্তরে এ কি প্রবাহ, কি সুধাপ্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ! কোথায় ইহার শেষ, কবে ইহার সমাপ্তি, কিরূপই বা পরিণাম, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে ?

কোতোয়ালীতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। এত রাত হইয়াছে ? বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝনন্ ঝনন্ ঝন্! ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বীণা-রব পূর্ব্বরজনীর ন্যায় আজিও নৈশ সমীরণকে ব্যাকুল করিয়া বাজিয়া উঠিল। আবার স্বপ্ন! নূতন সুরে, অভিনব ছন্দে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, বীণা গ্রামে গ্রামে উঠিতে লাগিল। বিস্ময়মুগ্ধা যুবতী তন্ময়চিত্তে সুধাঝঙ্কৃত রাগিণী শ্রবণ করিতে লাগিল। সুরের বিরাম নাই। ললিতারও ক্লান্তি ছিল না।

বাজিয়া বাজিয়া বীণা শেষে নীরব হইল।

প্রতি রজনীতে এইরূপ ঘটিতে লাগিল। নিশীথে বীণা বাজে, রজনী-শেষে থামিয়া যায়। দিনের পর দিন এই বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। কিন্তু এই অদৃষ্ট, অপরিচিত বীণাবাদককে আবিষ্কার করা গেল না। আবিষ্কারের জন্য ললিতার তেমন আগ্রহও ছিল না। বীণার ঝঙ্কারটুকুই তাহার সুখস্বপ্ন।

ক্রমে অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি ললিতার নয়ন-কোণে কৃষ্ণরেখা টানিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে বিধবা বিশেষ কষ্ট অনুভব করিল না। তপস্যায় শরীর ক্লিষ্ট হয়, কিন্তু সাধকের অন্তর আনন্দ-সুধা-পানে দিন দিন উৎফুল্ল ও পুষ্ট হইয়া উঠে। ললিতার হৃদয় ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা-ভরে প্রতি রজনীতে এই অপূর্ব্ব রাগিণী-সুধা আকণ্ঠ পান করিত। তাহার আশাহীন, সুখহীন, ব্যর্থ জীবনে এই বীণাধ্বনি যেন এক নূতন অপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র আনন্দসংবাদ, অদৃষ্ট দেবতার অখণ্ড আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিত। আশার আলোকে, অপূর্ব্ব তৃপ্তির নির্ঝরধারায় বিধবার শুষ্ক, ম্লান জীবনকুঞ্জ ক্রমে উজ্জ্বল ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল।

দীর্ঘ দিবস, সমস্ত রজনী ললিতা বীণাধ্বনির স্বপ্নে নিমগ্ন থাকিত। তাহার সমস্ত চিন্তা, সমুদয় গৃহকর্ম্মকে বেষ্টন করিয়া এই নৈশরাগিণী ঝঙ্কৃত হইত। মানুষ যাহা একান্তমনে ভাবে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহার ছায়া অনুভূত হয়। ক্রমে এমন হইল যে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে, মনুষ্যের পদধ্বনিতে, পবনের নিশ্বাসে সে প্রতিক্ষণে বীণারবের পূর্ব্বাভাষ অনুভব করিতে লাগিল।

সুরা ও সুধার ক্রিয়া একরূপ, কেবল সংজ্ঞার পার্থক্য। মাতাল সুরার জন্য তৃষ্ণাতুরহৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। অমৃতপায়ীও নেশার ঘোর কাটাইতে পারে না। ললিতা সঙ্গীত-সুধাপানে মাতাল হইয়াছিল। অহিফেনসেবী নিরূপিত সময়ে অহিফেনের বড়িটির জন্য যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, অমৃত-ধারা পান করিবার জন্য ললিতা তেমনই আগ্রহে যথাসময়ে বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত। দীর্ঘ দিবা ও ক্লিষ্ট সন্ধ্যাটুকু বাদ দিয়া যদি রাত্রি দ্বিপ্রহর সহসা পৃথিবীর অঙ্কে দেখা দিত!

৩

সেদিন পূর্ণিমা। প্রখর সূর্য্যকর-দগ্ধ নিদাঘবায়ু সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া স্নিগ্ধ ও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রকিরণদীপ্ত নীল আকাশে মৌন প্রকৃতি নীরবে কাহার বন্দনা করিতেছে!

আজিও যথাসময়ে ললিতার কর্ণে বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হইল। অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, বীণারব ললিতার হৃদয়কে আজ তেমনই ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে আজ আর কোনও মতে হৃদয়কে সংযত করিতে পারিতেছিল না। স্বপ্নাবেশে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন লঘুগতিতে অনায়াসে সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম পূর্ব্বক ঈপ্সিত স্থানে গমন করে,

ললিতা সেইরূপ বীণাধ্বনি লক্ষ্য করিয়া কক্ষ দুয়োর খুলিয়া [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল,—দূরে নক্ষত্রলোকেও যেন সেই বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে। অট্টালিকার পানে দৃষ্টি ফিরিল। তাহার শয়নকক্ষের ক্ষীণ দীপরশ্মিও যেন রাগিণীর তালে তালে নাচিতেছে। ক্লান্ত নয়নদ্বয় তুলিয়া ললিতা আশে পাশে, চারি দিকে চাহিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবীই কি রাগিণী-স্বপ্নময়!

ললিতা অনুভব করিল, চতুর্দ্দিক হইতে কাহারা যেন নীরবে কি ইঙ্গিত করিতেছে। কে ইঙ্গিত করিতেছে, কিসের ইঙ্গিত?

স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় বিধবা প্রাচীরসংলগ্ন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে গোমতী। অনতিদূরে একটি নিম্বকুঞ্জ। বীণারব তথা উত্থিত হইতেছিল। ললিতা থমকিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রকিরণপ্লাবিত গোমতীর তটদেশে যোগমগ্ন শঙ্করের ন্যায় শুভ্রবসন, রুক্ষকেশ, ঋষিকল্প এক ব্যক্তি নিমীলিতলোচনে বীণাবাদন করিতেছিলেন। রজতশুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলম্বিত। নির্ব্বাক আননে কি শুভ্র পবিত্রতা! তাঁহার প্রশস্ত ললাট ও বিশাল বক্ষঃস্থল স্বাস্থ্য ও সংযমের পবিত্র নিবাস। বিস্ময়মূক বিধবা অনিমেষনেত্রে সেই অপূর্ব্বদর্শন, স্নিগ্ধকান্তি যুবকের মহিমাব্যঞ্জক দেহে সম্বদ্ধ হইল।

বহুক্ষণ বাজিয়া বাজিয়া বীণা নীরব হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাদক ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কবে সে দিন আসিবে? কবে তোমার ললাটে উষার প্রসন্ন হাসি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না!"

অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি সহসা ললিতার প্রতি পতিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

কি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! ললিতার হৃদয় কাঁপিতেছিল। হৃদয় কম্পিত হইলে অনেক সময় দেহেও তাহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিধবার মুখে কথা ফুটিল না।

পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে পুরুষ বলিলেন, "কে তুমি? অনুমানে বোধ হইতেছে, কোনও গৃহস্থকন্যা। কিন্তু এ সময়ে এখানে কেন?"

কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যুগ যুগ ধরিয়া এই প্রশ্ন লোকে লোকে ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু তাহার উত্তর কোথায়?

রমণীকে নীরব দেখিয়া বীণাবাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীণাযন্ত্র কক্ষদেশে রক্ষা করিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যেই হও, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। গৃহস্থললনার পক্ষে এ সময়ে এ স্থান উপযুক্ত নহে। তোমার আত্মীয়েরা দেখিলে কি বলিবেন ?"

অন্ত সময় হইলে নারীসুলভ লজ্জাবশতঃ হয় ত ললিতা অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু সঙ্গীতের প্রভাবে, রাগিণীর ঝঙ্কারে তাহার আত্মা ঐহিক সংস্কারের বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সংসারবুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাঁধ ভাঙ্গিলে রুদ্ধস্রোত নদীর সঞ্চিত জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে দুই কূল ভাসাইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। ললিতার পরিপূর্ণ হৃদয় সন্ন্যাসীর কোমলস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যবধান অন্তর্হিত হইল। সে তাহার আশাসম্পর্কশূন্য, সুখলেশহীন জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। এই বিরাট বিশ্বে সে একাকিনী। যৌবনের দীপ্ত-মধ্যাহ্নে বিরাট চিতা হৃদয়ে জ্বালিয়া সংসারের এক প্রান্তে পড়িয়া আছে; তীব্র তাপ সহিয়া সহিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। শিক্ষা ও সংযমে কিছু শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আগুন একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না। ঐশ্বর্য্যে সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু আনন্দ কোথায় ? অতৃপ্তির বোঝা বহিয়া বহিয়া যখন সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে দৈবপ্রেরণাবলে, ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদে সহসা তাহার শুষ্ক মালঞ্চে প্রসূনপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কি অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ-প্রস্রবণ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অপরিচিত সাধকের বীণাধ্বনিতে তরুণ অরুণের উজ্জ্বল আলোকরেখা অনুভূত হইতেছে। তাই আজ ললিতা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; আনন্দ-নির্ঝরের মূলে ছুটিয়া আসিয়াছে।

কথা শেষ করিয়া ললিতা কম্পিতস্বরে বলিল, "আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া হতভাগিনীকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রহ্মচারী স্থির, অবিচলিতভাবে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার বাক্যে বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। প্রশান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি! কাল হইতে বীণা আর বাজিবে না। এখন গৃহে যাও। যদি জানিতাম, বীণাধ্বনি শুনিয়া কোনও নারী অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে

সতর্ক হইতাম। নির্জ্জন স্থল ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিষম ভ্রম করিয়াছি।"

আর বীণা বাজিবে না?—কি মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর সত্য! ললিতার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শান্তিধারাশীতল বীণাঝঙ্কার আর সে শুনিতে পাইবে না! হৃদয়ের দীপ্ত চিতানল যে রাগিণীর অমৃতধারায় ক্রমশঃ ম্লান, হীনতেজ ও শীতল হইতেছিল, সে সুধাস্রোত আর বহিবে না! অপূর্ব্ব তৃপ্তি, সুকোমল সান্ত্বনা মুহূর্ত্তের সুখস্বপ্নের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইবে?

যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে ললিতা বলিল, "আমি আর আসিব না। আর আপনার নির্জ্জন আরাধনার ব্যাঘাত করিব না। এখানে বসিয়া বীণাবাদন করুন, কেহ আপনাকে বাধা দিবে না। আমি চলিলাম। শুধু এই নিবেদন, বীণাবাদন বন্ধ করিবেন না। উহাই আমার জীবনীশক্তি। বীণা বন্ধ হইলে আমি বাঁচিব না।"

যুবতী আর দাঁড়াইল না। বসন্ত বায়ুর মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিন্তু ললিতা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। আরতির ঘণ্টা বাজিলে ভক্ত যেমন অধীরভাবে দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় মন্দির পানে ছুটিয়া যায়, পর দিবস বীণা বাজিবামাত্র ললিতাও তেমনই ব্যাকুলভাবে গৃহের বাহির হইল। কোনও ক্রমেই সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না।

এত কালের শিক্ষা সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল? যুবতীর হৃদয়-নদীর দুই কূল ভাসাইয়া বান ডাকিয়াছিল। সে স্রোতোবেগ কে রুদ্ধ করিবে?

আলোকপ্লাবিত মুক্ত আকাশতলে, নদীতীরে—যেখানে বসিয়া অপরিচিত সাধক রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন, ললিতা ব্যাকুলভাবে তথায় উপনীত হইল।

বোধ হয়, ব্রহ্মচারী আজ তেমন নিবিষ্টচিত্তে, একাগ্রভাবে সাধনা করিতে পারিতেছিলেন না, কিংবা ললিতার দ্রুত পদশব্দ বা ব্যাকুল নিশ্বাসপতনে বায়ুস্তরে অস্বাভাবিক স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, সাধকের যোগভঙ্গ হইল।

তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রবসনা দেবীপ্রতিমা। অপ্রসন্নভাবে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবার আসিয়াছ?"

সে রূঢ় জিজ্ঞাসায় ললিতার মর্ম্মস্পর্শ করিল; কিন্তু সে স্থানত্যাগ করিল

না। যে রাগিণীর পুণ্য প্রভাবে হৃদয়ের সকল দৈন্য দূর হইয়াছে, তাহার আশা পরিত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। ললিতা মরিবে, কিন্তু বীণা-স্বর-শ্রবণের প্রলোভন কখনই দমন করিতে পারিবে না। সে যুক্তকরে বলিল, "আমার বলিবার কিছু নাই; আমার মার্জ্জনা করুন। বীণাস্বরের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। আপনি অনুমতি করুন, আমি প্রত্যহ যেন উহা শ্রবণ করিতে পাই। উহার জন্ত আমি যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।"

বিস্ময়মুগ্ধ সাধক বিস্ফারিতনেত্রে কিয়ৎকাল এই অপূর্ব্বচরিত্রা নারীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "কল্যাণী, তুচ্ছ কল্পনার স্বপ্নে মুগ্ধ হইও না। সংসারে সকলেই কাজ করিতে আসিয়াছে। তোমার কি কোনও কাজ, কোনও কর্ত্তব্য নাই?"

কাজ? সে কিরূপ? আহার, শয়ন, অধ্যয়ন? তাহাতে আনন্দ কই? অন্ত কর্ম্ম কি, তাহা ত ললিতা জানে না! সে কেবল আজীবন মন্ত্রই মুখস্থ করিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া কখন উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সে অবগত নহে। কেহ ত তাহাকে প্রয়োগবিধি শিখায় নাই! পিতার নিকট সে ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়াছিল বটে; কিন্তু ধর্ম্ম ও কর্ম্মের যে প্রগাঢ় সম্বন্ধ, সে কখনও তাহা শিক্ষা করে নাই। অবকাশও ঘটে নাই।

সংসারে যাহার পুত্র কন্যা, স্বামী, পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন আছে, সে তাহাদের সেবায়, তাহাদের সহস্র কার্য্যে, সুখে দুঃখে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখে। কিন্তু যাহার কেহ নাই, সে হতভাগ্য সংসারে থাকিয়া নিঃসঙ্গ দুর্ব্বহ জীবনভার কেমন করিয়া বহন করিবে? তাই ভগবান্‌কে ডাকিতে গিয়াও সে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে না। তাই অমৃতসিন্ধুর কূলে দাঁড়াইয়াও ললিতা তৃষ্ণার জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছে।

হতাশভাবে ললিতা বলিল, "তবে আমার উপায় কি হইবে? শূন্য হৃদয় লইয়া কর্ম্মহীন জীবন বহন করিব কিরূপে? যে অবলম্বন আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে আবার শক্তিসঞ্চার হইতেছিল, যখন সে আশাও চলিয়া যাইতেছে, তখন আমার উপায় কি?"

সান্ত্বনাস্নিগ্ধ স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কল্যাণী, অনুশোচনা ত্যাগ কর। কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দাও। আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে। জীবন এত দুর্ব্বহ হইবে না। যদি ইহা কর, আমার ব্রতে তোমায় দীক্ষিত করিব।

এ ব্রত গ্রহণ করিলে হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ লাভ করিবে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বীণার স্বরে তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।”

তবে তাহাই হউক। বীণাধ্বনি যদি তাহার হৃদয়ে চিরকাল বাজিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার আর কিছু আবশ্যক নাই। সে এ ব্রত গ্রহণ করিবে, নিশ্চয় করিবে।

সন্ন্যাসী বলিলেন; “আমার সহিত আইস; কোনও ভয় নাই।”

অনতিদূরে কতিপয় ভগ্ন ও অৰ্দ্ধভগ্ন কুটীর। ব্রহ্মচারী উহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৌশলে আলোক জ্বালিয়া প্রাচীর-বিলম্বিত ভিক্ষার ঝুলি নামাইলেন। তার পর চিত্রবৎ একখানি কাগজ উহার মধ্য হইতে বাহির করিলেন।

ললিতা সবিস্ময়ে তাঁহার কাৰ্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, “ওখানি কি?”

সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে একটা উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল। তিনি নীরবে চিত্রখানি ললিতার হস্তে প্রদান করিলেন।

ললিতা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “বাক্যে যাহা সকল সময় বুঝান যায় না, একটা ইঙ্গিতে তাহা পরিস্ফুট হয়। ইহা বিরাট, বিশাল কৰ্ম্মভূমির নক্সা—মানচিত্র। ইহারই সাধনায় জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছি; দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই মন্ত্রই জপ করিয়াছি; অন্য কোনও কামনা, অন্য কোনও বাসনা নাই। জানি না, এ সাধনা কখনও সফল হইবে কি না।”

ললিতা স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিল না বটে; কিন্তু তথাপি তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সন্ন্যাসীর বাক্য, ব্যবহার, সমস্তই তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ যেন নূতন জগতের নূতন সংবাদ!

সাধক বলিলেন, “এ ব্রত বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। তুমি ইহা গ্রহণ করিতে চাও?”

ললিতা সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

তখন সন্ন্যাসী কুটীরের বাহিরে আসিলেন। আলোকপ্লাবিত ধরণী সুপ্তির স্নেহক্রোড়ে তন্দ্রাতুর—নিস্পন্দ। মুসলমান নবাবদিগের অতীত কীর্ত্তির গৌরব, মীনারসমূহ নির্ব্বাক প্রহরীর ন্যায় আকাশতলে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "উহা কি দেখিতে পাইতেছ?"

যুবতী নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "ছত্রমঞ্জিল?"

"হাঁ। ওখানে কে থাকেন?"

"শুনিয়াছি,—বর্ত্তমান নবাবের বেগম।"

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঐখানে তোমার প্রথম কার্য্য।"

ললিতা অতিমাত্র বিস্মিত হইল। ছত্রমঞ্জিলে, মুসলমান নবাবের প্রাসাদে তাহার কি কার্য্য?

ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে আমার কি কার্য্য?"

"বেগমের বাঁদীগিরি। পারিবে?"

হিন্দু, ব্রাহ্মণকন্যা বেগমের পরিচারিকা! এ অত্যন্ত অদ্ভুত প্রস্তাব।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি জাতি ও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিতেছ। কিন্তু যে বিরাট কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছ, তাহাতে জাতি ও ধর্ম্ম বিচার করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম সনাতন, কেহ তাহা নষ্ট করিতে পারে না; জাতি যাহার আছে, তাহার কখনও উহা যায় না। আমার গলদেশে যজ্ঞোপবীত দেখিতেছ না? তোমার ইজ্জত ও ধর্ম্মের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ব্রাহ্মণ হইয়া কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতাম না। মুসলমানের সাহচর্য্যে হিন্দুর ধর্ম্মলোপ হয় না। বিশেষতঃ, হিন্দু ও মুসলমান একই কর্ম্ম-যজ্ঞের হোতা। যদি মনে সঙ্কোচ হয়, তাহা হইলে কল্যাণী অন্তঃপুরে ফিরিয়া যাও।"

ললিতা বলিল, "আজন্মের সংস্কার সহসা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। অপরাধ মার্জ্জনা করুন। মনকে দৃঢ় করিতে যত্ন করিব। আপনার আদেশ অলঙ্ঘ্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নির্ম্মল গগনে শীঘ্র নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইবে। অন্তত্র হইয়াছে। প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তার পর প্রলয়ের মহা ঝটিকা উঠিবে। নবাবের বেগম আমাকে বিলক্ষণ জানেন। চাক্ষুষ আলাপ নাই,—উভয়ে একই মন্ত্রের উপাসক বলিয়া। এখন প্রত্যহ তাঁহার সহিত আমার নানা বিষয়ের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু বেগমের অন্তঃপুর পুরুষের অগম্য। তোমার দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আপাততঃ নবাব এখানে নাই। শীঘ্র তাঁহার ফিরিবারও সম্ভাবনা

নাই। সুতরাং ছত্রমঞ্জিলে এখন বেগমের একাধিপত্য। [illegible] দেখাইলে বেগম তোমাকে বিশ্বাস করিবেন। বিশেষ আমার বড় [illegible]। বেগম বুদ্ধিমতী, উদারহৃদয়া। নিজের ইচ্ছামত সেখানে কালযাপন করিতে পারিবে। আপাততঃ সর্ব্বদা তোমার সেখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

তার পর ব্রাহ্মণ ললিতার কানে কানে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন।

শুনিতে শুনিতে ললিতার সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। নয়নে অস্বাভাবিক আলোকরশ্মি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "এত বড় মহৎ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার একটা নারীর উপর দিলেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নারীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস, নারীর সাহায্য ব্যতীত কোনও মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে সাধন করা যায় না।"

ললিতা সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় দিল।

৫

মধ্যাহ্ন হইতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। অপরাহ্নে গগনমণ্ডল নিবিড় নীরদজালে আচ্ছন্ন হইল। বায়ুর বেগও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ঝটিকা আসন্ন। গোমতীর স্বচ্ছ সলিলরাশি মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণচ্ছবি।

ছত্রমঞ্জিলের একটি কক্ষে দাঁড়াইয়া ললিতা আকাশের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। এক মাস ধরিয়া সে ব্রহ্মচারীর আদেশ পালন করিতেছে। প্রত্যহ অপরাহ্নে তাঁহার নিকট হইতে বেগমের কাছে সে সংবাদ বহন করিয়া আনিত, এবং বেগমের কথা তাঁহাকে জানাইয়া আসিত। সে কার্য্যে তাহার একটা প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। এমন নূতনতর কাজের কথা সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। তাহা কল্পনারও অগোচর! কি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন! যজ্ঞ পূর্ণ হইলে, কি মুক্তি, কি আনন্দ! ললিতা দিবারাত্রি এই মহান্ কর্ম্মযজ্ঞের কথা চিন্তা করিত; নবীন আশায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। এত বৃহৎ কর্ম্মের এতটুকু অংশ যে তাহার ভাগে পড়িয়াছে, তজ্জন্য সে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ভগবান্‌কে ডাকিবার যথার্থ পথ এত দিন পরে সে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এতদিন ছত্রমঞ্জিলে থাকিবার তাহার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে দিন লক্ষ্ণৌয়ে প্রলয়-ঝটিকা প্রথম প্রবাহিত হইল, তাহার পর দিন হইতে ললিতা ব্রহ্মচারীর আদেশে বেগমের

[illegible] বন্দিনী হইয়াছে। নগরে ঘোর অশান্তি। [illegible] হইতে আত্মরক্ষার জন্য নাগরিকেরা যে কোথায় পলাইয়াছে, তাহা কে বলিবে? চতুর্দ্দিকে কেবল আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু গর্জ্জন, আর্ত্তের চীৎকার, উন্মত্ত [illegible] হুঙ্কার, আশার ও নিরাশার দ্বন্দ্ব!

ললিতাও কয় দিন একটা নেশার ঝোঁকে, প্রবল আত্মময়ী উত্তেজনায় [illegible] করিতেছিল। বেগমের অচল অটল আত্মনির্ভর, নির্ভীক ভাব ও আবেগে [illegible] তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ সে ভুলিয়াছিল।

নীরদজাল দিগন্তবিস্তৃত হইল। আকাশে দামিনী হাসিতে লাগিল। সহসা প্রলয়কালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এককালে শত শত ভীষণ শব্দে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। বেগম কক্ষান্তর হইতে ললিতার পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের মৃত্যুলীলা আজ প্রভাত হইতে এক প্রকার বন্ধ ছিল; আবার সহসা অভিনয় আরম্ভ হইল না কি?

অন্তঃপুর-রক্ষক খোজা আব্বাস্ পরক্ষণেই দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শব্দ কেন?"

খোজা উত্তর করিল, "প্রায় পাঁচ হাজার নূতন সৈন্য সিপাহীদিগকে ঘিরিয়াছে। তোপের মুখে সিপাহীরা পবনতাড়িত তুলার মত উড়িয়া যাইতেছে।"

বেগম জানু পাতিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। দুই কর ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "হে আশ্‌মানের ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এত দিনের সাধনা সব নিষ্ফল হইল, এই যা দুঃখ। শেষ রক্ষা হইল না!"

বেগমের কমলনয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ললিতা ইতিপূর্ব্বে বেগমের এরূপ চাঞ্চল্য দেখে নাই। তাহারও দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ললিতাও ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল।

বেগম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "ভগিনী, তোমার স্নেহ, তোমার ত্যাগস্বীকার ও মহত্ত্ব কখনও ভুলিব না। এখন হইতে তোমার ছুটী। তুমি গৃহে যাও। ছত্রমঞ্জিল আর নিরাপদ নহে। তোমার কেশাগ্রের ক্ষতি হইলে আমার মৃত্যুর অধিক বাজিবে। এখনও সময় আছে। সিপাহীরা নিরাপদে তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে পারে। তুমি যাও।"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "বেগম সাহেব, বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এখানে আপনার আশ্রয়ে আছি। কিন্তু গৃহে গেলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার লোক জন সব এই দুর্দ্দিনে পলাইয়াছে। আমি এখানেই থাকিব। গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কোথাও যাইতে পারিব না।"

বেগম সে কথার কোনও উত্তর করিলেন না।

ললিতা তখন দূরে কি দেখিতেছিল। তাহার বোধ হইল, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যেন ছত্রমঞ্জিলের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অনিশ্চিত আশঙ্কায় ললিতার হৃদয় কম্পিত হইল। সে বেগমকে উহা দেখাইল।

খোজা আব্বাস আবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। সে সংক্ষেপে জানাইল, "বেগম সাহেবাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহুসংখ্যক রাজসৈন্য আসিতেছে। এখন কি হুকুম?"

বেগমের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাপুরুষের মত ধরা দিব না; বরং মরিব। সমস্ত কটক বন্ধ করিয়া দাও।"

ললিতা বলিল, "তার পর?"

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাসাদে কত সিপাহী আছে?"

খোজা উত্তর করিল, "বিশ পঁচিশ জন হইবে। তাহারা সকলেই বেগম সাহেবার রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প।"

"তাহাদিগকে বল, আমি প্রাণ থাকিতে ধরা দিব না।"

ললিতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বেগম সাহেবের মান ইজ্জত রক্ষার ভার তোমাদের উপর। বীরপুরুষেরা কখনও নিমকহারামী করিবে না।"

সিপাহীরা খোজার আদেশে কটকের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ললিতার কথা শুনিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিল।

ঝড়ের ন্যায় বেগে অসংখ্য রাজসৈন্য ছত্রমঞ্জিল অবরোধ করিল। তাহাদের হস্তে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ প্রতিমুহূর্ত্তেই অগ্নিনিঃক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ললিতা দেখিল, শত্রুসৈন্যের নিক্ষিপ্ত অগ্নিবর্ষণে মুষ্টিমেয় সিপাহী মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ছত্রমঞ্জিলের একখানি ইষ্টকও অবশিষ্ট থাকিবে না।

বেগমের মুখ বিবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি মৃত্যুর

অন্ত প্রহরে খোজা আবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। জানাইল যে, বেগমকে বন্দিবার জন্যই এত আয়োজন। তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে অন্য কোনরূপ অত্যাচার হইবে না। রাজসৈন্যের অধ্যক্ষ এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

বেগম অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মৃতদেহ লইয়া যাইতে পারে।"

ললিতা কি ভাবিতেছিল। সহসা বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। হায়! হায়! এতক্ষণ এ কথাটা তার মনে পড়ে নাই কেন? কিন্তু এখনও হয় ত সময় আছে।

ছত্রমঞ্জিল হইতে গোমতীর নিম্নভাগ দিয়া একটি সুড়ঙ্গ ছিল। বহু অর্থ-ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেগমের মুখে সে সুড়ঙ্গের কাহিনী সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল। স্নানাগারের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গের মুখ, এবং গোমতী পার হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ দূরে উহার শেষ। সুড়ঙ্গ-পথে গোপনে পলায়ন করিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।

খোজা ললিতার প্রস্তাবের সমর্থন করিল। সে বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। সুড়ঙ্গের পথ সে বিলক্ষণ অবগত আছে। কেহ জানিবার পূর্ব্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।

বেগমের এ কথাটা আদৌ মনে হয় নাই। কিন্তু তিনি বলিলেন, "চোরের মত পলাইয়া আত্মরক্ষা করিব?"

ললিতা বলিল, "বৃথা মৃত্যুতে লাভ কি? বাঁচিয়া থাকিলে পুনরায় চেষ্টা করিতে পারিবেন।"

"তবে তুমিও আইস।"

"আমি গুরুজীর সহিত দেখা না করিয়া যাইব না। আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই। আমি ত বেগম নহি। শীঘ্র যান, শত্রুপক্ষ কামান ছুড়িতেছে।"

হুড়ুম্ করিয়া শব্দ হইল। ছত্রমঞ্জিলের উপর দিয়া একটা অগ্নিগোলক চলিয়া গেল। অগত্যা বেগম পলায়নের উপক্রম করিলেন। ললিতা বলিল, "এত দিন দাসীপনা করিলাম, কিছু ইনাম মিলিবে না? আপনার ঐ পোষাকটি আমি চাই।"

বেগম অবিলম্বে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার পর বিশ্বস্ত খোজা ও একটি পরিচারিকা সহ সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিলেন। এ সংবাদ আর কেহ জানিল না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

উভয়পক্ষের সেনাগণ সবিস্ময়ে দেখিল, রাজপ্রাসাদের অলিন্দের উপর এক বীরবেশী নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। তাহার মস্তকে মণিমণ্ডিত মুকুট। সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার। হস্তে তরবারি। এই বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি দেখিয়া বেগমের সিপাহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, বেগম স্বয়ং আজ রণ-বেশধারণ করিয়াছেন! তখন সেই রত্নালঙ্কারবিভূষণা নারী চীৎকার করিয়া বলিল, "নবাবের বেগম কখনও আত্মসমর্পন করে না; তাহার পূর্ব্বে বেগম মরিবে। কিন্তু শুধু মরিব কেন, অন্ততঃ দুই দশ জনকে মারিয়া মরিতে হইবে।"

বিশ জন ভক্ত সিপাহীর কণ্ঠে আবার জয়ধ্বনি শ্রুত হইলে; একসঙ্গে বিশটি বন্দুক রাজসৈন্য লক্ষ্য করিয়া গুলিনিক্ষেপ করিল। তখন উভয় পক্ষে রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আসন্ন ঝটিকাও সময় বুঝিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বারিধারা নামিয়া আসিল। অন্ধকার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

ললিতা তখন যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিতেছিল। যুদ্ধের কোলাহল, মেঘের ও কামানের গর্জ্জন, কোনও শব্দই তখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। আজ তাহার হৃদয় অসীম উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছে;—আজ কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! মুক্তির আলোক কোথায়?

সহসা বামপার্শ্বে ললিতা একটা নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল লতার ন্যায় ললিতা ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতার চৈতন্ত তখনও তিরোহিত হয় নাই। অত্যল্প আলোকে সে ব্রহ্মচারীকে চিনিতে পারিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ললিতা, ললিতা, তুমিই সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে! কর্ম্মের উদ্‌যাপন তুমিই করিয়াছ! আজ আর তোমায় কিছুই লুকাইব না। ললিতা! তুমি বিধবা নহ। সতী সধবার উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা তোমার ললাট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তোমার স্বামী হরিদ্বারের গঙ্গাসলিলে প্রাণ হারায় নাই। কোনও মহাত্মার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সংসারের সুখনীড়ে রমণীর সুশীতল অঞ্চলচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া সম্পাদন করা সুকঠিন। তাই এই আত্মগোপন। আমিই শ্রীগোবিন্দ।"

ললিতার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখকমল আবার প্রসন্ন হইল। ক্ষীণকণ্ঠে সে শুধু বলিল, "প্রভু! পায়ের ধূলা দাও।"

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্রবলশব্দে ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল। কামান বন্দুকের শব্দ আর শুনা যায় না।

ব্রহ্মচারী ললিতার সংজ্ঞাশূন্য দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার-রাশির মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সীমাচল।

অপ্‌ল্যাণ্ড ওয়াল্‌টেয়ারে আমরা এক মাস ছিলাম। আজ কাল অনেকেই ওয়াল্‌টেয়ার দেখিয়াছেন। কিন্তু ওয়াল্‌টেয়ারের সন্নিহিত সীমাচল দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। স্বভাবের সৌন্দর্য্যের জন্যই হউক, অথবা পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াই হউক, সীমাচল একটি দেখিবার স্থান। যাঁহারা ওয়াল্‌টেয়ারে আসিয়া সীমাচল দেখেন নাই, তাঁহাদের অত অর্থব্যয়, অত পরিশ্রম, আমার বিবেচনায় ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। সীমাচলের সুন্দর দৃশ্য একবার সন্দর্শন করিলে মনে যে কি অপার আনন্দের উদয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

অপ্‌ল্যাণ্ড ওয়াল্‌টেয়ার হইতে সীমাচলের মন্দির প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে, উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 'ব্যাণ্ডি' ভিন্ন অন্য যানে যাওয়া সুবিধাজনক নহে। 'ব্যাণ্ডি' একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ী; কলিকাতার গাড়ীর ন্যায় এ গাড়ীর পার্শ্বে দরজা থাকে না। পশ্চাৎভাগটা কাটা, সেইখান দিয়া ঢুকিতে হয়। ক্ষীণ কৃশকায় আরোহীর পক্ষে তেমন অসুবিধাজনক না হইতে পারে, কিন্তু স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে যে বিষম কষ্টকর, তাহার প্রমাণ আমি নিজেই যথেষ্ট পাইয়াছি; এবং ঈশ্বরকৃপায় যাঁহারা এ বিষয়ে আমা অপেক্ষাও দু' পা অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পদব্রজ ভিন্ন উপায় নাই!

আমি, ডাক্তার শ্রীযুত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুত ভোলানাথ সান্যাল ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইন্দ্রনাথ মাইতি, আমরা এই কয় জনে যাইব বলিয়া একরূপ

ঠিক হইল। সঙ্গে এক জন চাকর ও সিপাহী যাইবে। খাবার জিনিসের মধ্যে সামান্য লুচী ও কয়েকটি কমলা লেবু মাত্র লওয়া হইল। কিন্তু বলিতে কি, আমি তাহাতে যারপরনাই ক্ষুন্ন হইলাম; তবে ভরসার বিষয় এই, শুনিলাম, সেখানে নৃসিংহ দেবের প্রসাদ প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, এবং তাহা অতি উপাদেয়। যাহা হউক, শুনিয়া কতক আশ্বস্ত হইলাম; কিন্তু মনের সংশয় গেল না।

আমাদের জন্য দুইখানি গাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল। গাড়ী যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আমরা রাত্রি তিনটার সময় প্রস্তুত হইয়া 'ব্যাণ্ডি'তে চড়িয়া রওনা হইলাম। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত রাস্তা পথিকদিগের নিমিত্ত আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া দিয়া দূরপ্রান্তে পর্ব্বতের সহিত মিশিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে একটির পর একটি, তার পর আর একটি, এইরূপ সারি সারি শৈলমালা মস্তক উত্তোলন করিয়া গগন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সুমন্দ মলয়মারুত কুসুমসৌরভ হরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের অশ্বযান উষার সেই আঁধার-আলোকমিশ্রিত রাস্তা দিয়া ঘড় ঘড় শব্দে চলিতে লাগিল। আমরাও প্রকৃতির অস্পষ্ট আবছায়া শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে চলিলাম। ক্রমে উষার অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল; উষা সতী অন্ধকারের নীল শাড়ী অপসৃত করিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উষার সেই কাণ্ড দেখিয়া বনের ফুল, গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, ঝরণার জল, সকলেই আনন্দহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আর বসন্তের প্রিয় সহচর প্রেমিক-প্রবর পিকরাজ, তিনিই বা চুপ করিয়া থাকিবেন কেন?—প্রাণ-মাতান কুহু-স্বরে চারি দিক মাতাইয়া তুলিলেন। এইরূপে প্রভাত হইল; জগৎ আলোকে পূর্ণ হইল!

আমাদের ব্যাণ্ডি কিন্তু সেই একঘেয়ে ঘড় ঘড় শব্দেই চলিতেছে। চলিতে চলিতে আমরা একটা ছোট পল্লীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। ব্যাণ্ডি-ওয়ালাকে সে দেশে ব্যাণ্ডি-ম্যান (Bandi-Man) বলিয়া থাকে। এই লোকটি ইংরেজীতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত; কিন্তু আদৌ লিখিতে কি পড়িতে জানিত না। ব্যাণ্ডি-ম্যান বলিল, "বাবু! এই সীমাচল, এইখানে নামিতে হয়।" সে দেশের পল্লীগ্রাম দেখিবার নিমিত্ত বড়ই ব্যগ্র হইলাম; কিন্তু আর সকলের ইচ্ছা, অগ্রে ঠাকুর-দর্শন, তার পর অন্য কাজ। কাজেই আমার পল্লীদর্শনবাসনা সফল হইল না। দুরন্ত

নানা রকমের লোক আসিতে লাগিল; তন্মধ্যে কাণা খোঁড়ার সংখ্যাই কিছু অধিক। এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "এত বেশী খোঁড়া হইবার কারণ কি?" আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন, "পাহাড় পর্ব্বতের দেশ, পাহাড়ে উঠিতে গিয়া প্রায়ই হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়।" যাহা হউক, তখন এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারা গেল না। তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু ও এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আমরা আর উঠিতে পারিতেছি না, বুঝি আমাদের অদৃষ্টে ঠাকুর-দর্শন হইল না।" এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেম। যাহা হউক, অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার উঠিতে লাগিলাম। এই সময় দেখি, এক জন লোক পেটে করাঘাত করিতেছে, তাহার চারি দিকে দুই চারিটা পাই ছড়ান রহিয়াছে; পরিধানে কেবল নেংটী, মাথার দিকটা গলা পর্য্যন্ত মাটীতে প্রোথিত, কাজেই মাথা দেখিতে পাওয়া যায় না!

এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য আমরা কিছুক্ষণ যাপন করিলাম। এক জন লোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "এই ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ। দেখুন না নিশ্বাস না লইয়া কতক্ষণ আছে; কিছু আহার করে না, যে যা-দেয়, তাহা নিজে না খাইয়া সমস্তই ঠাকুর-সেবায় ব্যয় করে; এরূপ লোক আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না; আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা ইঁহার দর্শন পাইলাম।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাই না শুনিয়া আমাদের মাষ্টার মহাশয় ও এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বাবু ছাতার দ্বারা তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিলেন; সুড়সুড়ী পেয়ে সে এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল ও ছাতা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে সেই লোকটা কিন্তু বড়ই অসন্তুষ্ট হইল, এবং বলিল, "এইরূপ ব্যবহারে আপনাদের যে কত পাপ হইবে, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না?" আমরা কিন্তু তাহার কথা না শুনিয়া আরও তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, একটুখানি বিড়ি ও দুই একটা দেশলাইয়ের কাঠি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে ভণ্ড বলিয়া আরও সন্দেহ হইল। কেহ কেহ বলিলেন যে, এ লোকটি নিশ্চয় বিড়ি খায়; তা না হইলে দেশলাইয়ের কাঠি ও বিড়ি পড়িয়া থাকিবে কেন?

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, আমরা তাহার মুখের মাটি সরাইয়া দেখি,

মুখের মাংসের একটি [illegible] দিয়া রবারের [illegible] হাত লম্বা একটি নল আঁটিয়া চাপ দিয়া পুঁতিয়া [illegible] নলটির অপর মুখ খোলা আছে, তাহাতেই নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে! কেমন সুন্দর পয়সা উপার্জ্জনের পথ! আমাদের ভিতর এই লইয়া আন্দোলন চলিতেছে; এ দিকে লোকটা পলাইবার বিশেষ চেষ্টায় ছিল; কিন্তু আমরা রাস্তার দুই পার্শ্বে সতর্ক থাকায় ও এক দিকে পাহাড় ও অন্য দিকে গভীর গহ্বর ছিল বলিয়া তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না; কাজেই আশায় নিরাশ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। কেহ কেহ তাহার ভণ্ডামীর পুরস্কারস্বরূপ উত্তম-মধ্যম কিছু দিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কয়েকটি পয়সা দিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বেই নানা ভঙ্গীর লোক; কেহ বুকের উপর মস্ত পাথর রাখিয়া মিটি মিটি চাহিতেছে, কেহ বা কাঁটার উপর শুইয়া "রাম নাম সত্য হ্যায়" বলিয়া যোগে মগ্ন রহিয়াছেন। আমরা ইহাদিগকেও কিছু কিছু দিয়া ক্রমে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সোপানের দুই পার্শ্বে পাইপ দিয়া ঝরণার জল অনবরত ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে; সুতরাং নীরস পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও আমাদের জলের অভাব ছিল না। তৃষ্ণায় যখন কাতর হইতাম, অমনই ঝরণার সেই জল পান করিতাম; এইরূপ চলিতে চলিতে অর্দ্ধেক পথে দেখিলাম, একটি বটবৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে; পরিশ্রান্ত পথিকের পথপ্রান্তে বটবৃক্ষ দেখিলে যে কি আনন্দ হয়, এবং উহা যে তাহার পক্ষে কি আরামের স্থান, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই জানেন। আমরা সেই ছায়াশীতল বটবৃক্ষ তলে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আরাম করিবার সেরূপ সুন্দর স্থান আর সীমাচলে নাই। উপরে নানা রকমের পক্ষী নানা রকম সুরলহরী তুলিয়া কলরব করিতেছে; আর তলায় যাত্রিদল কেহ রন্ধন, কেহ ভোজন, কেহ বা শয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত। আমরা মনে করিয়াছিলাম, বিগ্রহদর্শনানন্তর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নীচে আসিয়া জলযোগ করিব; কাজেই সমস্ত জিনিসপত্র নীচে ছিল। ইহাদের রান্না দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হইল; পরক্ষণেই যাহা কিছু ছিল, এক জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে আনিতে বলা হইল। কিন্তু নীচে নামিয়া আবার উপরে উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। এইবার একটি বাজার দেখা গেল। বাজারে

অনেক গরু বাছুর, মুরগী দেখিলাম। এই বাজারে ৫০।৬০ খানা চালা ঘর আছে; বাজারে সেই দেশীয় দ্রব্যাদি অনেক পাওয়া যায়। এইখানে আমরা এক জন 'গাইড' পাইলাম। লোকটি অল্প অল্প ইংরেজী জানে, এবং বলিতেও পারে। যাহা হউক, আমরা তাহার দ্বারাই কাজ চালাইতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের 'বোমবাষ্টিক ওয়ার্ডে'র দ্বারা তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে ও লজ্জায় পড়িতে হইল। সে এই সব দেখিয়া শুনিয়া সরিয়া পড়িবার যোগাড় দেখিতে লাগিল। সরিয়া পড়িলে সব পণ্ড হয় দেখিয়া, আমি মাষ্টার মহাশয়কে নিষেধ করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। তখন সে আমাদিগকে ঠাকুর-দর্শন ও স্নানের জায়গা দেখাইয়া দিবে বলিয়া স্বীকার করিল। তাহার সঙ্গে মোট ২৲ দুই টাকা চুক্তি হইল; যেখান হইতে ঝরণা বাহির হইয়াছে, সেইখানে আমাদিগকে লইয়া গেল; প্রথমেই একটি ছোট চৌবাচ্চা দেখিতে পাইলাম। লোকটি বলিল, "বাবু! ইহার নাম গোদাবরী-ধারা; আপনারা কোন ধারায় স্নান করিবেন, বাছিয়া লউন।" কত প্রকার ধারা আছে, জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "গঙ্গা, ত্রিবেণী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক ধারা আছে। এখন আপনারা যেটি পছন্দ করেন।" আমরা আরও একটু উপরে উঠিলাম। সেখানে একটি ছোট একতলা সরাই আছে; সেটি হিন্দুস্থানী অতিথিদের দ্বারা পরিপূর্ণ; তাহার ভিতর রাজ্যের ময়লা আনিয়া জড় করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসা সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। এই সকল স্থানে "প্রবেশ নিষেধ" লিখিত হয় না। সরাইয়ের নিকট মস্ত বড় একটা চৌবাচ্চা; সেখানেও বাবাজীরা অত্যাচার করিতে বিরত হন নাই। এই চৌবাচ্চার ভিতর দিয়া জলের পাইপ আসিয়াছে; দার্জ্জিলিংয়ে যেমন ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, ঝরণার জল পাইপ দিয়া একবারে নীচে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা এখানে একটু বিশ্রাম করিলাম; এবং এই জলই আমরা নীচে পান করিয়াছি, তাহা লইয়াই আন্দোলন চলিতে লাগিল। পরিশেষে, ফিল্‌টার করা জল পান করিয়াছি, তাহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না,—এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া হইল! এই স্থান হইতে একটি সংলগ্ন পাহাড়ের উপর আমিরদের বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মনোহর

দৃশ্য এখনও ভুলিতে পারি নাই। আতা, পাকা, ডাঁসা, লক্ষ লক্ষ আনারস এক স্থানে দেখিলে যে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন; অন্যকে বুঝাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিকটে গিয়া দেখিবার উপায় ছিল না।

অতিথিদিগের সহিত স্নান করিতে প্রবৃত্তি হইল না বলিয়া কিছু নীচে নামিয়া আসিয়া এক চৌবাচ্চায় স্নান করা স্থির হইল। বিলম্ব না করিয়া তৈল মাখিতে লাগিলাম। স্নানের জন্য নীচে নামিয়াছি, এমন সময় উপর হইতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি রব শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি, একটি বালক এই শ্লোক আওড়াইতেছে; এবং মধ্যে মধ্যে চাল, তিল গায়ে ফেলিয়া দিতেছে; নীরবে স্নান করিয়া উপরে আসিলাম। বালকটি বলিল, "বাবু! আমার মন্ত্র পড়াইবার পারিশ্রমিক দিন।" কিছু না বলিয়া দুই আনা পয়সা দিলাম; সেও নিষ্কৃতি দিল। অন্যান্য বাবুরা নীচে নামিবার পূর্ব্বে মন্ত্র পড়াইতে নিষেধ করিয়া দিলেন; কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। কত রকমের বুলি বলিয়া দুই চারি পয়সা আদায় করিল। তার পর হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের পালাটি কিছু গুরুতর। তিনি বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিয়া নীচে নামিলেন। সে কিন্তু নাছোড়বন্দা। আবার সেই গঙ্গে চ যমুনে চৈব! মাষ্টার মহাশয় উপরে উঠিয়া পুনরায় নিষেধ করিয়া নীচে নামিলেন। কি বিপদ! আবার সেই রব! মাষ্টার মহাশয় এবার তাড়া করিলেন; সেও ভয়ে ছুট দিল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জড় হইয়া গেল। শেষে মাষ্টার মহাশয়কে পরাস্ত হইতে হইল।

এইরূপে স্নানক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সকলে ৺নৃসিংহ দেবের দর্শনে চলিলাম। প্রথমে একটি দেউড়ী; তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি কুঠরী। এইখানে জুতা খুলিয়া রাখিতে হয়। এক জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান আছে; তাহার সহিত ভাব করা গেল। বিশেষতঃ সে যখন শুনিল,—আমারও বাড়ী এলাহাবাদ, তখন আর কোনও কথাই নাই, সে যেন আমারই চাকর হইয়া গেল! সুতরাং জুতা-বিভ্রাটের কোনও ভয় রহিল না। সে আরও বলিল, "বাবু! এই স্থান আমার তত্ত্বাবধানে আছে; এইখানে যে ঘরে আপনারা থাকিতে ইচ্ছা করেন, সেই ঘরে থাকিতে পারেন।" একটি ভাল ঘর তাহার পছন্দ মত খুলিয়া পরিষ্কার রাখিতে বলিয়া আমরা মন্দিরে ঢুকিলাম। দেউড়ী পার হইয়াই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের পর

অপর একটি দেউড়ী আছে। সেইখানে সেই দেশীয় লোক থাকে; একটি করিয়া পয়সা লইয়া ভিতরে যাইতে দেয়; উহা ভিন্ন প্রবেশের অন্য পথ নাই। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। তন্মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই কিছু বেশী। তাহারা কি বলে, কি চায়, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। একটি বড় পাথরের থাম আছে, হলুদে কাপড়ে কিছু চাল, সুপারী ও আরও অন্যান্য সামগ্রী বাঁধিয়া কাপড়খানি থামে জড়াইতেছে। আমাদের গাইড়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "যে স্ত্রীলোকের ছেলে হয় না, সে ইহাতে কাপড় বাঁধিয়া আলিঙ্গন করিয়া গেলে, নিশ্চয়ই তাহার ছেলে হয়। ইহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি। প্রত্যহ এইরূপ অনেক লোক জড় হইয়া থাকে।" কিছুক্ষণ দেখিয়া আমরা আরও ভিতরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। গাইড্ মহাশয় বলিলেন, "ভোগের আর বেশী দেরী নাই, এই বেলা প্রসাদের টিকিট করিয়া লউন।" প্রসাদের টিকিট কিরূপ হয়, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "তিন প্রকার প্রসাদ পাওয়া যায়;—প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, ও তৃতীয় শ্রেণী। এখন আপনারা যে শ্রেণীর লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই লইতে পারেন।" আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রসাদ লইব বলায়, সে আমাদিগকে একটি লোকের নিকট লইয়া গেল। সেখানে ভয়ানক ভিড়। অতি কষ্টে লোক সরাইয়া প্রবেশ করিলাম। আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রসাদ লইব শুনিয়া লোকটি আমাদিগকে একটু যত্ন করিল; এবং কত টাকার প্রসাদ আবশ্যক জিজ্ঞাসা করায়, সহসা আমরা তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না; কারণ, আমরা সকলেই নবাগত, এখানে প্রথম আসিয়াছি, প্রসাদের দর কেহই জানি না। বলিলাম, "আমাদের দলে ১০।১২ জন লোক আছে; এই কয় জনের জন্য কত দিতে হইবে, তাহা আপনি বলিয়া দিন।"—তখন সেই তীর্থের ব্রাহ্মণটি বলিলেন, "এক টাকা দিতে হইবে। এই টিকিট লউন, এবং আপনার নাম এই খাতায় লিখিয়া দিন।" তাহার কথানুযায়ী একটি টাকা দিলাম; এবং নাম লিখিয়া টিকিট গ্রহণ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি দলে মিশিলাম। এই সময়ে শিয়ালদহ ও হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের কথা মনে পড়িল। কারণ, রেলওয়ের জন্যই টিকিট করিতে হয়। প্রসাদের জন্য টিকিট করিতে হয়, তাহা আগে জানিতাম না; আর ভিড়ও তদ্রূপ!

তদনন্তর সেই হিন্দুস্থানী বাররানকে টিকিটখানি দিয়া আমরা দেব-দর্শনার্থ চলিলাম। নিয়মানুসারে আরতি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ক্ষণকালের জন্য কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, শোক, তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভক্তি ও শান্তিরসের আবির্ভাব হইল; এবং সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া দেহ ও মন পবিত্র হইল। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবানের পূর্ণ অবতার বিরাটমূর্ত্তি নৃসিংহ দেব, দেবদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার নিমিত্ত স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখাঘাতে তাহার বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ করিতেছেন। তাঁহার সেই আরোক্ত লোচনদ্বয়, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল, লম্বিত কেশরাশি ও ক্রোধোন্মত্ত ভৈরবমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি এখনও দৈত্যদলনে নিযুক্ত আছেন। আমরা সকলেই ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে ভগবান্ নৃসিংহ দেবকে প্রণাম করিলাম।

এই স্থলে জানিতে পারিলাম, এই দেবমন্দির ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার তত্ত্বাবধানে আছে। তিনি মন্দিরের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। এই সময় ভিজিয়ানা গ্রাম কোর্ড-অব-ওয়ার্ডসের অধীন ছিল।

নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রীতিমত আলো না থাকিলে কিছুই দেখা যায় না। আলোর বন্দোবস্ত ভালই ছিল। দর্শনানন্তর সিংহাসনের চারিপার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা আছে। প্রদক্ষিণের জন্য অগ্রসর হইলে সিংহাসনের উপর দৃষ্টি পড়ে। সমস্ত সিংহাসনখানি তৈলাপায়িকায় সমাচ্ছন্ন;—"ন স্থানং তিলধারণে"! লক্ষ লক্ষ আরশোলা যদি কেহ এক জায়গায় দেখিতে চান, তবে সীমাচলে যান। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অসভ্য আরশোলার মত উড়িয়া গায়ে পড়ে না। সকলে আপন আপন জায়গায় মৌরসী পাট্টা লইয়া বসিয়া আছে; একটিও নড়ে না। ইহাদের স্বভাব দেখিলে ঘৃণা না করিয়া স্বতঃই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়!

তথাকার আর একটি রীতি এই যে, প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে পূজা দিতে হয়, এবং আকাঙ্ক্ষিত বিষয় ভক্তিভাবে জানাইতে হয়। পূজার দ্রব্যাদি সঙ্গে ছিল না। উপযুক্ত মূল্য দেওয়ায় পাণ্ডা নৈবেদ্যাদি পূজার উপকরণ সাজাইয়া আনিল। পূজা সমাপনান্তে আমরা দেবমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যেমন উঠিব, অমনই মাথার উপর ঠক্ করিয়া

শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ তাম্রবিনির্ম্মিত সুবৃহৎ পাদুকা হস্তে আমার সঙ্গীদের মাথায় প্রহার করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একে একে সকলের মাথায় প্রহার করা শেষ হইল,—সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তথাকার অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বিষয় বিশদরূপে জ্ঞাপন করিলেন; এবং আরও বলিলেন যে, যাঁহাদের মস্তক পাদুকা প্রহারে পবিত্র হইবে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রোগ ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন; এবং তাঁহাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমরা তাঁহার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করিলাম।

কার্য্যসমাপনান্তে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে, সবিশেষ দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমরা মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইলাম। মন্দিরে প্রস্তরের নানারূপ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ বড় বড় থাম দেওয়া বারাণ্ডাগুলি আজিও "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই বাক্যের সার্থকতা সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে শেষে ভোগ-শালায় উঠিলাম। এই ঘরটি দ্বিতল। উপর তালায় একটী ছোট ঘর আছে। এইটি নীলাচলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই ঘরে যাত্রিগণ অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতি ঠিকানা প্রাচীরে লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, আমরাও স্ব স্ব নাম ধাম লিখিতে ভুলি নাই।

সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম-গৃহে গমন করিলাম। ঘরটি অতি সুন্দর, নির্জ্জন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল; সুতরাং আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেখানে খাবার ইত্যাদি ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিতেই এক প্রকার উৎকট দুর্গন্ধ পাওয়া গেল। অনুসন্ধানে দেখিলাম, এবার আরশোলা নহে, এবার চামচিকার পালা। এক হাঁটু ময়লা, এক মিনিট সেখানে তিষ্ঠায় কার সাধ্য? তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলাম, এবং সেইখানে প্রসাদ লইয়া খাইতে বসিলাম। রাণীকুণ্ড প্রসাদ দেখিয়া আমরা অবাক্! প্রসাদ এতক্ষণ কলাপাতে ঢাকা ছিল, সুতরাং তাহার কলেবর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পরে যখন কলাপাতা সরাইয়া সকলকে প্রসাদ দিবার উদ্যোগ হইল, তখন

প্রসাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল; হরিষে বিষাদ ঘটিল। কেবল হলুদ ও লঙ্কা মাখান আস্ত চাউল বৃহৎ এক থালায় পরিপূর্ণ। আর এক থালায় শুধু লঙ্কা মাখান চাউল। এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গাইড্ মহাশয় বিশদরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এখানকার চিরপ্রচলিত রীতি এইরূপ। যত চাউল, তার অর্দ্ধেক হলুদ ও লঙ্কা, এবং দ্বিগুণ জল; সুতরাং প্রসাদের রং ঢং কিরূপ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া হাসিতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, "এ ঠাকুরের স্থান, হাসি তামাসার জায়গা নহে। প্রসাদ যে যা পার, তাই খাও।" কাজেই সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু একবার মুখে দিলে আর নীচের দিকে চাহিতে ইচ্ছা হয় না। লঙ্কার এরূপ আধিক্য দেখিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের কথা মনে পড়িল। শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা কিছু অধিক পরিমাণে লঙ্কা খাইয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের সকলের লক্ষ্য তখন ডাক্তার বাবুর উপর পড়িল। দেখিলাম, আমাদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন! আমরা অন্য থালার প্রসাদের আস্বাদ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। সেটি না কি অম্বল। অনেকটা মুখরোচক হইলেও হইতে পারে বিবেচনায়, মুখে দিয়া দেখি, ইনিও বড় কম নন; বরং কিছু বেশী। ইহাতেও সেই পরিমাণ লঙ্কা দিতে ভুলে নাই। আমাদের মধ্যে অনেকেরই প্রসাদ খাইয়া ঠোঁট ফুলিয়া গিয়াছিল। এই সময় আমার দাশুরায়ের সেই ছড়াটি মনে পড়িল। যাহা হউক, দেবতার প্রসাদ মাথায় থাক; কিন্তু বলিতে কি, প্রসাদের কথা মনে হইলে এখনও গা শিহরিয়া উঠে, মনে আতঙ্ক হয়। তার পর সেই সামান্য লুচি ও কমলা লেবু দ্বারা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। এইরূপে প্রসাদ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

আহারান্তে আমরা সকলের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যখন আমরা নীচে নামিতেছি, সেই সময় আমাদের সঙ্গে সেই দেশীয় একটি স্ত্রীলোকও নামিতেছিলেন। এমন বলিষ্ঠ স্ত্রীলোক আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখা। সে দেশের সমস্ত মেয়ে পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ইনি বেশ গৌরী। বয়স আন্দাজ ১৬।১৭ হইবে। আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহার কোনও রূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় নাই। শুনিলাম তাঁহার ছেলে হয় নাই, সেই জন্য পূজা দিতে

নিজের পা খুলিয়া লইয়া ছুটিয়া নীচে আসিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যাইবার সময় যে সন্ন্যাসী বাবাজীকে কাঁটার উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনিও বেগতিক দেখিয়া দৌড় দিলেন। বলিতে কি, রাস্তায় একটা গোলমাল পড়িয়া গেল যে, কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু আসিয়া সকলের পা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সকলেই আমাদিগকে সুমধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল।

পুনঃ পুনঃ খণ্ড-রহস্তের আন্দোলন করিতে করিতে [illegible] পাহাড়ের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় তিজিয়ানা গ্রামের মহারাজের একটি মনোহর বাগানবাটী আছে। উদ্যানটি অতি সুন্দর। আমাদিগকে দেখিবামাত্র উদ্যান-রক্ষক সসম্মানে উদ্যানমধ্যস্থ বিশ্রাম-গৃহে লইয়া গেল। এই সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া হঠাৎ আমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ডাক্তার বাবুর যত্নে ও সুশ্রূষায় আমি প্রায় দেড় ঘন্টা পরে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম। তার পর কিয়ৎক্ষণ বাগানের এ দিক ও দিক বেড়াইয়া 'ব্যাণ্ডি'তে আরোহণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাজাবাহাদুর ও রাণীজীরা সকলেই সাগ্রহে সীমাচল-বৃত্তান্ত শুনিতে বসিলেন। আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া তথায় যাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইলেন; এবং শীঘ্রই তাহার আয়োজন করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, "৺নৃসিংহ দেবের দর্শন পাইতে হইলে, ১০২১ হাজার একুশ সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়, তখন সকলে সেই স্থান হইতে তাঁহার পুণ্যময় নাম উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণিপাত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন!

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে।

[বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন।

আজ শুক্রবার, বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে; চৈত্র-শুক্লাপঞ্চমী তিথি। ৯ই এপ্রেল; ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের প্রতি) বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল না কি হ'বে? নরেনকে এর একটা কর্ম্ম যোগাড় ক'রে—

নরেন্দ্র। আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই।

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন।

কালী বলিলেন, "এক দিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্র গান গাহিয়াছিলেন, মৃদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী তাঁহাকে পাখা করিতেছেন।

লাটু আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মণির প্রতি) একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চটী জুতা আনবে।

মণি। যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (লাটুর প্রতি) চাদর ॥৶০ ও জুতা, সর্ব্ব শুদ্ধ কত দাম?

লাটু। এক টাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শশী ও রাখাল ও আরও দু' একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলায়ে দিতে বলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে [illegible]লেন।

[বুদ্ধদেব কি নাস্তিক !]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) ও [illegible] ([illegible] বুদ্ধগয়ায়) গিছলো।

মাষ্টার। (নরেন্দ্রের প্রতি) বুদ্ধদেবের কি মত ?

নরেন্দ্র। তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা' মুখে বল্‌তে পারেন না ব'লে. তাই ব'লে, সকলে বলে নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ইঙ্গিত করিয়া) নাস্তিক কেন! নাস্তিক নয়; মুখে বল্‌তে পারে নাই।

"বুদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া ;—বোধ-স্বরূপ হওয়া।"

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। এঁদের তিন শ্রেণী আছে ;—বুদ্ধ, অর্হৎ, আর বোধিসত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ তাঁরই খেলা ;—নূতন একটা লীলা।

"নাস্তিক কেন হ'তে যাবে ! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

নরেন্দ্র। (মাষ্টারের প্রতি) সে অবস্থায় Contradictions Meet. যে Hydrogen আর Oxygen এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই Hydrogen আর Oxygen দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নি-শিখা) উৎপন্ন হয়।

"যে অবস্থায় কর্ম্ম আর কর্ম্মত্যাগ দুইই সম্ভবে ;—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম।

"যা'রা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তা'রা বলেছে, সব 'অস্তি' ; আবার মায়াবাদীরা বল্‌ছে,—'নাস্তি' ; বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তি'র পরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[নরেন্দ্র ও বুদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তার (বুদ্ধদেবের) কি মত ?

নরেন্দ্র। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ [illegible]। তবে দয়া নিয়েছিলেন।

"একটা বাজ পক্ষী শীকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল; বুদ্ধ শীকারটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র [illegible] সহিত বুদ্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র। কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ ক'র্‌লে! যা'দের কিছু নাই—কোনও ঐশ্বর্য্য নাই, তা'রা আর কি ত্যাগ কর্‌বে।

"যখন বুদ্ধ হ'য়ে নির্ব্বাণ লাভ ক'রে বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে, ছেলেকে, রাজ বংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলম্বন কর্‌তে বল্‌লেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাস দেবের আচরণ দেখুন;—শুকদেবকে বারণ করে', বলে, পুত্র! সংসারে থেকে ধর্ম্ম কর।"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখন কোনও কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র। শক্তি ভক্তি কিছুই (বুদ্ধ) মান্‌তেন না।—কেবল নির্ব্বাণ!

"কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা ক'র্‌তে ব'স্‌লেন, আর বল্‌লেন,—

"ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্"

"যদি নির্ব্বাণ লাভ না করি, তা' হ'লে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক্,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা"

"শরীরই ত বদ্‌মাইস্!—ওকে জব্দ না কর্‌লে কি কিছু!—"

শশী। তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্বগুণ হয়!—মাংস খাওয়া উচিত, একথা ত বল।

নরেন্দ্র। যেমন মাংস খাই,—তেমনই (সকল ত্যাগ ক'রে) শুধু ভাতও খেতে পারি,—নুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বুদ্ধদেবের) কি মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র। আজ্ঞা না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় কর্‌লে যা' হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। চক্ষু?

নরেন্দ্র। (চক্ষু) সমাধিস্থ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই সেই']

ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি, ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা,—এখানে সব আছে; না?—মাগাদ্ মুসুর ডা'ল, ছোলার ডা'ল, তেঁতুল পর্য্যন্ত।

নরেন্দ্র। আপনি ও সব অবস্থা ভোগ করে' নীচে র'য়েছেন!—

মণি। (স্বগতঃ) সব অবস্থা ভোগ করে' ভক্তের অবস্থায় র'য়েছেন!—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে যেন নীচে টেনে রেখেছে!

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন; এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই পাখা যেমন দেখ্‌চি, সাম্‌নে,—প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি।

"আর দেখ্‌লাম—"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, আর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "কি বল্লুম, বল দেখি?"

নরেন্দ্র। বুঝেছি কি না জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বল দেখি?

নরেন্দ্র। ভাল শুনি নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিলেন,—"দেখ্‌লাম তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে তিনি আছেন—এক ব্যক্তি!"

নরেন্দ্র। হাঁ, হাঁ; সোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তের আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র। (মাষ্টারের প্রতি) মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন,—দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন।

"যেমন মুটেগিরি; আমাদের মুটেগিরি On Compulsion (দায়ে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ্‌ ক'রে।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও [illegible]]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) ছাদ্ ত দেখা যায়!—কিন্তু ছাদে উঠা বড় শক্ত।

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে, যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ী ফেলে দিয়ে আর একজনকে তুলে নিতে পারে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি।]

"হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) ব'ল্লে,—'কি আশ্চর্য্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখ্‌লাম।'—

"কখন কপিবৎ;—মহাবায়ু দেহ-বৃক্ষে বানরের ন্যায় যেন এ ডাল থেকে ও ডালে একবারে লাফ্ দিয়ে উঠে, আর সমাধি হয়।

"কখন মীনবৎ;—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ ক'রে যায়, আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চল্‌তে থাকে, আর সমাধি হয়।

"কখন বা পক্ষীবৎ;—দেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে, কখনও ও ডালে।

"কখন পিপীলিকাবৎ;—মহাবায়ু পিঁপ্‌ড়ের মত একটু একটু ক'রে ভিতরে উঠ্‌তে থাকে; তার পর সহস্রারে বায়ু উঠ্‌লে সমাধি হয়।

"কখন বা তির্য্যক্‌বৎ;—অর্থাৎ মহাবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় এঁকাব্যাঁকা; তা'র পর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।"

রাখাল। (ভক্তদের প্রতি) থাক্ আর কথায়;—অনেক কথা হ'য়ে গেল;—অসুখ কর্‌বে।*

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, যন্ত্রস্থ। Gospel of Rama Krishna in English, to be shortly out.

[illegible] কবিতা।

গগন থেকে নেমে আসে যখন শ্যামল বসন্ত ভুবনে,—
ফুল আসে [illegible]রাগে তাহার পানে নয়ন দু'টি তুলে ;
ঊষার রবির কিরণগুলি হরণ করে' বরন করে ফুলে ;
ভুবন করে মুঞ্জরিত বিরঞ্জিত নবীন জাগরণে।
মানুষ তারে চয়ন করে, যত্নভরে নারী পরে চুলে ;
[illegible] তার জানে না কেউ, বোঝে না তার বর্ণময়ী ভাষা ;
দেখে না কেউ তাহার জন্ম-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি খুলে,
—বিজড়িত মর্ম্মমাঝে কত প্রীতি—সুখ দুঃখ আশা ;
কি ব্যথায় বা কি আনন্দে ছন্দোবন্ধে শিউরে ওঠে কবি—
জানে না কেউ ;—দেখে শুধু, দেখে যখন তাহার আঁকা ছবি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

:o:

বিলাতের রঙ্গমঞ্চ।

অভিনয়ে সাফল্য।

"স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন" নামক সাময়িকপত্রে বিলাতের এক জন অভিনেত্রী অভিনয়সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে কেন তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, লেখিকা এই প্রবন্ধে তাহার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধটির সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

প্রবন্ধ-রচয়িত্রী পরলোকগত ক্লেমেণ্ট স্কটের ন্যায় স্পষ্ট বলেন নাই যে, 'নারীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেহ অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, অথবা রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনেত্রী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে সকল রমণী অভিনয়ে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই হয় কোনও অভিনেতা বা রঙ্গমঞ্চ-অধ্যক্ষের পত্নী অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অলোকসামান্য রূপের প্রভাবে, অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে, রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। কিংবা হয় ত তাঁহাদের সময়ে বর্ত্তমান সভ্যযুগের দূষিত প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। তাহা না হইলে তাঁহারা কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না। লেখিকা বলেন যে, একটু অনুসন্ধান করিলেই সাধারণে তাঁহার উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি বলেন,—Musical Comedy!

অর্থাৎ হাস্য-রস-বহুল গীতি-অভিনয়ে অভিনেত্রীর সাফল্যলাভ করিবার একমাত্র পন্থা উরু-। Pantomime অর্থাৎ পকরং (নক্সা) অভিনয়ে অভিনেত্রীর অবগুণ্ঠনের পথ সুপ্রশস্ত ও অধঃপতন দ্রুততর ও অপরিহার্য্য।

লেখিকা বলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যদি রূপসী হইতাম ও জন্মাবধি নীতিধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে অভিনয়ে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতাম; অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারিণী হইতাম। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আমার নাই; নীতি-জ্ঞান বিসর্জ্জন করিতেও কখনও শিক্ষা করি নাই; সুতরাং যশঃরূপ মহাবৃক্ষের তলদেশে পঁহুছিবার জন্য নত ক্লেশ সহ্য করিতেছি। বৃক্ষের তলদেশে কণ্টক-লতার অরণ্য। সেই লতার আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছি। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ধরিয়া আমি অবোধের ন্যায়, মূর্খের ন্যায় কল্পনা করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মপথে থাকিয়া সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কোনও রমণী নাটক অভিনয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ। কিন্তু এখন আমি ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন দূরের কথা, নারীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী সামান্য অর্থ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দ্বারা সংগৃহীত হওয়া কত অসম্ভব, নিশার স্বপন সম অলীক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধ্বী রমণীকে বাধ্য হইয়া পাপ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে হয়। বাকচাতুর্য্য-জালের অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন হইলেও এই সকল ঘৃণিত প্রস্তাবের মর্ম্ম যে কোনও নারী অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। রঙ্গমঞ্চের অবস্থা এত শোচনীয়, এত ভয়ঙ্কর!

সম্প্রতি একটি সান্ধ্য-গীতি-অভিনয়ে প্রবন্ধ-রচয়িত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একটি বর্ষীয়সী প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের সহিত অনেক দিন তাঁহার সংশ্রব ছিল না। নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় উপলক্ষে তিনি আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধা দেখিলেন, যুবতীটি অভিনিবেশসহকারে অভিনয় দর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়া অনুমান করিলেন যে, এই যুবতী সম্ভবতঃ এক জন অভিনেত্রী। উভয়ের পরিচয় হইলে বৃদ্ধা তাহার অনুমানের কথা লেখিকাকে বলিলেন। প্রবন্ধ-রচয়িত্রী বলিলেন যে, সত্যই তিনি অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু এখন আর অভিনয় করেন না। বৃদ্ধা বলিলেন, 'বুঝিয়াছি, আপনি কেন রঙ্গালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। অভিনেত্রীর জীবন বড় কষ্টকর। আমাদের যৌবনাবস্থায় রঙ্গালয়ের উপর দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের আদৌ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল না। তখনকার অভিনেত্রীগণ পরিশ্রমী ও সাধ্বী ছিলেন। এখন দেশের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতগণের দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, সেরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব এখন আর নাই। কিন্তু এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সেকালের লোকের মত সাধু ও সুশীল নহেন।'

লেখিকা যৌবনের প্রথম অবস্থায় রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলে পিতা মাতার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না, এবং পিতার নিকট হইতে কপর্দ্দকমাত্র সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, জানিয়াও তিনি নিরস্ত হন নাই। দৃঢ় সংকল্প ভঙ্গ করা না করিয়া নবীনা পাগলদন্তের গৃহত্যাগ করিলেন।

একটি সুর বাদ্য ও কতিপয় মুদ্রামাত্র সম্বল রহিল। প্রথমতঃ চাকরীর জন্য তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। অল্প প্রয়াসেই কোনও রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছি[illegible]। কিন্তু সে চাকরীর নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, তিনি রঙ্গালয়ের এজেন্ট বা প্রতিনি[illegible]র্গের বাড়ী বাড়ী চাকরীর উমেদারীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সকল এজেন্ট যুবতীর সহিত কিছু কিছু ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তাহাদের এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত; কিন্তু তিনি যাহার কাছে গমন করেন, সেই যখন ঐরূপ ঘনিষ্ঠতার সূচনা করিতে লাগিল, তখন উহা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিল। লেখিকা বুঝিলেন, এই ঘনিষ্ঠতা কোন বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা। নানা স্থানে গমনাগমনের পর, শেষে এক জন এজেন্টের সহিত অধিকার বিশেষ আলাপ হইল। অবস্থা বুঝিয়া তিনি এই এজেন্টের সহিত চাল চালিলেন। ভাবিলেন, এইবার একটা সুবিধামত কাজের যোগাড় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু এজেন্ট মহাশয় অবশেষে বিনয় ও ভদ্রতার সহিত বলিলেন, 'কয়েক দিনের জন্য আপনি আমার সহিত ব্রাইটনে চলুন। এক সপ্তাহ পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে একটা বিশেষ লাভজনক কাজ করিয়া দিব।'

প্রবন্ধ-রচয়িত্রী ইহার পর কিছু কাল অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। প্রতি দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু কোথাও তিনি সুবিধামত চাকরীর যোগাড় করিতে পারিলেন না। বহু চেষ্টার পর অবশেষে তিনি কতিপয় বিশিষ্ট 'রঙ্গালয়-পরিচালকে'র সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন।

লেখিকা লিখিতেছেন 'আমার গান শুনিয়া এক জন ম্যানেজার বলিলেন, 'হাঁ চলিতে পারে; কিন্তু কয় জন পুরুষ আপনার তাঁবে আছে? কয়টি 'ষ্টলে'র ভার আপনি লইতে পারেন?'

'আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। তিনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ম্যানেজার অধিক ভূমিকা না করিয়া স্পষ্ট বলিলেন, 'আমি স্পষ্ট কথা ভালবাসি। লুকোচুরীর কোনও প্রয়োজন নাই। গানের দ্বারা আমি অভিনয় বেশ জমাইতে পারি, সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনারও সেটা জানিয়া রাখা উচিত। কিন্তু আপনি যদি আমার রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, তাহা হইলে লোকের মনের মত কাজ করা আপনার দরকার হইবে। বুঝেছেন? তাহা না হইলে আপনাকে লইয়া আমার কোনও উপকার নাই।'

ব্যর্থমনোরথ হইয়া অতঃপর যুবতী আর এক জন প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানারূপ আলোচনার পর অধ্যক্ষ অত্যন্ত নীরস ও উপেক্ষার ভাবে বলিলেন, 'এ রকম করিলে আপনার কোথাও চাকরী হইবে না, এবং হইলেও উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। আপনার শরীরের গঠন সুন্দর। চমৎকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অনেক দর্শক আপনার নি[illegible], যৌবনে আত্মহারা হইবে। কিন্তু তাহাদি[illegible] অভিলাষ সফল না করিতে পারিলে [illegible]চলিবে [illegible]। আমার কথা বুঝিয়াছেন?'

হাস্যরসাত্মক গীতি-অভিনয় (Musical Comedy) সংক্রান্ত রঙ্গালয়ের [illegible] পরি[illegible] ঘুরিয়া লেখিকা পরে মূক (Pantomime) অভিনয়ে যোগদান করিলেন। অভিনেত্রীগণ

বেশভোজ, নৃত্যসভা ও অন্যান্য নানা প্রকারের আমোদ প্রমোদে সর্বদা নিমন্ত্রিত হইত। এক সপ্তাহ অভিনয়ের পর লেখিকা ডাকযোগে সংবাদ পাইলেন যে, এক পক্ষ পরে তাঁহাকে কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে। অধ্যক্ষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট কোনও উত্তর না দিয়া সরিয়া পড়িলেন। কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া লেখিকা এক অন্য অভিনেত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, 'পকরং অভিনয়ের পক্ষে আপনি আদৌ উপযুক্ত নহেন। ইহাতে অত সতী সাধ্বী থাকিলে চলে না। আপনি যদি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, অন্য কোনও অভিনেত্রী আপনার ন্যায় নহে। আমার বড় আপশোষ হইতেছে,—আপনার ন্যায় যদি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হইত।'

লেখিকা প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন—'গ্রেটবৃটেনের রঙ্গালয়ে নাট্যকলা ক্রমশই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই উৎকৃষ্ট নাট্যকলায় কোন অঙ্গের ব্যবচ্ছেদ একান্ত আবশ্যক, তাহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান ইংলণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। পার্লিয়েমেণ্টের বিধান অনুসারে যে সকল রমণীর ব্যবসায় অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারাই এখন রঙ্গালয় পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। রঙ্গালয়ে যোগদান তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য; রঙ্গালয়ের সংশ্রবে তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি ও সুবিধা হয়। রঙ্গালয়ের বিবেকবিহীন অধ্যক্ষগণও তাহাদের সাহায্যে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ।'

'স্ক্র্যাপ-বুক' নামক একখানি আমেরিকান পত্রে এল, বেনসন 'এক শত বৎসর বাঁচিবার উপায়' নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুত বেনসন স্যর জেমস্ ক্রিকটন ব্রাউনের মত তুলিয়া দিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রত্যেক পুরুষ এক শত বৎসর ও প্রত্যেক নারী এক শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ। প্রত্যেক বালককে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত অনিয়ম ও অত্যাচার হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যদি সাধারণ লোকে তাহাদের পরমায়ু বাড়াইতে চাহে, তাহা হইলে ঔষধের গভীর বাহিরে যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে, তাহাদিগকে তাহা পালন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থাবলীর মধ্যে নিয়মিত কার্য্য ও নিয়মমত বিশ্রামই উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘজীবী ব্যক্তি অপেক্ষা এই নিয়মের সংখ্যা অনেক অধিক। আমার সেই চিরপুরাতন নিয়ম (No breakfast plan) প্রাতরাশ-ত্যাগ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আর একটি নিয়ম এই যে, পীড়িত হইলে সম্পূর্ণ উপবাস অপরিহার্য্য। ইহার কারণ এই যে, পীড়া হইলেই পাকযন্ত্র সকল পরিপাক কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় পাকযন্ত্রের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, এই মতের যাঁহারা প্রধান

পোষক, তাঁহারা সকলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; অর্থাৎ শতবর্ষব্যাপী জীবনের গৌরব উপভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এক জন আমেরিকান চিকিৎসক এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ঔষধসেবন নিষিদ্ধ; (যদিও ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প!) এবং অসুস্থ হইলে একেবারেই অনাহারে কক্ষের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া শয়ন ও যথেষ্টপরিমাণে অপক উদ্ভিজ্জভোজন কর্ত্তব্য! ভিনিস্‌বাসী লুগি করনার এক শত তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি জীবনের চল্লিশ বৎসর অমিত ভোজনে, মদ্যপানে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; এবং যত প্রকার ব্যাধি সম্ভব, সে সকল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ ঠেকিয়া শিখিয়া তিনি পরিশেষে মিতাচারী হইয়া উঠিলেন। ইহার পর তেতাল্লিশ বৎসর কাটিয়া গেলে তিনি মিতাচারিতার গুণগান করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি প্রথমে অতি অল্পপরিমাণে রোগীর পথ্য আহার করিতেন। ফলে এক বৎসরের মধ্যে তিনি অর্দ্ধমৃত অবস্থা হইতে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। খাদ্য সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে তিনি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, কি কি খাদ্য তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত। তদনুসারে নির্ব্বাচিত খাদ্যই তিনি আহার করিতেন।

তাঁহার অনুসৃত নিয়মাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—তিনি একটু ক্ষুধা রাখিয়া খাইতেন অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপে যাহাতে স্বাস্থ্যের হানি না হয়, সে বিষয়ে সাবধানে থাকিতেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন না; বায়ুসঞ্চারহীন কক্ষে অধিকক্ষণ থাকিতেন না; পরিমিত নিদ্রা ও বিশ্রামে অবহেলা করিতেন না। তাঁহার মতে, উল্লিখিত নিয়মগুলি পালনীয়। সত্তর বৎসর বয়সে কোনও ভয়ানক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। চিকিৎসক রক্তমোক্ষণ করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। ফলে তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। করনার বলিয়াছেন, এই বিশ্ব যে এত রমণীয়, তাহা জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৫৬৬ খ্রীঃ তিনি লোকান্তরিত হন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও দীর্ঘজীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তথাপি আহার, ব্যায়াম ও মিতাচারই যে দীর্ঘজীবনলাভের প্রশস্ত পথ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিশুপাঠ্য রচনা।

শ্রীমতী মোলস্‌ওয়ার্থ 'দি কুকু ক্লক' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গল্প-পুস্তকের বিখ্যাত রচয়িত্রী। তাঁহার রচিত পুস্তক শুধু বালক বালিকার নয়, বয়স্কগণেরও প্রিয়বস্তু। বেভা ইসিডোর হ্যারিস ও শ্রীমতী মোলস্‌ওয়ার্থের শিশুপাঠ্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা 'গ্রেট থট্‌স্' নামক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

হ্যারিস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালকবালিকাদের জন্য পুস্তক লিখিয়া অসাধারণ সফলতা লাভ করিবার গূঢ় কারণ কি?' এই প্রশ্নের মোলস্‌ওয়ার্থ বলিলেন যে, 'আমার মনে হয়, বালকবালিকাদের সহিত সহানুভূতি থাকিলে সাফল্যলাভ সম্ভব;

মোলস্‌ওয়ার্থ বলিলেন,—'আমি অনেক সময় বালক বালিকাদিগের গল্পে কাটাইয়াছি, এবং গল্পগুলিও প্রথমে আমার পুত্রকন্যাগণের জন্যই রচনা করিয়াছিলাম। সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্বে আমার মনে আদৌ উদিত হয় নাই।'

ফ্যারিস।—আমার বোধ হয়, পুত্রকন্যাগণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আপনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনার পুস্তকের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে।'

মোলস্‌ওয়ার্থ।—এই অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আমার নিজের শৈশবের জ্বলন্ত স্মৃতির উপরই অধিক নির্ভর করি। আমার মনে হয়, যদি কেহ বালকবালিকা সম্বন্ধে যথাযথভাবে লিখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় শৈশব-স্মৃতির সাহায্য লইতে হইবে। কারণ, বালকেরা যে কি চিন্তায় বিভোর থাকে, তাহা আমরা শিশুদের নিকট প্রায়ই অবগত হইতে পারি না। অনেকে আবার শৈশব-স্মৃতি বিস্মৃত হন; সুতরাং শিশুদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া লিখিতে পারেন না।'

তিনি আরও বলিলেন, 'আমি আপনাকে শিশুদিগের অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার কথা অনেক বলিয়া যাইতে পারি। উহাদিগকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, লেখককে এইরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব-সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু শিশুরা যে কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে, তাহা জানা বড় সহজ নহে। সত্য কথা বলিতে কি, উহারা নিজের ভাব যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি তেমন ভাল স্মৃতি শক্তি থাকে, তবেই উহারা শৈশবের ভাবাদি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে।'

শ্রীমতী মোলস্‌ওয়ার্থ অনুমান করেন, এ যুগের বালক বালিকারা উপকথা ভালবাসে না। তাঁহাদের সময়ের বালক-বালিকা অপেক্ষা ইহারা আরও কবিত্বশূন্য।

'আমাদের শৈশবকালে শিশুরা যেরূপ কল্পনা-প্রিয় ছিল, এখনকার ছেলেরা সেরূপ নহে। ইহার কারণ, আমাদের সময়ে এত শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক ছিল না, এবং এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় বালকবালিকাদিগের মনেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ফ্যারিস জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ পরিবর্ত্তন ভাল না মন্দ?' মোলস্‌ওয়ার্থ বলিলেন,—'বলিতে কি, মন্দের দিকে। যখন উপকথা-গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল, তখন বালকবালিকাদিগকে একই কথা বারংবার পড়িতে হইত। কিন্তু পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইয়াছে, এবং সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।—একই গল্প আর বারবার পড়িতে হয় না;—একখানা বই পড়িতে না পড়িতে, আর একখানা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের বাল্যকালে আমরা দুই চারিখানি গল্প এতবার পাঠ করিতাম যে, সেই সমস্ত গল্পের চরিত্রাবলী মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত; এই জন্যই সেকালের ছেলেরা এখনকার ছেলেদের মত সমালোচনাপ্রিয় ছিল না।

মোলস্‌ওয়ার্থের কথাবার্ত্তা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার মতে, শিশুদের জন্য রচনা ও শিশুদের সম্বন্ধে রচনা, এই উভয়ে পার্থক্য আছে। ছেলেদের সম্বন্ধে রচিত পুস্তকমাত্রই যে শিশুপাঠ্য, এমন নহে। এই যেমন 'দি জুভেনাইল'। তাঁহার মতে, নীতিশিক্ষাদান শিশুপাঠ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তাহা নীতি-মূলক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, নীতি যেন তাহাদের ভিত্তিস্বরূপ হয়।

'... জেমার চাইল্ড ক্যাবিনী', ল্যাম্বের শেক্সপীয়ার-গল্পাবলী, মিস্ এজোয়ার্থের রচনা, গ্রিম্ ও হান্স্ এণ্ডার্সনের উপকথা প্রভৃতি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ভূতের গল্পের একান্ত বিরোধী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—জ্যৈষ্ঠ। 'মল-মাস ও পাঁজী' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ; বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপযোগী। আমরা অনধিকারী, এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সাধারণের অনধিগম্য। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের অনার্য্য নৃপতি কনিষ্ক' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখক অনুসন্ধিৎসু, তথ্য-সংগ্রহে তৎপর, বিষয়-বিন্যাসে সুনিপুণ। ভাষা আরও একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হয়। ললিত বাবু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'শিল্প-বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলী' কাজের কথায় পূর্ণ,—সময়োপযোগী। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্যে' পাঠকদিগকে আনন্দের সহিত, শিক্ষা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বৌদ্ধজাতক হইতে প্রাচীন যুগের বিবিধ আচার ব্যবহার ও অদ্ভুত প্রথার পরিচায়ক নানাবিধ কাহিনীর সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বর্দ্ধিত করিতেছেন। এবার 'মাথায় ঘোল' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাথায় ঘোল ঢালার প্রাচীন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।—'কোনও অপকর্ম্ম করিলে মাথায় ঘোল ঢালার কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি গল্প আছে।'—শাস্ত্রী মহাশয় সেই গল্পটির অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামধনের কীর্ত্তি' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি মন্দ নহে। 'স্বদেশিত্ব ও বিদেশিবর্জ্জনের মাত্রা ও প্রকারভেদ' প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'কাপড়, চিনি, কিংবা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জ্জন-নীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল সস্তা জিনিস উৎপাদনও করিতে হইবে।' আমরাও তাহা অস্বীকার করিব না, এবং এ পর্য্যন্ত কোনও 'স্বদেশী' ভাবের প্রচারক এ বিষয়ে অন্য মত প্রকাশ করেন নাই। অধিকন্তু আমরা বলি, কেবল স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার ও উৎপাদন 'স্বদেশী' নহে। মনে 'স্বদেশী' ভাবের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশী তন্ত্রের মূলমন্ত্র। তালপাতার 'স্বদেশী' হ্যাট 'স্বদেশী'র বিড়ম্বনা,—বিষম বিদ্রূপ;—ইংরেজ-পালিত কুকুরের পক্ষে এরূপ স্বদেশী শোভন হইতে পারে, কিন্তু সাধকের পক্ষে তাহা মর্ম্মান্তিক,—জাতীয় ভাবের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক। যে মনে বিদেশী, এবং ব্যবহারে স্বদেশী,—সে দেশের শত্রু,—ভাবের শত্রু; স্বদেশ মাতৃমন্ত্র মহামন্ত্রের হিরণ্যকশিপু। 'ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা', 'স্বদেশীর চিপ' হিন্দুর জাতিনাশা; ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা নুন-চিনির 'স্বদেশী' মুক্তির পথে বিষম কণ্টক। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বক্তব্য,—ভাষার 'স্বদেশী' হইলেও ক্ষতি নাই। 'স্বদেশী' বাঙ্গালা আর একটু সহজ, স্বচ্ছ, রীতি-শুদ্ধ ও মনোরম হউক। যে

বাঙ্গলা চুণো-গলীর বিকট গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া মাতৃ-ভাষায় অকালে বিদেশী রচনা-ভঙ্গীর প্রাধান্ত স্বীকার করে, তাহাও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। মাতৃ মন্দিরে পলাণ্ডু-লশুনের স্থান নাই,—সাহিত্যেও তাহা অশোভন। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'স্বদেশী ও বহিষ্কার' নামক বিস্তৃত প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। আমরা সকলকে পড়িতে বলি। শ্রীযুত আব্দুল হামিদ খান ইউসফজী 'হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি' প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমানকে ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া মিলন-মন্দিরে মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। লেখকের আশা পূর্ণ হউক।

বঙ্গদর্শন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত 'বারাণসী-অভিমুখে' রমণীয়, উপভোগযোগ্য;—ভ্রমণ-কাহিনী রচনার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী 'পাটের চাষ ও দুর্ভিক্ষ' প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—পাটের চাষে দেশের ক্ষতি হইতে পারে না। তাঁহার পরামর্শ —'পাট-চাষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত সার-প্রয়োগে ইহার ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, এবং যাহাতে পাটের বহির্বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার বিহিত চেষ্টা করিলে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।' বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য্য ও চিন্তনীয়। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সন্দর্ভ। 'দেশের যথার্থ ব্যথী' 'পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি'র যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশ-ভক্তের অবশ্যপাঠ্য। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেন 'একথাল মিষ্টান্নে'র জন্য যে এক রাশি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা মন্দ হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় যে মন্দাগ্নি, 'মিষ্টি'র এত বাহুল্য নিরাপদ নয়। মতিচূরের পানে মণিমুক্তার অভাব নাই বটে,—কিন্তু মিষ্টান্নের থালায় এত রত্ন ছড়াইতে নাই। 'খেয়া-ডিঙ্গি'র কর্ণধার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী 'ভাদ্রের চিত্র' অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ঘাটের ডিঙা 'পাটের খেতের ভিতর দিয়ে' বাহিবার আবশ্যক কি, তাহা যিনি 'পিরা ওঠা কাটা হাতে হালের গোড়া' ধরেন, তিনিই বলিতে পারেন, এবং সম্ভবতঃ কবিও স্বয়ং জ্ঞাত আছেন। আমরা অন্তর্যামী নহি, সুতরাং বলিতে পারিলাম না। আর 'কাটা হাতে' যে ব্যক্তি হালের 'গোড়া' ধরিতে পারে, সে কি 'আগা' ধরিতে অক্ষম? প্রকৃত ও কবিত্বের খেচরান্ন নূতন পদার্থ বটে, কিন্তু চালে ডালে না মিশিলে যে অপরূপ 'ওগরা'র উৎপত্তি হয়, সে অনায়াসে কৈফিয়ৎ দিতে পারে,—'বাঁধন-হারা কবির কাব্যে বিধিবিধান নাই।'

ভারত-মহিলা। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমতী রাজকুমারী দাস 'অবরোধ-প্রথা' প্রবন্ধে অবরোধের নিন্দা করিয়াছেন। লেখিকা বলেন,—বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথা ছিল না। তাহা সত্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণ না থাকিলে সমাজে কোনও প্রথার উদ্ভব অসম্ভব, লেখিকা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। স্বাধীন আর্য্যাবর্ত্তে নারীর মহিমা, সম্মান ও স্বাধীনতা ছিল,—অধীন বিচ্ছিন্ন ভারতে নারীর সেই ঐশ্বর্য্য, অধিকার, স্বাতন্ত্র্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। স্বাধীন যুগের আচার পরাধীন যুগে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। মনো

কারণে, প্রধানতঃ সমাজের কোনও [illegible] অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে [illegible] ইচ্ছায়, স্বার্থপরতায় এই প্রথার [illegible] নাই। এবং আমার বিশ্বাস, কেবল [illegible] বক্তৃতার [illegible] এ প্রথা সমাজ হইতে উন্মূলিত করিবার আশা নাই। যে দেশের পুরুষ [illegible], আত্মরক্ষায় অক্ষম, অবরোধের দ্বার রক্ষা করিবার জন্যও যাহাদিগকে [illegible] রাজার [illegible] ভিক্ষা করিতে হয়, সে দেশে কেবল মৌখিক ও নৈতিক উপদেশে অবরোধ চূর্ণ হইতে পারে না। আর যাঁহারা অবরোধের কঠোর কারা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উচ্চ ও উন্নত আদর্শেও অবরোধের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। পুরুষের উন্নতি, সংযম, সদাচার ও আত্মরক্ষার শক্তি পূর্ণবিকশিত না হইলে, কোনও সমাজে অবরোধ প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী কোনও আচার লুপ্ত হইতে পারে না। সু ও কু, উভয় প্রথাই সামাজিক বিবর্ত্তনের ফল। সেই বিবর্ত্তনের কারণ যদি লুপ্ত না হয়, তাহার কার্য্যও লুপ্ত হইতে পারে না। জামালপুরে ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে সম্প্রতি যে বীভৎস নারকী লীলার অভিনয় হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, আমাদের—অর্থাৎ পুরুষদের অন্ততঃ বজ্রবুক্ত জেনানা অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা আমাদের জেনানা গড়িব, কি মহিলাদের 'জেনানা' ভাঙ্গিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যত দিন এই প্রহেলিকার সমাধান না হইতেছে, তত দিন প্রাচীন হিন্দু সমাজ অবরোধমুক্ত সমাজের আদর্শে দৃষ্টি রাখিবে। সেই স্বাধীনতার ফলাফলে হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তন—অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ভর করিতেছে। আর, অবরোধ বলিলে রাজধানী অঞ্চলে যে বিষম ঘেরাটোপ বা সাংঘাতিক কারাগার বুঝায়, বাঙ্গলার শ্যামল পল্লীর অন্তঃপুরে তাহার অস্তিত্ব নাই। বঙ্গবামার চরণের নিগড় যত কঠিন, যত কঠোর বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা তত কঠিন কঠোর বর্ব্বর নহে।—প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্তরের স্বাধীনতা, চিন্তা ও ভাবের স্বাধীনতা,—অবশ্য স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে,—বঙ্গবামার পক্ষে প্রকৃতপক্ষে 'নিশার স্বপন' বা আকাশকুসুম নহে। মনে হয়, আশা করা যায়,—ভারতবাসীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার সহিত নারীরাজ্যেও 'স্বরাজে'র স্বাভাবিক অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নহে। কু ও সু, দুই প্রথাই স্বাভাবিক পথেই তিরোধান করিতে পারে। পরাধীন পরপদদলিত সমাজের কোনও প্রথাই কৃত্রিম উপায়ে বিনষ্ট হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব-সাধনে সফল না হইলে ভারতবাসীর আশা নাই। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার—কুপ্রথার উচ্ছেদ ও সুপ্রথার প্রতিষ্ঠা সমগ্র জাতির মনুষ্যত্ব-সাধনার উপর নির্ভর করিতেছে। যাহারা স্বয়ং মহাপঙ্কে বিমগ্ন, ইংরেজের পিঞ্জরে চিররুদ্ধ, তাহারা অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীদের মুক্তিদান করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় অধীনতার ফল সার্ব্বভৌমিক অধীনতা. সর্ব্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ; নারী জাতির অবরোধ তাহার অন্যতর অবান্তর ফল; প্রকৃতির এই অমোঘ শাসন অনতিক্রমণীয়, সুতরাং আক্ষেপ করিয়া কোনও ফল নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে প্রেম ও ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসত্যবন্ধু দাস কর্ত্তৃক হিন্দী হইতে অনূদিত 'বনিতা-বিনোদ' হিতকারী নিবন্ধ। আরও অধিকমাত্রায় ছোকা শুদ্ধ হইলে ভাল হয়।

—

সাহিত্য, ১৮শ বর্ষ, [illegible] সংখ্যা।

পরমাণু।

আজিকার প্রবন্ধের বিষয়টি অতি পুরাতন। অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ও গ্রীস দেশের পণ্ডিতেরা পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত এই পরমাণু কল্পিত পদার্থই রহিয়াছে, উহা এখনও কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই, বা কখনও প্রত্যক্ষগোচর হইবে, এরূপ আশাও আপাততঃ দেখি না। অথচ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এই কল্পনাটির মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই কল্পনা ব্যতীত আমরা জড় পদার্থের নিত্য প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি না।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর যখন বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তখন এখানে কল্পনার বা অনুমানের স্থান আছে কি না? যদি থাকে, তাহার মূল্যই বা কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়া পরমাণু সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিবার চেষ্টা করিব।

বিধাতা আমাদিগকে যে ইন্দ্রিয়-শক্তি দান করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা বিশ্ব-জগতের কিয়দংশমাত্রের সহিত পরিচয় লাভ করি। বিশ্ব-জগতের অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত ও অপরিচিত। উহার যে ভাগ আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই, উহার অন্তরালে কি আছে, জানিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল; আড়ালে কি আছে না জানিলে, সম্মুখে যাহা দেখি, তাহার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা ক্রমাগত সেই অন্তরালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অধিক দূরের জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না; আমরা চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দূরের জিনিসের ছবি নিকটে আনি ও সেই ছবিকে বড় করিয়া দেখিয়া লই। অতি ছোট জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না; আমরা চোখের সম্মুখে খান দুই কাচ রাখিয়া ছোট জিনিসকে বড় করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া লই। সূর্য্যের আলো একঘেয়ে সাদা, আমরা তাহাকে একখানা কাচের কলমের ভিতর চালিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলি, এবং ঐ শুভ্রবর্ণের আলোকের ভিতর কত বিচিত্র বর্ণের আলোক আছে,

তাহা বাহির করি, এবং তদুই বিচিত্র বর্ণের আলোকের সহিত তপ্ত পার্থিব দ্রব্য[illegible] যে আলোক বিকীর্ণ করে, তাহা মিলাইয়া, সূর্য্যমণ্ডলে কি কি পার্থিব দ্রব্য আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করি। এইরূপে আমরা যাহা চক্ষুর অগোচর, যাহা কর্ণের অগোচর, যাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাকে নানা কৌশলে ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া বিশ্ব-জগতের নিগূঢ় বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করি। এইরূপ চেষ্টার ফলে কত নিগূঢ় তথ্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই; কিন্তু তথাপি সেই রহস্যরাশির ইয়ত্তা হইল না। একটা রহস্য ভেদ করিবামাত্র আমরা বুঝিতে পারি, উহার অন্তরালে আবার কত বহুতর গূঢ়তর রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই রহস্যগুলির আবরণ উন্মোচন না করিতে পারিলে আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই ইহা একটা তৃষ্ণা; অন্য তৃষ্ণার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, কিছুতেই ইহার পরিতৃপ্তি ঘটে না; তৃপ্তির জন্য যতই ব্যবস্থা করা হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় মাত্র।

তৃষ্ণার ইয়ত্তা নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যের শক্তির ইয়ত্তা আছে। চেষ্টার ফলে প্রকৃতির রহস্য কতক উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু তাহারও অন্তরালে যাহা অবস্থিত থাকে, তাহা বাহিরে আসিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা মন্দিরের দ্বারদেশে হত্যা দিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি দেবতা আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না। উপাসক তখন কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন; যাহা অগোচর, কল্পনা-নেত্রে তাহার মূর্ত্তি দেখেন; যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, যাহা অপ্রকাশ, তাহার কাল্পনিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। কল্পনাবলে যে ছবি আঁকা যায়, তাহার মূল্য কতটুকু বলা কঠিন; হয় ত তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথবা আংশিকভাবে সত্য; যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, এই কল্পনার খেলা; প্রত্যক্ষের সহিত মিল রাখিবার জন্য, প্রত্যক্ষের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, প্রত্যক্ষকে ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়াসেই, অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই চাতুরী। হয় ত এমন দিন আসে, যে দিন সহসা উহা প্রত্যক্ষগোচর হয়; তখন দেখিতে পাওয়া যায়, কল্পিত ছবি কতটুকু সত্য বা কতটুকু মিথ্যা। যেটুকু সত্য, সেটুকু গ্রহণ করিতে হয়। যেটুকু মিথ্যা, সেটুকু বর্জ্জন করিতে হয়। যেটা সত্য, সেটা লাভ; যেটা মিথ্যা, সেটা সম্পূর্ণ লোকসান বলিতে পারি না; কেন না, [illegible] হইতে নিষ্কৃতি লাভটা, এ জগতে অল্প লাভ নহে।

আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা নিন্দা প্রচারিত আছে যে, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর কোনও ভদ্রলোক নির্ভর করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকেরা আজ এক কথা বলেন, কাল আবার অকস্মাৎ তাহা উল্টাইয়া দেন। বাস্তবিকই এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান-শাস্ত্র একই ঘটনা সম্বন্ধে কত বিচিত্র মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্য হইতে আমরা আলো পাই, ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। সূর্য্য হইতে আলোক-কণিকা ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চোখে আঘাত করে, তাহার ফলেই আমাদের আলোক-বুদ্ধি;—নিউটনের শিষ্য প্রশিষ্য নিউটনের এই মতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কেহ ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা লাঠী তুলিয়া মারিতে আসিতেন। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, সেরূপ আলোক-কণিকা অস্তিত্বহীন। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ আছে, তাহার ইংরাজি নাম Ether; বাঙ্গলায় বলা হয় আকাশ; এই কল্পিত আকাশের অন্য ধর্ম্ম কি আছে না আছে, জানি না; কিন্তু ইহাতে ঢেউ জন্মিতে পারে। জলে লোষ্ট্রনিক্ষেপে যেমন ঢেউ জন্মে, অথবা তন্ত্রীতে আঘাত করিলে বায়ুরাশিতে যেমন ঢেউ জন্মে, এই আকাশে সেইরূপ ঢেউ জন্মে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে সেই ঢেউ প্রবলবেগে আসিয়া আমাদের নেত্রপথে আঘাত করিলে, আমাদের আলোক-বুদ্ধি হয়। এখন আর নিউটনের আলোক-কণিকাতে কেহ বিশ্বাস করে না, এখন কেবল ঢেউ আর ঢেউ। আর একটা উদাহরণ দিব; এই পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এতকাল বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, এই পরমাণু কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, কেহ কাটিতে পারে না। অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অভেদ্যোঽয়ম্। আজকাল সেই বৈজ্ঞানিকেরাই বলিতে আরম্ভ করিতেছেন, পরমাণুকে ভাঙ্গার মত সহজ কাজ আর কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে পরমাণু সর্ব্বদাই টুক্‌রা টুক্‌রা হইতেছে, এতকাল আমরা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ থাকিয়া তাহা দেখিতাম না। যাঁহারা বাহিরের লোক, বৈজ্ঞানিকের মুখে বিজ্ঞানের কথা শুনিয়া অবিচারে তাহার গ্রহণে বাধ্য হন; তাঁহারা এরূপ ক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া পড়েন। বৈজ্ঞানিকের কোন্ কথাটা ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার ঠাহর পান না, অবশেষে কেহ কেহ অধীর হইয়া বৈজ্ঞানিকের সত্যনির্দ্ধারণপ্রণালীতেই সন্দেহ করিয়া বসেন। বস্তুতঃ ইহা বৈজ্ঞানিকের দোষ নহে। ইহা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর দোষ, ঠাকুরাণী যদি প্রার্থনামাত্রে মুখের ঘোমটা খুলিয়া আপনার চন্দ্রবদন একেবারে প্রকাশ করিয়া দিতেন, তাহা

হইলে বৈজ্ঞানিকের কথায় এরূপ খেলাপ হইত না। কিন্তু তাঁহার সে স্বভাবই নয়। অনেক সাধনার পর তিনি অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ মোচন করেন, সেইটুকু স্পষ্ট দেখা যায়; বাকিটুকু দর্শনার্থীকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়; আবার অনেক সাধনার পর আর একটু প্রকাশ পায়, তখন বাকিটুকুর জন্ত আবার কল্পনায় ক্ষুরে শান প্রয়োগ করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিকের অবস্থা এইরূপ; বিধাতা তাঁহাকে অসীম শক্তি যখন দেন নাই, তখন তাঁহার দোষ কোথায়? সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি অনেক বেশী দেখিয়া থাকেন, তাই বলিয়া তিনি মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত নহেন; তাঁহার যে ক্রটী, তাহা মনুষ্যসাধারণ ক্রটী; তাহার জন্য তাঁহাকে দায়ী না করিয়া তিনি অবিশ্রাম সাধনার ফলে যে সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেওয়া উচিত। তিনি যাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এখন মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি হইয়াছে; যাহা অনুদ্ঘাটিত আছে, তাহার জন্ত ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক জীব দায়ী নহেন। ভগবতী মায়া যিনি মানবাত্মাকে পূর্ণজ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনিই তজ্জন্ত দায়ী রহিয়াছেন।

সকল বৈজ্ঞানিকের সকল বাক্যকেই বিসংবাদরহিত সত্য মনে করিয়া লওয়াটাই ঠিক্ নহে। যাহা প্রত্যক্ষগোচর, যাহা বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর, তাহাই সত্য; এবং যাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, কেবল অনুমান-লব্ধ, তাহা পূর্ণ সত্য নহে; খুব সম্ভব, আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু যাহা আংশিকভাবে সত্য, বৈজ্ঞানিক তাহাকে একেবারে ফেলিতে পারেন না, কেন না, উহার সাহায্যেই তিনি সাধনার অবসর পান। কল্পনার ও অনুমানের সাহায্য লইয়াই তিনি আপনার গন্তব্য পথ স্থির করেন।

কোন্ পথে গেলে সত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে, বহু স্থলে তাহার তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াম্; অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে বহুকালে পথ মিলিতেও পারে, বা নাও পারে। কিন্তু অনুমানের সাহায্য লইয়া একটা পথ ধরিয়া চলিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া পড়ে। কিছু দূর চলিলেই তখন বুঝা যায়, এ পথে সত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে কি না। যদি বোধ হয়, এ পথ ঠিক্ পথ হয় নাই, তখন সে পথ হইতে ফিরিলে ভবিষ্যতে অকারণ শ্রমের লাঘব হয়; আর যদি ক্রমে ধারণা দৃঢ় হয়, এই পথেই ফল মিলিবে, তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলে কালে অভীষ্টলাভ ঘটিতেও পারে।

এই পন্থার নাম [illegible] পন্থা। প্রত্যক্ষ হইতে যাত্রা করিয়া [illegible] পন্থা ধরিয়া লক্ষ্য অভিমুখে চলিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই [illegible] এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র এই কয় বৎসরে যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা[illegible] প্রতিপন্ন হইতেছে, আপাততঃ নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

আমার গৌরচন্দ্রিকা এত বড় হইয়া গেল যে, প্রস্তাবিত গানের পালা সাঙ্গ করিতে পারিব কি না, সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিতেছে। অতএব আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রকৃতবিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা পরমাণুর অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানটা কিরূপ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটা অট্টালিকার গঠন দুই রকমে সম্পন্ন হইতে পারে। মনে করুন, তাজমহল কিরূপে গঠিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বুঝিতে হইবে। অনুমান করা যাইতে পারে, ঐ স্থানে একটা নিরেট মার্ব্বেলের পাহাড় ছিল, তাহাকে খুদিয়া, তাহার বাহির হইতে ও ভিতর হইতে পাথর কাটিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাই হইল তাজমহল। এই পদ্ধতিতে মন্দির-নির্ম্মাণ কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। আমাদের ভারতবর্ষেই কত গিরিগুহা এইরূপে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মনুষ্য-কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মাকে আসিতে হয় নাই। আর এক পদ্ধতিতে তাজমহল নির্ম্মিত হইতে পারে। দূরে মার্ব্বেলের পাহাড় ছিল, সেই পাহাড় হইতে প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া আনিয়া তাহাতে ইষ্টক তৈয়ার করিয়া ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজাইয়া কারিগরে এই তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারে। অট্টালিকা-নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়ম এই; এবং তাজমহলের নির্ম্মাণপ্রণালী এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কাজে দুই রকম অনুমানই চলিতে পারে, কোন্‌টা সঙ্গত, তাহা তাজমহলের পার্শ্বে দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাজমহল নিরেট খুদিয়া বাহির করা জিনিস, কি পাথরের উপর পাথর বসাইয়া নির্ম্মিত, তাহার উত্তর তাজমলের সম্মুখে দাঁড়াইলেই বুঝা যাইবে। যদি বা না বুঝা যায়, তাজমহলকে ভাঙ্গিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পাবে; তবে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানতৃষ্ণা-নিবারণের জন্যও এই অপকর্ম্মে কেহ সম্মত হইবেন না। এক টুকরা সোনা জড়পদার্থ; ঐ স্বর্ণখণ্ডের গঠনপ্রণালী কিরূপ, তাহার সম্বন্ধেও এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। উহা একেবারে নিরেট জিনিস, না উহা

ছোট টুকরা স্বর্ণখণ্ডের সমবায়ে নির্মিত, [illegible] দিতে হইবে। স্বর্ণখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিয়াছেন; এবং স্থির করিয়াছেন যে, উহা টুকরা টুকরা ইষ্টক জোড়া দিয়াই নির্মিত হইয়াছে। ঐ ইটের টুকরা অবশ্য এ স্থলে সোনার ইট, এবং ইহা এত ছোট যে, এ পর্যন্ত কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই; হইবে, তাহার ভরসাও অল্প। কাজেই উহা এখনও অনুমানলব্ধ পদার্থ। তাজমহল ভাঙ্গিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারে যে, মার্বেলের ইট সাজাইয়া উহা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্বর্ণখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া এ পর্যন্ত সেই সোনার ইট বাহির করিতে পারেন নাই, কেবল অনুমান করিয়া বলিয়া আছেন যে, হাঁ, কেবলই ভাঙ্গিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত সেই সোনার ইট পাওয়া যাইতে পারিবে। যে ইটের সহিত ইট জোড়া দিয়া এই স্বর্ণখণ্ডের অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, সেই ইটগুলি আর ভাঙ্গা চলিবে কি না, বলা কঠিন। ঐ অতি সূক্ষ্ম সোনার ইষ্টক, যাহা এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই, তাহারই সোনার নাম পরমাণু। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, কেবল সোনা কেন, জগতের যাবতীয় জড়দ্রব্য ঐরূপ পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। ইটের উপর ইট গাঁথিয়া অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইলে দুই ইটের মধ্যে চুন সুরকির মশলা দিতে হয়, অথবা বৃহদ্ব্যাপারে বিনা মশলাতেও বড় বড় পাথরের টুকরা আপনার চাপে জমাট বাঁধিয়া পরস্পরকে ধরিয়া রাখে। পরমাণুর গায়ে পরমাণু কোনরূপও মশলা দিয়া জোড়া আছে, অথবা স্বধর্মে পরস্পরকে আঁটিয়া ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোনও স্পষ্ট কথা বলিতে সাহস করেন না। তাঁহারা এই পর্যন্ত বলেন যে, পরমাণু সকলের মাঝে অবশ্যই ফাঁক আছে, বা অবকাশ আছে; তবে সেই অবকাশ একেবারে শূন্য কি না, তাহা বিবেচ্য।

আপাততঃ এই ইটগুলিকে 'পরমাণু' না বলিয়া 'অণু' বলিব। কেন, তাহা পরে বুঝা যাইবে। আধুনিক মত এই যে, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অণুর সমবায়ে যাবতীয় জড়পদার্থ নির্মিত হইয়াছে। সেই অণু নানাবিধ; বায়ুর অণুর সমষ্টিতে বায়ু, জলের অণুসমষ্টিতে জল, আর সোনা রূপার অণুর সমষ্টি সোনা রূপা। অণুগুলি ভাঙ্গা কঠিন, এবং অণুগুলির মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর অবকাশ আছে।

নিরবকাশ দ্রব্যে আর এইরূপ সাবকাশ দ্রব্যে প্রভেদ আছে, সেইটি ভাল করিয়া বুঝা উচিত। একখানা পাথরকে আমরা নিরেট বলি, কিন্তু প্রস্তর-খণ্ডের স্তূপকে নিরেট বলি না। একখানা ইটকে বরং নিরেট বলা চলিতে পারে, কিন্তু ইটের পাঁজাকে নিরেট বলা যায় না। ধান অথবা চাল অথবা বালি স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিলে, ঐ স্তূপকে নিরেট বলা চলে না; কিন্তু একখানা বৃহৎ কাষ্ঠকে আমরা নিরেট বলিতে পারি। লৌহস্তম্ভকে নিরেট বলা যায়, কিন্তু ইষ্টকস্তম্ভ নিরেট নহে।

ধান্য চাউলের স্তূপ কিংবা বালুকাস্তূপ দূর হইতে নিরেট বলিয়া বোধ হয়। তখন তাহার এক একটি ধান, এক একটি চাল, এক একটি বালির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নজরে পড়ে না; নিকটে আসিলে যখন প্রত্যেক ধান, প্রত্যেক চাল, প্রত্যেক বালুকাকণা চোখে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে পারি যে, এই সকল স্বতন্ত্র কণিকার মাঝে মাঝে ফাঁক আছে; চোখে না দেখিয়াও বুঝিতে পারি, হাত গুঁজিয়া দিলে কণাগুলি পৃথক হইয়া যায়, হাত ঐ স্তূপের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করে; অথবা জল ঢালিয়া দিলে, জল ঐ ফাঁকে অবাধে প্রবেশ করে। মাটীতে জল শুষিয়া লয়; ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মাটী নিরেট দ্রব্য নহে, উহার কণিকাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইলেও উহা সচ্ছিদ্র, সান্তর, সাবকাশ পদার্থ।

জল ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু বালুকাকণার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, উহার গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র। ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করা সহজ। দেওয়ালের গায়ে গজাল বসাইতে হইলে দুইখান ইটের মাঝে যেখানে ফাঁক আছে, সেইখানেই গজাল বসান সহজ; ইঁদুরের পক্ষে সেইখানেই গর্ত্ত করা সহজ;—এবং টিকটিকি যখন দেওয়ালের ভিতর বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন ঐরূপ ফাঁক দেখিলেই খুসী হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা যে সকল জিনিসকে নিরেট মনে করি, তাহা বস্তুতঃ নিরেট কি না; এবং তাহার ভিতরে ঐরূপ ছিদ্র আছে কি না। মাঝে মাঝে ফাঁকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, তাহা নিরেট নহে, উহার গঠনপ্রণালী ইটে গাঁথা দেওয়ালের মত, অথবা বালুকাস্তূপের মত। কাঁচা মাটীর ছিদ্র সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু পোড়া মাটীর ছিদ্র তত সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু উহাও সচ্ছিদ্র বুঝিতে পারি, যখন দেখি, পোড়া মাটীর কলসীর ভিতরে জল রাখিলে ঐ জল বাহিরে আসিয়া

জন্য উহাদের আণবিক গঠন অনুমান করিতে হয়। দুর্গের প্রাচীর চাপ দিয়া ভাঙ্গিবার দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে। সে কালে হাতী লাগাইয়া তাহার চাপে ভাঙ্গা হইত। এ কালে কামানের গোলা মুহুর্মুহু ছুড়িয়া চাপ দেওয়া হয়। জলের চাপ বুঝিবার জন্য মনে করিতে হয়, জলের ভিতর বহুসংখ্যক জলের অণু ছুটাছুটি করিতেছে ও বায়ুর মধ্যে বহুসংখ্যক বায়বিক অণু ছুটাছুটি করিতেছে। কঠিন পদার্থের চাপল্য নাই; উহার অণু তেমন করিয়া ছুটাছুটি করে না। এই ঘরের ভিতর যে বাতাস আছে, তাহা এই ঘরের দেয়ালে, ছাদে, মেজের উপর চাপ দিতেছে, এমন কি, আমাদের বুকে পিঠে মাথায় সর্ব্বত্র চাপিয়া আছে। চারি দিকে সমান চাপ পড়ায় আমরা টের পাই না; নতুবা সেই চাপের পরিমাণ এত বেশী যে, কেবল একধারে চাপ পড়িলে আমরা সকলেই চপেটীকৃত হইয়া চিপীটকে পরিণত হইতাম। একটা গেলাসে মুখ লাগাইয়া উহার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলে ভিতরের চাপটা কমিয়া যায়, বাহিরের বায়ুর চাপে গেলাস গালের উপর চাপিয়া ধরে। পিচকারির ভিতর যে জল উঠে, সে বাহিরের বায়ুর চাপে। এই চাপের হেতু বায়ুর চপলতা। বায়ু চপল, উহার অণুগুলিও চপল; এই ঘরের ভিতর যে কোটি কোটি বায়বিক অণু বর্ত্তমান, উহারা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এ মুখে ও মুখে সে মুখে বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; ছুটিতেছে ও ছাদে দেয়ালে ধাক্কা দিতেছে; ধাক্কা দিতেছে, আর ছটকিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি অণু কোটি কোটি বার ধাক্কা দিতেছে। এক একটি অণু অতি ক্ষুদ্র দ্রব্য, উহার ধাক্কা নগণ্য; কিন্তু যখন কোটি কোটি অণু সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার বেগে ধাক্কা দিয়া আসে, তখন অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা হইয়া পড়ে; তখন সেই ধাক্কার ফল আর নগণ্য থাকে না। ছিপি দেওয়া বোতলের ভিতর যে বাতাসটুকু আট্‌কান থাকে, আপাততঃ মনে হয়, উহা স্থির; কিন্তু ঐ বাতাসের চাপ বোতলের গায়ে লাগিতেছে; এবং সেই চাপের কারণ সেই বায়বিক অণুর ছুটাছুটি।

এই ঘরের মধ্যে কত কোটি বায়বিক অণু আছে, এবং এক একটি অণুর ওজন কত, তাহা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু কি বেগে উহারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার নির্দ্দেশ তেমন কঠিন নহে। এক একটা অণুর ওজন না জানিলেও সমুদয় অণুগুলির একযোগে ওজন কত, তাহা জানি; এবং সকলে মিলিয়া দেয়ালের গায়ে কতটা চাপ দিতেছে, তাহারও হিসাব আছে; কাজেই

কত বেগে ধাক্কা দিলে সেই চাপটা সম্ভব হয়, তাহা খড়ি পাতিয়া বলিতে পারা যায়। আমি এখানে খড়ি পাতিতে বসিতেছি না, সে ভয় আপনাদের নাই; তবে খড়ি পাতিলে দেখা যাইবে যে, অণুগুলির বেগ নিতান্ত সামান্য নহে। অন্ততঃ আমাদের কাহারও সেরূপ বেগে ছুটিবার ক্ষমতা নাই। পদব্রজে ত নাই, তবে বাইসাইকলে ছুটিলে কতকটা তুলনা চলিতে পারে। রেলগাড়ীর বেগের সহিতও তুলনা চলিতে পারে। বায়ুর চাপটা সর্ব্বজনবিদিত হইলেও, স্থির বায়ুর অণুগুলি যে এমন ভীমবেগে ছুটিতেছে, তাহা অনেকেই জানেন না; কিন্তু উহা না মানিলে উপায় নাই। এই অনুমান ভিন্ন স্থির বায়ুতে কেন এতটা চাপ দেয়, তাহা বুঝিবার উপায়ান্তর নাই। অন্ততঃ এখনও অন্য উপায়ে কেহ বুঝাইতে পারেন নাই। শুধু চাপ কেন, ঐ চাপ কেন বাড়ে কমে, তাহাও বুঝাইবার অন্য উপায় নাই। ঠাণ্ডা বায়ুর চেয়ে উষ্ণ বায়ুর চাপ বেশী। আবার একটা বড় বোতলের বায়ুকে ঠেসিয়া যদি একটা ছোট শিশিতে পুরিয়া ফেলি, তাহাতেও তাহার চাপ বাড়িয়া যায়; কতটুকু বাড় তাহাও জানি; কেন বাড়ে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ অনুমানের আশ্রয়েই উত্তর দিতে পারি। উষ্ণ বায়ুর চাপ বেশী, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঠাণ্ডা বাতাসের অণুর চেয়ে উষ্ণ বাতাসের অণু অধিক বেগে ছুটে; অধিক বেগে ছুটে বলিয়া ধাক্কার জোর বেশী হয়; চাপের মাত্রাও বেশী হয়। আর বোতলের বাতাসকে ঠেসিয়া শিশিতে পুরিলে ধাক্কার জোর বাড়ে না বটে, কিন্তু ধাক্কার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আগে যে সময়ে যতবার ধাক্কা পড়িতেছিল, এখন সেই সময়ে তার চেয়ে বেশীবার ধাক্কা পড়ে। ফলে বহুতর ধাক্কার ফলে চাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ বায়ুর চাপের কথা বলিলাম। মারুত পদার্থমাত্রের চাপেই এই কথা খাটে। জলের মত তরল পদার্থের পক্ষেও ইহা অনেকাংশে খাটে। মারুত পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে ও ঠাণ্ডা করিয়া উহাকে ঠেলিয়া ধরিলে, উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। আজ কাল বোতলে করিয়া তরল বায়ু বিক্রয় হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, মারুত বায়ু ও তরল বায়ু, উভয় বায়ুতে প্রভেদ কি?

প্রভেদ কতকটা এইরূপ। একটা বড় মাঠের চারি দিক প্রাচীরে ঘেরিয়া তাহাতে শতখানেক স্কুলের ছেলে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়; তাহারা মাঠের মধ্যে আনন্দে ছুটাছুটি করুক। ছুটিতে ছুটিতে তাহারা প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা দিবে ও ছটকিয়া অন্য দিকে চলিবে। পর-

স্পর মাথা-ঠোকাঠুকি না করিবে, এমন নহে। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিবে ও প্রাচীরে ধাক্কা দিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবে। বোতলের ভিতরে বা এই ঘরের ভিতর বায়ুরাশিতে যে অণুগুলি আছে, তাহাদের অবস্থা কতকটা এইরূপ। বোতলের ভিতর জলীয় বাষ্প পুরিয়া রাখিলে তাহার অবস্থাও কতকটা এইরূপ হয়। অণুগুলির মাঝে প্রচুর ব্যবধান বা অবকাশ থাকে; সেই খোলা মাঠে উহারা ছুটিয়া বেড়ায়, পরস্পর ঠোকাঠুকি করে ও দেওয়ালে ধাক্কা দেয়।

বায়ু বা জলীয় বাষ্প যখন তরল বায়ু বা তরল জলে পরিণত হয়, তখন উহার অবস্থা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। মনে করুন, সেই ছেলেগুলিকে ইস্কুলের ঘরের ভিতর পুরিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু মাষ্টার তখনও ক্লাসে আসেন নাই। তখনও তাহাদিগকে বেঞ্চিতে বসান দায়; তাহারা ঘরের মধ্যেই ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হওয়ায় তখন আর তেমন দৌড়াদৌড়ির অবকাশ পাইবে না। ঘর ছোট, ছেলের সংখ্যা অধিক, তখন ছেলের ছেলের মাথা-ঠোকাঠুকি বা গা-ঘেঁষাঘেঁষির ব্যাপারটা বাড়িয়া যাইবে; দেওয়ালের গায়েও ধাক্কাধাক্কি না হইবে, এমন নয়। স্থানাভাবে এবার স্বাধীনভাবে দৌড়ানর সুবিধা হইবে না। তরল পদার্থের অণুগুলির অবস্থা কতকটা এইরূপ।

তরল পদার্থ আরও ঠাণ্ডা হইলে কঠিন হইয়া পড়ে। জল দানা বাঁধিয়া বরফ হয়। কঠিন হইবার সময় অনেক তরল পদার্থ দানা বাঁধে। দানার ইংরেজি নাম crystal crystalএর গঠনে কারুকার্য্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে। এখন সেই কঠিন অবস্থায় অণুগুলির অবস্থা কিরূপ? এখন মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে বসিয়াছেন। ছেলেরা সারি দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়াছে; কোথায় সেই চপলতা, কোথায় সেই ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি; কেমন শৃঙ্খলা; কেমন সংযম। বেঞ্চির পর বেঞ্চি, এ পাসে বেঞ্চি, ও পাসে বেঞ্চি; কেমন থাকে থাকে সারি দিয়া সাজান। বেঞ্চির উপর বালকবৃন্দ কেমন শোভা করিয়া উপবিষ্ট।

এখন সকলে স্বস্থানে উপবিষ্ট; দেওয়ালে ধাক্কাধাক্কি ত নাই; পরস্পর ঠোকাঠুকিরও অসদ্ভাব। তবে গা ঘেঁষাঘেঁষি আছে। পূর্ব্বের মত চপলতা নাই, তবে চাঞ্চল্য যে নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই সভাস্থলে যাঁহারা এই শ্রেণীর পাঠকের মত মাষ্টারির কাজে অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন,

যে, মাষ্টার মহাশয়ের উপস্থিতি, এমন কি তাঁহারও পর্য্যন্ত ছেলেদের চাঞ্চল্য-নিবারণে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হয় না। উহারাই মধ্যে স্বস্থানে বসিয়াই, শিরঃকম্প, হস্তান্দোলন, পদান্দোলন প্রভৃতি কত কি হইতেছে, তাহার সার তথ্য কি মাষ্টার মহাশয়ের গোচরে আইসে? অসম্ভব! কঠিন পদার্থের অণুগুলিতেও ত তাহাদের পূর্ব্বের মত চপলতা নাই; তাহারা ছুটিয়া বেড়ায় না, বা ছুটিতে পায় না। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়া আপন আপন স্থানে বসিয়াই কাঁপে, বা নড়ে, বা দোলে। উহারা আধার পাত্রের সর্ব্বত্র চাপ দিতে পারে না। আশে পাশে উপরে চাপ দিবার আর ক্ষমতা থাকে না; তবে অধোমুখে অর্থাৎ বেঞ্চির উপর যা কিছু দৌরাত্ম্য। কঠিনের সহিত তরলের ও মারুতের এইরূপ প্রভেদ। তিন অবস্থাতেই অণুর সংখ্যা সমান থাকে, তবে অণুর চপলতা সমান থাকে না। মরুতের অণু খুবই চপল, উহারা দৌড়ায়, বেগে দৌড়ায়, যে দিকে পায়, সেই দিকে দৌড়ায়, রেলগাড়ীর মত বেগে দৌড়ায়, দৌড়িয়া আধার পাত্রের গায়ে ধাক্কা দিয়া পিছু হঠিয়া আবার অন্য মুখে ছুটে; ছুটিতে ছুটিতে পরস্পর ঠোকাঠুকি করে। তরলের অণুও চপল, খুবই চপল; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আটক পড়ায় উহাদের ততটা স্বাধীনতা নাই। ঠোকাঠুকিটা এখন খুব বেশী। পাত্রের গায়ে ধাক্কাও আছে।

কঠিনের অণুতে সে চাপল্য নাই, তাহারা ছুটিতে পারে না; কেহই ছুটে না বলিতে পারি না। কোটি কোটি অণুর মধ্যে দু' দশ হাজার যদি ছুটিয়া বাহিরে যায়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ক্লাসের ছেলেরা কি পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে যায় না? তবে তাহার অধিকাংশই স্বস্থানে আবদ্ধ। এখন পাত্রের গায়ে ধাক্কা দিবার উপায় নাই। তবে স্বস্থানে বসিয়া যে কিছু চাঞ্চল্যপ্রকাশ। এই চাঞ্চল্য-প্রকাশের ফল উষ্ণতা। বরফের উষ্ণতাও থার্ম্মোমিটারে মাপা যায়।

ফলকথা, কঠিন, তরল ও মারুত, জড়পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থায় যে যে বিশিষ্ট ধর্ম্ম, তাহা এইরূপে বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল বিশিষ্ট ও প্রধান ধর্ম্ম ছাড়া আরও অনেক খুঁটিনাটি এই অণুঘটিত অনুমান হইতে বুঝা যায়। এবং অন্য কোনও উপায়ে বুঝা যায় না বলিয়াই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা আজ কাল একরূপ ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, জড়পদার্থমাত্রই অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত।

অণুকে ভাঙ্গা যায় কি না? পদার্থবিদ্যাবিশারদে এ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট কথা বলিতে চাহেন না; কিন্তু আর এক দল বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁহাদের

নাম রসায়নবেত্তা; তাঁহারা [illegible] ভাঙ্গিলে আমাদের কাজ চলিবে কিরূপে? তোমরা বলিবে তাহা, জলের অণু জলের সূক্ষ্মতম অংশ; উহার চেয়ে ছোট জলের কণা কল্পনীয় নহে। ঐ অণুকে ভাঙ্গিলে তাহা আর জলকণা থাকিবে না; উহা আর কিছু হইবে।” তা হউক না। আমরা ত সেই আর-কিছু-হওয়া ব্যাপারেরই তত্ত্ব অন্বেষণ করিতেছি। আমরা ত সদা-সর্ব্বদাই একটা জিনিসকে আর-কিছু-জিনিসে রূপান্তরিত করিতেছি। আমাদের কাজই এই,—আমরা হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করি, পারাকে রস-কর্পূরে পরিণত করি, তুঁতের ভিতর হইতে তামা বাহির করি, কঠিন গন্ধক পোড়াইয়া তরল গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, দস্তাতে সেই দ্রাবক ঢালিয়া এমন এক গ্যাস বাহির করি, তাহা দেখিতে ঠিক্ বাতাসেরই মত; কিন্তু তাহাতে আগুন ধরাইলে দুম্ করিয়া আওয়াজ হয়, অথবা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া যায়। ঐ গ্যাসের শাস্ত্রসঙ্গত নাম হাইড্রোজেন। আবার ছেলেরা যে কলেরাপটাসে পটকা তৈয়ার করে, উহাকে গরম করিয়া [illegible] একটা গ্যাস বাহির করি, উহাও দেখিতে ঠিক্ বাতাসেরই মত, কিন্তু তাহাতে প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তপ্ত লোহা কাগজের মত জ্বলিয়া যায়। এই গ্যাসের শাস্ত্রসঙ্গত নাম অক্সিজেন। আবার এই যে জল, যাহা মানুষের জীবন, তাহার ভিতর হইতে আমরা অক্লেশে সেই গ্যাস দুইটা, সেই হাইড্রোজেন ও সেই অক্‌সিজেন বাহির করিয়া জলটাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি। ওজন করিয়া দেখিয়াছি, নয় তোলা জল হইতে ঠিক্ এক তোলা হাইড্রোজেন আর আট তোলা অক্‌সিজেন বাহির হয়। সে গঙ্গাজলই হউক, আর গোলদীঘির জলই হউক। এক তোলা হাইড্রোজেন, আর আট তোলা অক্‌সিজেন, এই অনুপাতের কখনও ব্যতিক্রম দেখি নাই। হাইড্রোজেন যেখানে এক ভাগ, অক্‌সিজেন সেখানে আট ভাগ; সাড়ে সাতও নয়, সওয়া আটও নয়, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা আট ভাগ। এ কি ব্যাপার! আর একটা তরল পদার্থ আছে, উহা জল নহে; দেখিতে কতকটা তেলের মত! তাহাকে হাইড্রোক্‌সিল বলে। উহার ভিতর হইতেও আমরা হাইড্রোজেন আর অক্‌সিজেন বাহির করিতে পারি; আর কোনও তৃতীয় পদার্থ বাহির করিতে পারি না। সেখানে অনুপাত কিরূপ? হাইড্রোজেন এক ভাগ, আর অক্‌সিজেন কত? আট নহে, দশ নহে, পোনের নহে, সতের নহে, অক্‌সিজেনের ভাগ এখানে ষোল—আট দু’গুণে ষোল। জলে অক্‌সি-

জেনের ভাগ আট, আর হাইড্রক্সিলে অক্সিজেনের ভাগ আট দু'গুণে ষোল ; ব্যাপার কি ? ষোলের আর সতের কি দোষ করিল ? আমরা আরও অনেক জিনিস হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়াছি, ওজন করিয়া দেখিয়াছি, হাইড্রোজেনের ভাগ এক ধরিলে অক্সিজেনের ভাগ হয় আট, কিংবা আট দু'গুণে ষোল, কিংবা তিন আটে চব্বিশ, কিংবা চারি আটে বত্রিশ, যেন আটের ঘরের নামতা মুখস্থ করিতেছি ! অক্সিজেনের সঙ্গে এই আটের কি সম্পর্ক আছে ! অকসিজেন যে জিনিসের ভিতর যায়, ঐ আট বা আটের কোনও গুণফল সঙ্গে লইয়া যায়, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

তাৎপর্য্য এইরূপে বুঝিতে পারি।—জলকে যখন আমরা অন্য পদার্থে—অক্সিজেনে ও হাইড্রোজেনে পরিণত করিতে সমর্থ, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, জলের অণুকে ভাঙ্গা চলে। তোমরা বলিবে, জলের অণু ভাঙ্গিলে উহাতে আর জলত্ব থাকিবে না, উহা আর একটা কিছু হইবে। আমরা ত তাহাই চাই। জলের অণু ভাঙ্গিয়া আমরা যাহা পাই, তাহা জল নহে, তাহা হাইড্রোজেনের আর অক্সিজেনের সূক্ষ্মতম অংশ, উহার নাম দেওয়া হউক পরমাণু। অণু ভাঙ্গিয়া আমরা পরমাণু পাই—দুই রকম পরমাণু পাই,—এক পরমাণু হাইড্রোজেনের, অন্য পরমাণু অক্সিজেনের। মনে কর, অক্সিজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণুর চেয়ে আটগুণ দামে ভারী। এখন বুঝা যাইবে, কেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের ঐ অনুপাত। জলের প্রত্যেক অণু হইতে যদি আমি হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু পাই, আর অক্সিজেনের একটা পরমাণু পাই, আর যদি অক্সিজেনের পরমাণু ওজনে হাইড্রোজেনের পরমাণুর চেয়ে আটগুণ ভারী হয় ; তবে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেন ঐরূপ অনুপাত হইবে। এক ফোঁটা জলে না হয় বহু কোটী জলের অণু আছে ; যত কোটি অণু আছে, প্রত্যেক অণু ভাঙ্গিলে তত কোটি হাইড্রোজেনের পরমাণু, আর তত কোটি অক্সিজেনের পরমাণু পাওয়া যাইবে ; আর প্রত্যেক পরমাণু ওজনে আটগুণ হইবে ; অক্সিজেনের কোটি পরমাণুর ওজনও হাইড্রোজেনের কোটি পরমাণুর ওজনের আটগুণ হইবে। কাজেই উভয়ের অনুপাত এক ভাগ আর আট ভাগ। হাইড্রোক্সিলের বেলায় ষোল ভাগ কেন ? তাহাও বুঝা সহজ। জলের অণু ভাঙ্গিয়া অকসিজেনের একটা পরমাণু পাওয়া যায় ; হাইড্রোক্সিলের অণু ভাঙ্গিয়া মনে কর অক্সিজেনের দুইটা পরমাণু পাওয়া গেল। এক এক পরমার ওজন আট হইবে, দুই পরমাণুর ওজন ষোল হইবে। ঐরূপ

অন্ত কোনও দ্রব্যের অণু ভাঙ্গিয়া যদি অক্সিজেনের তিন পরমাণু পাওয়া যায়, সেখানে অক্সিজেনের ভাগ তিন আটে চব্বিশ হইবে। চারি পরমাণু থাকিলে ভাগ চারি আটে বত্রিশ হইবে, ইত্যাদি।

এখন আটের ঘরের নামতার সঙ্গে অক্সিজেনের সম্পর্ক বুঝা গেল। অক্সিজেনের ভাগ আট হয়, আবার ষোল হয়, মাঝামাঝি কিছু হয় না; দশও হয় না, চৌদ্দও হয় না, এমন কি আট দেড়া বারও হয় না। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, অক্সিজেনের পরমাণু আর ভাঙ্গা চলে না। উহা ভাঙ্গিতে পারিলে আটের ভগ্নাংশ মিলিতে পারিত। একটা পরমাণুকে দ্বিখণ্ড করিতে পারিলে আধখানা পরমাণুর ওজন হইত চারি। দেড়খানা পরমাণুর ওজন হইত আট দেড়ে বার। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কত জিনিস হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়াছি, আট পাইয়াছি, ষোল পাইয়াছি, কিন্তু আটের দেড়া যে বার, তাহা কখনও পাই নাই। অর্থাৎ অক্সিজেনের পরমাণু কখনও দু' টুকরা করিতে পারি নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অক্সিজেনের পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য; অচ্ছেদ্যোঽয়ং অভেদ্যো-ঽয়ং। অণু ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়, কিন্তু পরমাণু ভাঙ্গা যায় না। আর শৈত্যযোগে উহারা সঙ্কুচিত হয়। এই প্রসারণ-ক্ষমতা আছে বলিয়াই তপ্ত লোহার বেষ্টনী কাঠের রথচক্রের গায়ে কাটিয়া বসে, ঘড়ির পেণ্ডুলম গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে দ্রুত চলিয়া কালনিরূপণের ব্যাঘাত জন্মায়।

জড় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে, বা ফাঁক আছে,—অনুমান করিলে, এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ ব্যাপার বেশ বুঝা যায়। অণুগুলি কাছাকাছি আসায় সঙ্কোচন ও দূরে দূরে গেলে প্রসারণ ঘটে, এই অনুমান খুব স্বাভাবিক সহজ।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, এই একই উদাহরণে জড় পদার্থের গঠনের প্রণালী বুঝা গেল। মাঝে মাঝে ঐরূপ ফাঁক না থাকিলে সঙ্কোচন ঘটিবে কিরূপে? যাহা একবারে নিরেট ও নিরবকাশ, তাহার সঙ্কোচন প্রসারণ অসম্ভব।

কিন্তু এই একটা উদাহরণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। বৈজ্ঞানিক যখন কল্পনা করিতে বসেন, তখন তাঁহাকে অনেক আপাততঃ-বিরোধী ব্যাপারেও কোন রকমে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পূর্ব্বে যে আকাশের কথা বলিয়াছি, যে আকাশকে অবলীলা-

ক্রমে ভেদ করিয়া গ্রহ উপগ্রহ হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত অবাধে চলিতেছে, অনেক বৈজ্ঞানিকের অনুমানে উহা ইস্পাতের মত কঠিন পদার্থ। বায়ু-সাগরে বিষ্ণুর বাহন গরুড় হইতে লক্ষ্মীর বাহন পেচক পর্য্যন্ত সাঁতার দিতে সমর্থ, জলের সমুদ্রে এই সভাস্থলের সকল সভ্যই বোধ করি সন্তরণ সমর্থ, কিন্তু ইস্পাতের সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতির পক্ষেও সাধ্য হইবে কি না, সন্দেহের বিষয়। অথচ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঈথার ইস্পাতের মত কঠিন, এবং আমরা সকলেই তাহাতে ডুবিয়া আছি ও সাঁতার দিতেছি।

এখন দাঁড়াইল এই, এক ফোঁটা জলে বহু কোটি অণু আছে; কত কোটি অণু, তাহা সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা বড় কঠিন,—একেবারেই যে নির্দ্দেশ করা চলে না, এমন নহে। সেই অণু অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহারা কত বড়, তাহাও সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে একেবারেই যে নির্দ্দেশ চলে না, এমন নহে। সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছে—অবশ্য কতকটা আন্দাজ আছে, তথাপি সেই নির্দ্দেশে খুব বেশী যে ভুল আছে, তাহা নহে। কিরূপে নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি যদি এখনও না হইয়া থাকে, তখন নিশ্চয় হইবে। তবে মোটামুটি এইরূপ বলা চলে,—এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা নারিকেলের মত বড় দেখাইবে। সে কথা যাক, এই অণুগুলি জলেরই অণু; ইঁহারাই জলীয় বাষ্পের খোলা মাঠে ছুটিয়া বেড়ান, তরল জলে ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, ঠোকাঠুকি করিয়া ছুটিতে চাহেন, আর কঠিন বরফে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকেন ও দুলিতে থাকেন। এই অণু ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়; সেই পরমাণুতে আর জলত্ব থাকে না; উহা অক্সিজেনের পরমাণু, আর হাইড্রোজেনের পরমাণু। হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষাকৃত হাল্কা, অক্সিজেনের পরমাণু তাহা অপেক্ষা ভারী—আটগুণ ভারী! এই পরমাণু আর ভাঙ্গা চলে না। একটা পরমাণু, দশটা পরমাণু, দশ গণ্ডা, দশ পণ, দশ লক্ষ, দশ কোটি পরমাণু থাকিতে পারে, কিন্তু দেড়খানা, আড়াইখানা, পৌনে পাঁচখানা পরমাণুর অস্তিত্ব নাই। থাকিলে অক্সিজেনের ভাগ আট ভাগ বা ষোল

ভাগ না হইয়া; হার ভাগ, চৌদ্দ ভাগও সম্ভব হইত। অপিচ জল হইতে হাইড্রোজেন পাই, কিন্তু হাইড্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই পাই না। ইহাতে বোধ হয় যে, জলের অণুর ভিতর হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে; কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাণু ভাঙ্গিয়া অন্য কোনরূপ সূক্ষ্মতর পরমাণু পাওয়া যায় না। অতএব পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অবিভাজ্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তুলিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পার্থিব দ্রব্যের পরিমাণের দুইটি উপায় বর্ত্তমান আছে। এক উপায় গণনা, আর এক উপায় মাপা। গোয়ালে কত গরু আছে, পাঠশালায় কত ছাত্র আছে, সভায় কত সভ্য আছেন, গাছে কত ফুল ফুটিয়াছে, বাক্সে কতগুলি টাকা আছে, ইহা আমরা গণিয়া বলি। জিজ্ঞাসা করি, কতগুলি গরু, কতগুলি ছাত্র, কয়টি ফুল, কতগুলি টাকা ইত্যাদি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়,—এই ঘটিতে কতগুলি জল আছে, এই গাছটিতে কতগুলি কাঠ আছে, এই টাকাতে কয়টা রূপা আছে, তাহা হইলে প্রশ্ন হাস্যকর হইয়া উঠে; ওরূপ প্রশ্নের উত্তর হয় না। সভাপতি মহাশয়ের গোয়ালে বেশী গরু, কি সম্পাদক মহাশয়ের গোয়ালে বেশী গরু, আমরা অনায়াসে গণিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, এবং যদি সাবধানে গণা যায়, তাহা হইলে কোনও ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই গামলায় জল বেশী, কি ঐ গামলায় জল বেশী, তাহা গণিয়া বলিবার উপায় নাই; তাহা মাপিয়া ঠিক্ করিতে হয়। মাপার অর্থ কি? মনে করুন, এই গামলার জল মাপিতে হইবে। একটা বাটি লইলাম, সেই বাটিতে যে জল ধরে, তাহার নাম দিলাম এক সের জল; বাটিটার নাম দিলাম, সেরের বাটি। এখন গামলা হইতে বাটি বাটি জল তুলিয়া দেখা গেল, দশ বাটি অর্থাৎ দশ সের জল তোলার পর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিল, উহাতে বাটি পূর্ণ হয় না। তখন আর একটা ছোট বাটি নিলাম; উহার নাম দিলাম, ছটাকের বাটি। সেই ছটাকের বাটিতে তের ছটাক জল তুলিয়া দেখিলাম, যে জল অবশিষ্ট থাকিল, উহা এক ছটাকের কম। তখন আরও ছোট একটা বাটি লইলাম। উহা কাঁচ্চার বাটি। তিন বাটি বা তিন কাঁচ্চা জল তোলার পর দেখিলাম, এখনও কিছু জল রহিয়াছে, উহা এক কাঁচ্চার কম। এখন বিরক্ত হইয়া সেই জলটুকু পরিত্যাগ করিলাম, এবং বলিলাম, এই গামলায় জল আছে,—দুই সের, তের ছটাক, তিন কাঁচ্চা। ইহার নাম জল মাপা। কিন্তু মাপটা ঠিক হইল কি?

বিরক্ত হইয়া যে জলটুকু পরিত্যাগ করিয়াছি, সেটুকুর পরিমাণ কত? সেটুকু মাপিতে হইলে আবার কাঁচ্চার বাটির চেয়েও ছোট বাটি লইতে হইবে; এবং তাহাতে মাপার পরও যদি একটু জল বাকি থাকে, সেটুকুর জন্য আরও ছোট বাটি দরকার হইবে। যতই ছোট বাটি লও, খুব সম্ভব শেষ পর্য্যন্ত একটু জল বাকি থাকিবে,—যাহা সেই অতি ছোট বাটির চেয়েও অল্প; কাজেই এক সময়ে না এক সময়ে বিরক্ত হইতেই হইবে; এবং সেই কিঞ্চিৎ জলকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। মাপেও একটু ভুল থাকিয়া যাইবে। সে ভুল হয় ত খুব সামান্য ভুল, অকিঞ্চিৎকর ভুল; কিন্তু তবু ভুল বটে। গণনা কার্য্যে এমন ভুলের আশঙ্কা নাই। গণিবার সামগ্রীর সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, যদি সময় থাকে ও ফাঁকি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভুল না করিয়াও গণনা চলিতে পারে; নির্ভুল গণনা কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা দশ বৎসর অন্তর ঠিক্ হয়। উহাতে ভুল থাকে; কেন না যাহাদের উপর গণনার ভার, তাহারা হয় ফাঁকি দেয়, কিংবা যাহাদিগকে গণিতে হইবে, উহাদের সকলকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল ত্রুটিতে ভুল হয়; নতুবা নির্ভুল গণনা অসাধ্য নহে। কষ্ট স্বীকার করিলে পঙ্গপালের পতঙ্গসংখ্যা, সাগরবেলায় বালুকা-সংখ্যা ও আকাশের তারকা-সংখ্যাও নির্ভুল গণা যাইতে পারে। কিন্তু এক গামলা জল নির্ভুল করিয়া মাপা একেবারে অসাধ্য। সূক্ষ্ম মাপে কাঁচ্চার সহস্রাংশ বা লক্ষাংশ পরিমাণের জলও হয় ত মাপিতে পারিব; কিন্তু তাহার নীচে গিয়া পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কাজেই মাপে একটু ভুল থাকিবেই; গণনায় সে ভুল থাকিবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রভেদের কারণ কি? কারণ এই;—যে সকল দ্রব্য অবিভাজ্য, যাহা ভাঙ্গা যায় না, তাহাই গণনার যোগ্য; আর যাহা বিভাজ্য, তাহার গণনা চলে না। মানুষকে দ্বিখণ্ড করা চলে না, করিলেও তাহার মনুষ্যত্ব থাকে না; গাভীকে দ্বিখণ্ড করিতে আপনারা কেহ সম্মত হইবেন, আশা করি না; ফুলকে ছিঁড়িলে উহা আর ফুল থাকে না; টাকাকে দুই টুক্রা করিয়া কাটিলে উহা আর বাজারে টাকা বলিয়া চলিবে না; কাঁঠাল ফলকে খণ্ডিত করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা খাদ্য হিসাবে উপাদেয় বটে, কিন্তু তাহা কাঁঠাল ফল নহে। কাজেই যাহার খণ্ড নাই, ভগ্নাংশ নাই, তাহাই গণনাযোগ্য। বাজারে আমরা সাড়ে পাঁচ গণ্ডা আম কিনিতে যাই, কিন্তু সাড়ে পাঁচটা আম কিনিতে

পারি না। [illegible] মানুষ বা [illegible] হাতীর কথা কেহ কখনও শুনে নাই। পক্ষান্তরে যাহা গণা যায় না, মাপা যায়, তাহার লক্ষণ বিভাজ্যতা। এক ঘটি জল বা এক ফোঁটা জল, শতখণ্ডে বিভাগ করিতে পারি; কাজেই বলি,—দেড় সের বা সাড়ে তিন ছটাক, বা [illegible] পাঁচ কাঁচ্চা। ফুল, [illegible], হাতী, ঘোড়া, বিভাজ্য দ্রব্য নহে; সেই জন্য গণনাযোগ্য। আর, জল, তেল, দুধ, ঘি প্রভৃতি বিভাজ্য; এই জন্য গণনাযোগ্য নহে।

এইখানে প্রশ্ন উঠে যে, জল যদি বস্তুতই বহুসংখ্যক অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহাকেও গণনাযোগ্য না বলি কেন? এক ফোঁটা জলকে কোটি খণ্ড, কোটি কোটি কোটিখণ্ডে ভাগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যখন জলের অণুতে ঠেকে, তখন সেই অণুকে ত আর ভাগ করা চলিবে না; জলের অণুকে দু' টুকরা করিলে তখন তাহার জলীয়ত্ব থাকিবে না; উহা অন্য পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হইবে। তাহা হইলে গরু, ভেড়া, বা ফুল, ফল, যে হিসাবে গণনাযোগ্য, জলের অণুও সেই হিসাবে গণনাযোগ্য; এবং আমরা এক ফোঁটা জলে যদি অণুর সংখ্যা গণিতে পারিতাম, তাহা হইলে জলের পরিমাণনির্দ্দেশেও ভুলের সম্ভাবনা থাকিত না।

ইহা ঠিক্ কথা। জল যদি অণুর সমাবেশে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহার অণুর সংখ্যা গণনা করিয়া উহার পরিমাণ অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করা অসাধ্য নহে। তবে গণা হয় না কেন? অণুগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। উহাদিগকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না; যদি কখনও এরূপ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়, যাহাতে অণুগুলি ইন্দ্রিয়-গোচর হইবে, তখন যাহার সময় আছে ও ধৈর্য্য আছে, সমুদ্রের জলে কত অণু আছে, গণিয়া বলাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। সম্প্রতি কিন্তু গণনার উপায় নাই; আন্দাজ করিয়া সংখ্যা-নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছে বটে, এবং সে আন্দাজেও বেশী ভুল নাই; কিন্তু একটি একটি করিয়া নির্ভুল গণনা সম্প্রতি অসাধ্য। কাজেই আমরা মাপিয়া জলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করি। তাহাতে একটু ভুল থাকে, সে ভুলটুকু আমরা গ্রাহ্য করি না।

গণনা যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে মাপের আশ্রয় লওয়াই চলিত প্রথা। যাহার অপরিসীম ধৈর্য্য আছে, সে চাউল কিনিতে গিয়া একটি একটি করিয়া গণিয়া চাউল কিনিলে, কোনও দোকানদার তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না; কিন্তু তত ধৈর্য্য কাহার আছে! আমরা চাউলের কণা গণিয়া লই না। মণ, সের, ছটাক, বা কাঁচ্চা পর্য্যন্ত ওজন করিয়া বা মাপ করিয়া দেখিয়া লই।

কাচ্চার নীচে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি না। কাচ্চার নীচে গেলে ঠকিতে হয় কম বটে, কিন্তু সেখানে চাউলের মূল্য অপেক্ষা সময়ের মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। আকাশের তারা, নদীর বালি আর বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার গণনা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই কার্য্যে লিপ্ত থাকুন। সাধারণ মনুষ্যের উহাতে কাজ নাই।

এইখানেই পরমাণু-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম, কিন্তু আজকাল যে নূতন কথাটা উঠিয়াছে, তাহা একেবারে উল্লেখ না করিলে আপনারা বলিবেন, কিছুই হইল না; কাজেই আরও একটু কষ্ট দিব।

রসায়নবেত্তারা যে সকল মূল পদার্থের পরস্পরের যোগে যাবতীয় পার্থিব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশীটি। কাজেই পরমাণুর মধ্যেও সত্তর আশী রকমের জাতিভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মানবসমাজে যেমন জাতিভেদ সকলের ভাল লাগে না, পরমাণু-সমাজেও সেইরূপ জাতিভেদ ভাল দেখায় না। "কৈলাস শিখরমধ্যে যত ধাতু ছিল, তার মধ্যে স্বর্ণ আসি লৌহকে নিন্দিল"—কৈলাস পর্ব্বতে ভূতগণের মধ্যে এই যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, জাতিভেদ তাহার মূলে। এই জাতিভেদ উঠাইবার জন্য কোনও Social Conference বসিয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহা লেখে না। এই জাতিভেদ বিধাতাপুরুষের অভিপ্রেত, ইহা মনে করিতে ক্লেশ হয়। কাজেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা সাম্যবাদী, তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন, এই পরমাণুবাদে কোথাও কি একটা খট্‌কা আছে। যে সকল পরমাণু একজাতির অন্তর্গত, তাহারা কেবল ঘোঁট করিয়া দল পাকাইয়া বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ মনে করিলে বিধাতাপুরুষে কোনও দোষ অর্শে না। এই জন্য সাম্যবাদীরা আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে, যে দিন প্রতিপন্ন হইবে পরমাণু কেবল এক রকম—মূলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ নাই। পরমাণুকে একেবারে অবিভাজ্য মনে করিলে কিন্তু জাতিভেদ থাকিয়া যায়, অথচ অণু ভাঙ্গিলে যেমন পরমাণু হয়, সেইরূপ পরমাণু ভাঙ্গা চলে কি না, তাহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল না।

এ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল না; কিন্তু এখন উপস্থিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ তাঁহার আবিষ্কৃত কতিপয় নূতন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন, এই আমি এক নূতন

প্রকার জড় কণিকা আবিষ্কার করিয়াছি ; ইহার নাম [illegible] [illegible]cyl। এই জড় কণিকার সমবায়ে বিবিধ পরমাণু নির্ম্মিত হইয়াছে। [illegible] ক্রুক্‌সের কথায় তখন কেহ কাণ দেয় নাই। এখন কিন্তু আর না দিলে চলিতেছে না। নানা দেশের নানা পণ্ডিত নানা পথে চলিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেন। সেই কাহিনী বিবৃত করিবার এই সময় নহে। এখন দেখা যাইতেছে, পরমাণু ভাঙ্গা খুব সহজ। এতকাল জানিতাম, হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। এখন দেখা যাইতেছে, হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করা যাইতে পারে। এক এক টুক্‌রা আবার কত সূক্ষ্ম! সাত আট শত টুকরা একযোগে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হয়। হয় ত এই কণিকাগুলির একত্র যোগেই হাইড্রোজেনের পরমাণু গঠিত হইয়াছে। কেবল হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন, যাবতীয় পরমাণু—দ্বিজোত্তম স্বর্ণ হইতে কালা নিগার লোহা পর্য্যন্ত—সকলের পরমাণু ভাঙ্গিয়াই সেই একই কণিকা বাহির হইতেছে। এই কণিকাগুলির চাল চলন বড় অদ্ভুত। এত দিন আমরা অণু পরমাণুকেই চপল বলিয়া জানিতাম। তাহারা স্থির থাকিতে চায় না, ছুটিতে চায়। এই ঘরের বায়ুরাশিতে যে সকল অণু আছে, তাহারা রেলগাড়ীর অধিক বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু এই কণিকাগুলির চপলতার কাছে উহা কিছুই নহে। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল চলা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। বস্তুতই ইহারা ঐরূপ বেগে অনেক সময় ছুটিয়া চলে। রেডিয়ম্ নামক নবাবিষ্কৃত ধাতুর কথা আপনারা শুনিয়াছেন ; উহার পরমাণুগুলি বড়ই ভঙ্গপ্রবণ, ঐ পরমাণু কেবলই ভাঙ্গিতেছে। তাহা হইতে ঐ সকল কণিকা কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারই বা আবার বেগ কত! পরমাণুমাত্রের ভিতর এই সকল কণিকা শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে আট্‌কান আছে ; কিন্তু তাহারা কি আট্‌কান থাকিতে চায়! তাহারা ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াও কেবলই বেগে ঘুরিতেছে ; আর আকাশের সমুদ্রে ধাক্কা দিয়া আলোকের ঢেউ তুলিতেছে। সুবিধা পাইলেই উহারা ছটকিয়া বন্ধনমুক্ত হইয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া মহাবেগে ঋজুপথে আকাশ ভেদ করিয়া চলে। নিকটে একটা চুম্বক ধরিলে তাহাদের পথ বাঁকিয়া যায়। নিরেট ধাতু পদার্থকে ভেদ করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। এইরূপ তাহাদের বিচিত্র লীলা। আবার বিচিত্র এই যে, ঐ সূক্ষ্ম কণিকাকে জড় পদার্থ বলিব কি না, তাহাই বলা দুষ্কর। যাবতীয় জড় পদার্থের পরমাণু ঐ

সূক্ষ্ম কণিকাতে গঠিত ; উহাই জড় পদার্থের উপাদান। ঐ কণিকাকে জড় বলিব কি না বিষম সমস্যা ; উহাকে জড়-কণা না বলিয়া তড়িৎ-কণা বলাই সঙ্গত। যে তাড়িত বা Electricity লইয়া মানুষ এই শত বৎসর ধরিয়া এত কারখানা করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ কি, কিছুই জানিতাম না। এখন দেখিতেছি, জড় পরমাণুর এই সূক্ষ্ম কণিকা সেই তাড়িতের সহিত অভিন্ন। তাড়িতের স্বরূপ লইয়া এতকাল একটা ঝগড়া ছিল ; এককালে পণ্ডিতেরা বলিতেন, উহা এক রকম জড় পদার্থ। একালের পণ্ডিতেরা একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; বলিতে লাগিয়াছিলেন, তাড়িত কি ধারার পদার্থ তাহা জানি না,—তবে উহাকে কাজে খাটাইতে পারি বটে। এখন উল্টাইয়া বলিতে হইতেছে, তাড়িত জড় পদার্থ হউক না হউক, জড় পদার্থ তাড়িত-কণায় নির্মিত। জগতে কেবল তাড়িতই আছে ; উহাই জড় পদার্থের উপাদান। কিন্তু আমার ভাষা ক্রমশঃ দুর্গম হেঁয়ালিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে ; বিজ্ঞান যদি বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহা হইলে উহা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আমি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িতে আসিয়াছি ; অজ্ঞানের আলোচনার জন্য আপনারা আমাকে ডাকেন নাই। অতএব এইখানেই সমাপ্তি শ্রেয়স্কর। *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সুকুমারী। *

ও মা কমলরেণু ! মোহন বালিকা,
তুই যেন ক্ষুদ্র অস্ফুট মল্লিকা,
কিংবা মনোহরা গোলাপকলিকা
বাসন্তী ফাল্গুনে ;—ও তোর সৌন্দর্য্যে
কি যে যাদু আছে ; ও তোর মাধুর্য্যে
কি যে শোভা আছে, পারি না বলিতে ;
হেন দৃশ্য আমি হেরি নি মহীতে !
শ্রাবণ-বৈকালে নয়ন-উজালা
একগাছি তুই বকুলের মালা !
দুর্গাপূজা-দিনে, শারদ উৎসবে,

* বরাহনগর শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটে গত বৈশাখে পঠিত।

দেবীর শ্রীকণ্ঠে হাসিছে নীরবে
যেন একগাছি শিউলীর হার!
হৃদয়-আঁধারে তুই মা আমার
প্রফুল্ল জোৎস্না; বাতায়ন দিয়া
তরল আহ্লাদ পড়িছে ঝরিয়া!
বল বল মোরে, লো সুষমাময়ি!
কোন্ পুণ্যরাজ্যে লো আনন্দময়ি!
ছিলি লুকাইয়া?—আমি ভাগ্যবান,
হেরি তোরে আজি জুড়াইল প্রাণ!
কি মধুমাখানো কথাগুলি তোর!
আধ' আধ' ভাষে ফুলরেণু মোর!
কথা ক'স যবে, আনন্দ-ঝরণা
বহে যায় মরি!—সুন্দর ময়না,
কিংবা লাল মুরী, টিয়ে, চন্দনা
হৃদি-পিঞ্জরের, তুই মা আমার!
মরি মরি কিবা সুষমা অপার!
ফল-ফুল-পত্রে হৃদয়ের শাখী
ভরি যায়, ওরে বসন্তের পাখী!
তুই যবে বসি' পল্লবের মাঝে
গান গাস্, আহা কোকিলার সাজে!
আঁখি যায় ভরি আনন্দ-বারিতে
তোর হাসিমুখ হেরিতে হেরিতে!
আঁখি মুদি আসে, হ'য়ে যাই চুপ,
ওই চাঁদমুখে হেরি অপরূপ
বালিকা রাধার অনিন্দ্য মূরতি!
করি আমি ধ্যান, নেত্র-জলে তিতি,
কিশোরী রাধার কিশোর-বদন!
মা—মা—মা, বলিয়া বন্দি ও চরণ।
নারদের মত, করে লয়ে বীণা
করি তোর স্তুতি, অয়ি দেবাঙ্গনা!
চারিধারে মরি ফুটে উঠে ফুল,
যমুনা-তরঙ্গ নাচিয়া আকুল!
চারিধারে মরি রম্য উপবন,
চারিধারে মরি নব বৃন্দাবন,
তারি মাঝে তোর মূরতি মোহন

* "সুকুমারী" একটি দশ বৎসরের বালিকা, তাহার আদরের নাম "ফুলরেণু"।

জাতিভেদ।

আমি বেশ বুঝে দেখ্‌লাম যে, কোনও নৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নের কোনও একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। একটা দিকে কিছু বল্‌লেই দেখা যায় যে, ঠিক উল্টা দিকে অন্ততঃ বিস্তর বেশ কিছু বল্‌বার আছে।

ধরুন, এই একটা প্রশ্ন—জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ। এই জাতিভেদ জিনিসটা, দেখা যায়, ইংরাজ সমাজেও আছে; মুসলমান সমাজেও আছে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষে এটা যে আকারে আছে, এবং পুরাকাল থেকে চলে আস্‌ছে, সে আকারে বোধ হয় এটা পৃথিবীর কুত্রাপি নাই।

এখন সে ঘটনাবলি কি, যার চক্রে পড়ে' ভারতবর্ষে এই ব্যাপারটা এই রকম আকার ধারণ ক'রেছে? তা নির্দ্ধারণ কর্ত্তে গেলে পুরাতত্ত্ব ও শাস্ত্র বেশ মনোযোগসহকারে অনেক বৎসর ধরে' পড়্‌তে হয়; তার পরে হয় ত এটা 'কষে' বাহির করা যেতে পারে। কিন্তু যখন আমার ঐ দুইটার মধ্যে একটাও ভাল করে' পড়া নাই, তখন সে বিষয়ে কথা কহিলে ভুল না হওয়ার চেয়ে ভুল হওয়াই বেশী সম্ভব।

তার পরে এই প্রথাটা কোন্‌ সময়ে কি ভাবে, এত দিন ধরে' হিন্দু সমাজের মধ্য দিয়া বয়ে' [illegible], এবং কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা দ্বারা প্রথাটা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ হয়েছে, তা বিচার করা সম্ভব হ'লেও, সে বিষয়েও কোনও একটা সিদ্ধান্ত, বিশেষ জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি না।

আমাদের আসল বিচার্য্য বিষয়, জাতিভেদটা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আকারে বা অন্য কোনও সম্ভব আকারে রাখা উচিত, না একেবারে উঠিয়ে দেওয়া উচিত; আর যদি তা উঠিয়ে দেওয়াই উচিত হয়, তা হ'লে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না?

প্রথমতঃ প্রমাণের ভার তাঁর উপর, যিনি প্রথাটাকে উঠিয়ে দিতে চান। তিনি একটা বহুপুরাতন প্রচলিত প্রথা ওল্‌টাতে চান। তিনি ভাঙ্গতে চান। তিনি বাদী।

তাঁর পক্ষে কি কি বক্তব্য, তা বুঝে দেখা যাক্‌। তাঁর মতে, জাতিবিভাগ জিনিসটা মন্দ, এই এই কারণে;—

(১) এক জন মানুষ যে আর এক জন মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তা কর্‌বার তার কোনই স্বত্ব নাই,—যদি তার নিজের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য নয়। যদি সে চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী হয়, সে ঘৃণার্হ। আর শূদ্র শূদ্র বলিয়াই নীচ নয়। সে যদি সাধু, সচ্চরিত্র ও পরহিতব্রতী হয়, ত সে পূজার্হ।

(২) যে প্রথায় একটা শ্রেণীকে অমীকার্য্যরূপে শ্রেষ্ঠ, আর একটা শ্রেণীকে অমীকার্য্যরূপে হীন বলে' নির্দ্দেশ করে, সে প্রথায় শেষোক্ত শ্রেণীর একটা হতাশা ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর একটা দম্ভ এনে দেয়। ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। সকলেই যদি জানে যে, কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কার্য্যের উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে, যে অত্যন্ত নীচ বংশে জন্মগ্রহণ কর্‌লেও নিজের চেষ্টায় সে প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড বা ওয়াশিংটন হ'তে পারে; আবার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ কর্‌লেও সে নিজের কার্য্য দ্বারা পশুগণ অপেক্ষাও ঘৃণ্য জীব হ'তে পারে; তা হ'লে সকলের ভাল হ'বার চেষ্টা অধিক হওয়াই সম্ভব।

(৩) জাতিবিভাগ উঠে গেলে কার্য্য-নির্ব্বাচনের স্বাধীনতার পরিধি বর্দ্ধিত করা হয়। এক জনকে যতই বেশী সুবিধা দেওয়া যায়, ততই সেটা তার পক্ষে হিতকর হয়, এবং সে যদি কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, সেটা সমাজের পক্ষেও হিতকর হয়।

(৪) যদিই জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় হয়, [illegible] বর্ত্তমান আকারে সেটা রাখা উচিত নয়। কারণ, জাতিভেদের যদি কোন sound principle থাকে, তাহা এই যে, শ্রেণীবিশেষের নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলির ভিত্তির উপর সে গঠিত। কোনও শ্রেণীর নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলির বিরোধী কিছু যদি সেই শ্রেণীর কেহ করে, তা'কে সেই শ্রেণী হ'তে বর্জ্জন না কর্‌লে সে শ্রেণী বিশুদ্ধ থাকে না। বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ মুর্গী খেলে পতিত হয়, কিন্তু চোর হ'লে পতিত হয় না। এরূপ নিয়ম সম্পূর্ণ artificial এবং এটা sound principle নয়। আবার নিম্নতর শ্রেণীর কেহ যদি উচ্চতর শ্রেণীর পক্ষে নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলি কর্‌বার যোগ্যতার কোনও প্রমাণ দেয়, তা হ'লে তাহাকে সেই উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়ে নেওয়া উচিত।"

প্রতিবাদীর উত্তর।

প্রথমতঃ বাদীর যুক্তিখণ্ডন।

(১) বাদীর Sentiment মতে সব মানুষ সমান; এবং তার নিজের ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছে যে, তাকে পূজা কর্‌ব, কি ভাল বাস্‌ব, কি ঘৃণা কর্‌ব। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, সত্যই কি সব মানুষকে ঈশ্বর সমান করে' সৃজন করেছেন? কি সমাজই (পৃথিবীর যে কোন সমাজ) সমান সুবিধা দিয়েছে? ঈশ্বর এক জন মানুষকে জন্মান্ধ, কদাকার, রুগ্ন, বা উন্মাদ করে' সৃজন করেছেন; আর এক জনকে শারীরিক ও মানসিক সব রকম সুবিধা দিয়াছেন। আবার জন্মগ্রহণের পরে, কোনও মানুষকে সমাজ দরিদ্র করে' কুসঙ্গের মধ্যে ফেলে রেখেছে। আর এক জনকে জন্মাবধি প্রভূত অর্থ ও জ্ঞান যোগাড় করে' দিয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এই সব বিষয় দ্বারা কতক গঠিত হবেই; কেবল তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের (excercise of the free will) এর উপর নির্ভর করবে না। তবে এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে—বাদী যে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর মানুষের সম্মান স্থাপিত কর্‌তে চান, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের অর্জ্জিত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। অন্যরূপ সৃষ্ট হ'লে, বা অন্যরূপ ঘটনাচক্রে পড়্‌লে, যে আজ পূজার্হ, সে হয় ত ঘৃণার্হ হ'ত; আর যে ঘৃণার্হ, সে হয় ত পূজার্হ হ'ত। চোরের সংসর্গে পড়ে', বা দারুণ দারিদ্র্যে পতিত হ'য়ে যে চোর হ'য়েছে, সে হয় ত অন্যরূপ অবস্থায় সাধুপুরুষের ন্যায় সম্মান লাভ কর্‌ত; যে উচ্চ-শিক্ষা পেয়ে এক জন বিদ্বান্ বলে আজ শ্রদ্ধেয়, সে তার পিতার দারিদ্র্যের দরুণ যদি শিক্ষা পা'বার সুযোগ না পেত, তা হ'লে হয় ত মূর্খ বলে' অবজ্ঞাত হ'ত। মানুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি স্বোপার্জ্জিত আর কতখানি প্রাপ্ত, তা কি কেহ বিচার করে' তাহাকে মান্য করে বা কর্‌তে পারে?—তবে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব রইল কোথায়?

বাদী বল্‌বেন যে, হাঁ, ওটা একটু গোলমেলে ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায় বটে; ঠিক বিচার সম্ভব নয় বটে। তবে একটা অবিচার অবশ্যম্ভাবী বলে' কি আর একটা অবিচার তাহার উপরে চাপা'ব?

এখন ওটা যে অবিচার, সেটা একটা প্রবৃত্তি (Sentiment) মাত্র। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, কি মানুষের একটা স্বভাবগত ধারণা, তা ঠিক বলা যায় না। তবে আপাততঃ এই রকম একটা প্রবৃত্তি দাঁড়িয়েছে।

টে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে যুক্তিস্বরূপ গ্রহণ করে; যদি বাদী তর্কটা খাড়া করেন, তা' হ'লে তিনি যা'কে আক্রমণ করছেন, তা'ও একটা প্রবৃত্তি। বংশের মর্য্যাদা করাও একটা সার্ব্বজনীন প্রবৃত্তি। যদি শুনি, ইনি চৈতন্য দেব বা অদ্বৈত মহাপ্রভুর সন্তান, অমনই তাঁ'র প্রতি একটা প্রণামের ভাব এসে পড়্বেই। ব্রাহ্মণগণের সেই কুলে জন্ম, যাঁ'তে ব্যাস, বাল্মীকি, কপিল, গৌতম ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তা'তে ব্রাহ্মণের উপর একটা ভক্তির ভাব আপনা হ'তেই এসে পড়ে না কি? এ প্রবৃত্তি বোধ করি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। বিলাতে এক জন hereditary nobleএর ঐশ্বর্য্য দেখে লোকে মাথা নীচু কর্বে; কিন্তু যদি কেহ সে ঐশ্বর্য্য নিজের ক্ষমতায় অর্জ্জন করে, তা'কে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রশংসা না করে, বরং upstart বলে' অবজ্ঞা কর্বে। দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি অপেক্ষা এই প্রবৃত্তিই বেশী বলবতী। কেন না, এ প্রবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিকে ছাপিয়া উঠ্তে পারে ও ওঠে।

তবে, যে ব্রাহ্মণ নীচ কার্য্য করে, আর যে ব্রাহ্মণ উচ্চ কার্য্য করে, তাঁরা দু'জনেই যে একই রকম মান পাইবার যোগ্য, তাহা বল্‌ছি না। শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য, যে ব্রাহ্মণ যে পরিমাণে নীচ কার্য্য করবে, সে সেই পরিমাণে তাহার বংশগত মর্য্যাদা হারা'বে। আর শূদ্র যে পরিমাণে উচ্চ কার্য্য কর্বে, সেও সেই পরিমাণে আপনাকে ঊর্দ্ধে ওঠা'বে। কিন্তু তাই বলে' তা'দের সম্মানের দাবীর মধ্যে বংশমর্য্যাদার যে একটা স্থান নাই, তাহা নহে। এই initial advantage বা disadvantage পাশ্চাত্য সাম্যের ধারণার সঙ্গে খাপ না খেতে পারে। কিন্তু সেটা জগতের চারি দিকেই আছে। এই ধরুন যেমন, সম্মানের চেয়ে বেশী দরকারী জিনিস ত টাকা? সেটা আগে বাদী সকলকে সমান ভাগ করে' দিন, শক্তি সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, এ সব সকলকে সমান করে' ভাগ করে' দিন, তার পরে তার চেয়ে সামান্য বিষয় এই বংশমর্য্যাদার উপর যেন তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

বাদীর দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, এ কথা সত্য যে, এই প্রথা ব্রাহ্মণের একটা দম্ভ, আর শূদ্রের একটা অসন্তোষ বা হতাশার ভাব জন্মে দিতে পারে। এই দুইটাই এক হিসাবে evils, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ

যদি জানে যে, সে মহৎ কিছু না করেও বা খারাপ কাজ করেও সমাজে, বা শূদ্র ভালো কাজ করেও অবজ্ঞেয়, তা হ'লে সেটা এক পক্ষে আলস্য ও অন্য পক্ষে হতাশা এনে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেরূপ হয় তখনই, যখন পরস্পরের প্রতি একটা বিরোধের ভাব থাকে। যদি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জানে যে, তা'দের পরস্পরের মধ্যে কোনও Competition নাই, তাহাদের Competition নিজের নিজের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তা হ'লে কোনও অশুভ ফল হয় না। তবে ব্রাহ্মণ শূদ্রের যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে এক পক্ষে অনুচিত গর্ব আর এক পক্ষে অনিষ্টকর হতাশা এনে দিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই গর্ব সময়ে সময়ে আলস্যের হেতু না হ'য়ে তা'র মঙ্গলের উপায় হ'তে পারে। ব্রাহ্মণ এরূপও গর্ব্ব কর্‌তে পারে যে, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান—ব্রাহ্মণের অযোগ্য কাজ আমি কখনও কর্‌ব না। তা'তে তা'র বংশমর্য্যাদা তা'কে অনেক সময় হীন কাজ থেকে রক্ষা করে। তা'র একটা চক্ষুলজ্জা বেশী হয়। "আমি অমুকের সন্তান, আমি এই হীন কাজ কর্‌ব? কখন না।" লোকে আবার গভীর দুঃখে সেই যুক্তি তার সান্ত্বনার কাজও কর্‌তে পারে। হিন্দু জাতির যদি গৌরব কর্‌বার কিছুই না থাক্‌ত, সেটি কি তা'র মঙ্গলের হেতু হ'ত?—শূদ্র সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না।

(৩) বাদীর তৃতীয় যুক্তি প্রায়ই ঠিক। তার বিপক্ষে এইমাত্র বক্তব্য যে, এক দিকে যেমন পরিধি বৃদ্ধি করা যায়, অন্য দিকে পরিধি একটু কমানো হয়। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার যদি কর্ম্মকারের ব্যবসা ছেড়ে কুম্ভকার হন, তা হ'লে বৈদ্যনাথ কুম্ভকার, বিশ্বনাথের নিষ্পেষণে হয় ত উত্তম কুম্ভকার হওয়া দূরে থাকুক—না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তম জিনিস; কিন্তু অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিষ্টের হেতু হ'য়ে দাঁড়ায়। তা'তে অনেক সময় একটা প্রতিভা প্রস্ফুটিত হ'বার যথেষ্ট উপায় পায় না। খুব ঘেঁষাঘেঁষি আলু পুঁত্‌লে উৎপন্ন আলুগুলি পরস্পরের নিষ্পেষণে ছোট হয়। আর দূরে দূরে পুঁত্‌লে তা'রা বাড়্‌বার সুযোগ পায়। অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য কর্‌লে, অনেক ব্রাহ্মণ, যাঁরা নিজের পরিধির মধ্যে মহৎ হ'তে পার্‌তেন, তাঁরা অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুষড়ে যেতে পারেন; অথচ যে শূদ্রেরা নিজেদের পরিধির মধ্যে 'কাজের' হ'তে পার্‌তেন, তাঁরাও হয় ত এ চক্রের মধ্যে এসে কোনও সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন না।

(৪) বাদীর চতুর্থ যুক্তির বিপক্ষে একটি কথাও বল্‌বার নাই।

কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন। কিন্তু মুর্গী খেলে 'জাত' যায়, (যদিও সেটা আজকাল বড় যায় না) কিন্তু সে চোর হ'লে জাত যায় না। ইহা আইনবাক্য। ইহা একেবারে উন্মাদের প্রলাপ। তবে তাঁর পক্ষে একটা কথা বলা যায় যে, সম্ভবতঃ মুসলমান-রাজত্বকালে এ রকম বিধান ব্রাহ্মণেরা কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমান জাতিকে একটা অসভ্য জাতি বিবেচনা কর্‌তেন, এবং তাদের সঙ্গে মিশে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অশুভকর বিবেচনা কর্‌তেন। তাই তাঁরা যাবতীয় মুসলমান-প্রথা বর্জ্জন করে হিন্দুকে মুসলমান হ'তে একেবারে পৃথক রাখ্‌বার জন্য এই আচারের আইনগুলি করে' সেগুলিকে শাস্ত্র বলে' জাহির করেছিলেন। তাঁরা আর্য্য-রক্ত বিশুদ্ধ রাখ্‌তে যে বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাতন ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এখন বাদীর যুক্তি সম্বন্ধে যা বক্তব্য, তা উপরে বলা গেল। বাদীর উক্তির মধ্যে কতক কতক সত্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু মিল বলেছেন যে, সামাজিক প্রশ্ন সব অঙ্কশাস্ত্র নয়। এ সমস্যাগুলির দু' দিকেই কিছু না কিছু বল্‌বার আছে। তা'দিগকে ওজন করে' বেছে নিতে হবে।

এখন দেখা যাক যে, জাতিভেদের পক্ষে কি কি যুক্তি।

জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় এই এই কারণে ;—

(১) Principle of heredity. এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তর্কই নাই যে, বংশ-পরম্পরায় গুণ বা দোষ, পিতা হইতে পুত্রে বর্ত্তায়। এর উপরে principle of selection (বা principle of rejection) লাগিয়ে একব্যবসাবলম্বী বংশের বহু পুরুষ পরে, সেই ব্যবসা সম্বন্ধে সেই বংশজাত ব্যক্তির একটা উৎকর্ষ জন্মায়। বংশপরম্পরায় ক্রমাগত ব্যবসায়-পরিবর্ত্তনে সে উৎকর্ষ জন্মাবার সমান সুযোগ হয় না। এ বিষয়ে যদি কাহারও দ্বিমত থাকৃত, তা হ'লে এ বিষয়ে যুক্তি দেওয়া যেত। কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(২) সন্তোষ। এই Systemএ আপন আপন শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রেখে পরস্পর শ্রেণী-সম্বন্ধে একটা সন্তোষ বা resignation এনে দেয়। যদি শূদ্র জানে যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের barrier পার হ'বার নয়, তা'তে তার একটা resignationএর ভাব আসে, যা' সমাজের শান্তির জন্য হিতকর। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ, অশান্তি ও বিদ্রোহের ভাব, আর ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ সন্তোষ, এ যুক্তির

জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। ইংলণ্ডে মফঃস্বলে এখন কৃষি মজুর (farm labourer) পাওয়া দুরূহ। সব মজুররা উচ্চতর professionএ যা'বার জন্য রাজধানীতে বা কোনও অন্য বৃহৎ নগরে গিয়ে প্রায় উপবাস করতে প্রস্তুত, অথচ কৃষি মজুরের কাজ করতে স্বীকৃত নয়।

(৩) তৃতীয় যুক্তি এই যে, শ্রেণীবিভাগ পৃথিবীতে অনিবার্য্য। জাতি উন্নত হ'লেই এক একটা শ্রেণীকে সে এক এক রকম বিশেষ কাজে নিযুক্ত করে। জাতির আদিম অবস্থায় সকলেই নিজের নাপিত, ধোপা কর্ম্মকার ইত্যাদি থাকে। পরে এই সব ব্যাবসায় পৃথক শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে যায়। amœba সমস্ত শরীর দিয়ে নিশ্বাস ফেলে, খায় ও গমন করে। কিন্তু উচ্চতর জানোয়ারের (ধরুন যেমন কুকুর) নিশ্বাস ফেল্‌বার, খা'বার ও যা'বার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। উন্নতির দস্তুরই ঐ। জাতি আরও অগ্রসর হ'লে এই কাজগুলি Heriditary হ'বার প্রবণতা জন্মে। তার একটা কারণ এই যে, পিতা পুত্রকে যদি শিক্ষা দিতে চান ত তাঁর নিজের কাজে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য হয়। কারণ, সে শিক্ষা তিনি নিজে দিতে পারেন। তার উপরে পিতা যেরূপ আগ্রহে ও যত্নে নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেন, এক জন অন্য শিক্ষক কখনই সেরূপ যত্নে ও আগ্রহে তাহাকে শিক্ষা দেয় না। ইহা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হ'লে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। যতক্ষণ না প্রমাণ হয় যে, সে শক্তি-ব্যয় জাতির পক্ষে নিশ্চিতরূপে হিতকর, ততক্ষণ সে শক্তি অন্য দিকে অনর্থক ব্যয় করা বিধেয় নয়।

(৪) যদি জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়, ত সেটা ভারত-বাসীর পক্ষে একটা অসাধ্য ব্যাপার। সেটা জাতীয় characteristic-এর সঙ্গে খাপ খায় বলে'ই সেটা এ দেশে এত বদ্ধমূল হয়েছে। সেটা এত বদ্ধমূল হ'য়েছে যে, এত শতাব্দীর বিদেশীয় শাসন, তা'কে বিনাশ করা দূরে থাকুক, তা'কে দৃঢ়তর করে'ছে। এই জাতিভেদই এতদিন হিন্দুকে হিন্দু রেখেছে, এত বিপর্য্যয়েও হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করতে পারে নাই।

এটা একটা হঠাৎ মনে আসে বটে যে, ইয়ুরোপীয়েরা এই জাতিভেদ না রেখে যখন এত দূর উন্নত হ'য়েছে, এবং তাদের মধ্যে একটা জাতি (ইংরাজ) আমাদের জয় করে' নির্ব্বিরোধে শাসন করছে, তবে বুঝি

তা'দের মত জাতিভেদ না রাখ্‌লেই ভারতবাসী তা'দের সমান উন্নতি লাভ কর্‌তে পারে। এ যুক্তি সব ইংরাজি-প্রথা সম্বন্ধেই খাটে। কে বল্‌বে যে, এ উন্নতি তা'দের জাতিভেদ না থাকারই ফল, তা'দের অন্য কোনও প্রথার ফল নয়। কিংবা কে বল্‌বে যে, ইহা ইংরাজের কোনও সামাজিক প্রথার ফল, এবং এ উন্নতি ও এ সব প্রথা ইংরাজদের জাতিগত energyর ফল নয়। এখন কি তবে ভারতবাসীর এই কর্ত্তব্য যে, তা'দের সব প্রথা উল্টে দিয়ে ইংরাজদের সব প্রথাই নিতে হ'বে?

এক জাতির পক্ষে যা হিতকর, আর এক জাতির পক্ষে তা হিতকর নাও হ'তে পারে। বিশেষতঃ ইংরাজ ও হিন্দুর national characteristics এত বিভিন্ন যে, অনেক সময়ে সম্ভব যে, এক রকম প্রথা দু' জাতির পক্ষে হিতকর নয়। ইংরাজ-কৃষি-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। তবে ইংরাজ সামাজিক প্রথাই হিন্দুসমাজের পক্ষে খাট্‌বে, তার প্রমাণ কি? এ প্রথা বর্জ্জন করে' বিলাতী প্রথা অবলম্বন করা কি একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা নয়? হয় ত যা ছিল, তাও হারাব; যা নাই, তাও পা'ব না। একটা জাতি নিয়ে experiment করা কি ভয়ঙ্কর!

তবে জাতিভেদ এখন যে ভাবে বর্ত্তমান আছে, সে ভাবে সে কখনই থাক্‌তে পারে না। আর সেটা ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ধীরে ধীরে জাতিভেদকে সঙ্গততর ভিত্তির উপর খাড়া করা। একেবারে এমন একটা জাজ্বল্যমান জীবন্ত জিনিসকে উল্টিয়ে দেওয়া ভাল নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত reformation not revolution. আজ ৪০০০ বৎসর ধরে' যে প্রথা চলে আস্‌ছে, যা'তে হিন্দুকে হিন্দু বলে' গৌরব কর্‌তে দিচ্ছে, যা'তে ভারতকে ব্যাস, বাল্মীকি, কপিল দিয়াছে, তা'কে বিনাশ করা revolutionও নয়, এ vandalism.

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শাক্যবংশ ও কপিলবস্তু।

'মহাবস্তু-অবদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়,— পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতার বংশ-ধুরন্ধর মহারাজ সুজাত বা সঞ্জাত সাকেত-রাজধানী অযোধ্যা নগরে রাজদণ্ড পরিচালিত করেন। তাঁহার ওপুর, নিপুর, করকন্তক, উল্কামুখ ও হস্তীশীর্ষ নামে পাঁচ পুত্র ও শুদ্ধা, বিমলা, বিজীতা, জলা ও জলী নামে পাঁচটি কন্যা জন্মে। এতদ্ব্যতীত জেন্ত নামে তাঁহার এক অবৈধ পুত্র ছিল। কোনও সময়ে রাজা জেন্তের মাতার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর দিতে চাহিলে, সেই বারবিলাসিনী-দুহিতা এক চতুরা ভিক্ষুকীর পরামর্শে রাজ-সমীপে নিবেদন করে, "মহারাজ! দাসীর প্রতি যদি যথার্থই সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার পুত্র-পঞ্চককে নির্ব্বাসিত করিয়া জেন্তকে আপনার রাজ্যাধিকারী করুন।" সত্যসন্ধ রাজা জেন্তীর প্রার্থনা-শ্রবণে মর্ম্মবেদনায় বিবশ হইয়া পড়িলেন; অপার পুত্রস্নেহে হৃদয় ফুটিত হইবার উপক্রম হইলেও প্রতিশ্রুতি-প্রত্যাহারের কোনও উপায়ই দেখিতে না পাইয়া মূঢ়তা-প্রণোদিত বরদান-সংকল্পকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে প্রজাবৃন্দ রাজকুমারগণের বিবাসন ও দাসী-পুত্রের সম্বর্দ্ধনবার্ত্তা শ্রবণে, কুমারবৃন্দের আভিজাত্যোচিত গুণগ্রাম ও উদারাশয়তায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অনুগমনে উদ্যুক্ত হইল। এই সমাচার রাজার গোচরীভূত হইলে, তিনি কথঞ্চিৎ চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া, তাহাদিগের অভিলাষানুযায়ী অশ্ব, যান, বসন, ধন, রত্ন রাজকোষ হইতে উপঢৌকন দিয়া গুণ-পক্ষপাতিতাবশতঃ তাহাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিলেন। সন্নিহিত কাশী-কোশল রাজ্যের রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তদীয় রাজ্যে বসি করাইবার জন্য নির্ব্বাসিত কুমারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে, কাশী-কোশলের অধিবাসিগণও তাঁহাদিগের গুণে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া রাজা অবশেষে স্বীয় প্রভুত্বনাশভয়ে প্রমাদ গণিলেন;

এবং পরিশেষে একান্ত অনুরাগপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এখান হইতেও অনেকে কুমারগণের অনুবর্ত্তন করে। এইরূপে বহু অনুচর সমভিব্যাহারে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে, অবশেষে হিমালয়-সন্নিহিত গৌতম-গোত্রীয় কপিল নামক পরমজ্ঞানী ও উগ্রতপা ঋষি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রমণীয় আশ্রমের প্রান্তস্থিত শাক-(শাকোট বা শাল্য -বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই বনপ্রদেশ ক্ষুদ্র উপনিবেশে পরিণত হওয়ায়, বাণিজ্যোপলক্ষে পুনরায় অযোধ্যাবাসীদিগের সহিত ইঁহাদিগের সংস্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুমারগণের বিবাহোচিত কাল উপস্থিত হওয়ায়, জাতিনাশভয়ে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়গণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে সংশ্লিষ্ট না হইয়া, সহাগত স্বকুল-মধ্যেই বিবাহের আদান প্রদান করিতে লাগিলেন,—অমাত্যগণ পরম্পরায় এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সাকেত-রাজসমীপে বিজ্ঞাপিত করিলে, মহারাজ সুজাত তনয়গণের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার-নিবন্ধন ধর্ম্মনাশভয়ে একান্ত বিমনা হইয়া পুরোহিত-প্রমুখ শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণের মত জিজ্ঞাসু হইলে,—এরূপ অবস্থায় এরূপ আচরণ 'শক্য' (অর্থাৎ করা যাইতে পারে,) তাঁহাদিগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তবাক্য অভিহিত হইলে, এইরূপ আচরণপরায়ণ কুমার ও তদ্বংশীয়গণ 'শক্য' বা 'শাকিয়া' এই প্রাকৃত ও 'শাক্য' এই সংস্কৃত অভিধানে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

নির্ব্বাসিত কুমারগণের উপনিবেশটি ক্ষুদ্র জনপদাকারে পরিণত হইলে ক্রমশঃ ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও নিরতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার্থ রাজধানীরূপে একটি নগর-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়, কুমারগণ তাপসপ্রবর কপিল সন্নিধানে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মুনিবর উত্তর করিলেন, "যদি তোমরা আমার আশ্রম-সীমায় রাজধানী স্থাপন কর, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাতে অনুমতি দান করি।" কুমারগণ উদারহৃদয় ঋষির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তখনই তাহাতে সম্মত হইলেন। সত্যনিষ্ঠ মুনিবর কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ-পূর্ব্বক, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তদীয় তপোবন রাজনগর-নির্ম্মাণার্থ রাজ-কুমারগণকে সম্প্রদান করিলেন। সুবৃহৎ শাক বা শাল বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া, অচিরকালমধ্যে মহাসমৃদ্ধ রাজধানী নির্ম্মিত হইল। ভগবান কপিলের প্রসাদেই তাঁহাদিগের বাসার্থ এই সুশোভন নগর সংস্থাপিত হইল বলিয়া, ঋষির প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ শাক্যরাজধানী 'কপিলবস্তু' এই নব

আখ্যায় ভূষিত হইল।* অতঃপর জনসমূহ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া শাক্যগণের ব্যবহার-মাধুর্য্যে ও স্থানের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বসতি-স্থাপনপূর্ব্বক বহুজনাকীর্ণ নগরটিকে সম্পদের বাসভূমি, সুখের নিলয়, উৎসবের লীলাক্ষেত্র, বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, সুতরাং বণিক্গণের প্রিয় নিকেতন করিয়া তুলিল। কালে কপিলবস্তুর শাসনপ্রণালী কতকটা প্রজাতন্ত্রমূলক হইয়া উঠিল। নৃপতি-নির্ব্বাচনের ভার অধিকাংশস্থলে প্রজার উপর ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয় সকল সভাগৃহে সাধারণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইত। এই সভাগৃহ-সমূহ প্রাচীর-পরিশূন্য ও উপরে আবরণ-বিশিষ্ট থাকিত।† পশুপালন ও কৃষিই শাক্যগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল; সুতরাং ক্ষত্রোচিত কঠোরতা হইতে সে সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ শিথিলভাব অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। পশুগণ গ্রামো-পান্তস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মহাবনের অংশবিশেষে বিচরণ করিত। এই চারণ-ভূমির উপর সকলের সমান অধিকার ছিল, এবং গ্রামগুলি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ওপুর ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রথম অধিপতিরূপে বৃত হন। তদনন্তর নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তীশীর্ষ প্রভৃতি কতিপয় রাজার পর, সিংহহনু কপিলবস্তুর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, অমৃতোদন ও ধৌতোদন নামে চারি পুত্র ও অমৃতা (বা অমিতা) নাম্নী এক কন্যা জন্মে। শুদ্ধোদন রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কোলীয়-বংশীয়া মায়াদেবী ও প্রজাবতী নাম্নী দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই শুদ্ধোদনের ঔরসে, মায়াদেবীর গর্ভে

---

* শালবৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক বসতি স্থাপন করা হয় বলিয়াও কেহ কেহ এই বংশের শাক্য নামের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। গোরকপুরের সমীপবর্ত্তী কোহানা নদী-তীরবর্ত্তী আধুনিক 'নগরখাস' নামক স্থানে প্রাচীন কপিলবস্তু নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল,—পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞানবিশারদগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

† বুদ্ধের সময়ে কপিলবস্তু নগরে নব সভাগৃহ নির্ম্মিত হইলে, স্বয়ং বুদ্ধ, আনন্দ ও মৌদ্গল্যায়ন ধারাবাহিকরূপে কয়েক রাত্রি নীতি উপদেশ দানে সভার প্রারম্ভিক পবিত্রতা সম্পাদন করেন। এই জাতীয় সভা কেবল কপিলবস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বুদ্ধ-নির্ব্বাণের সংবাদ দিবার জন্য তদীয় পুত্র ভ্রাতৃ-পুত্র ও প্রিয় শিষ্য আনন্দ মল্লদেশে উপস্থিত হইলে, এইরূপ রাজ-সভাতেই তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা মীমাংসিত হইয়াছিল। এমন কি, প্রসেনজিতের বিবাহ-প্রস্তাব ও অবন্তীর কার্য্যসম্ভার এইরূপ এই সভামধ্যেই উত্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ এই সভায় শুদ্ধোদনের পর ভদ্রীয় বা ভদ্রক কপিলবস্তুর রাজা নির্ব্বাচিত হন।

ভগবান বুদ্ধ শাক্যমুনি সিদ্ধার্থ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, শাক্যকুলকে জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গোপা বা যশোধারার গর্ভে সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগের পূর্ব্বে রাহুল বা রাতুল নামে একটি পুত্র জন্মে।* কিন্তু ইহাদিগের ও বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্রগণের সংসার-বিরক্তিতে শাক্যরাজ-বংশ অচিরেই লোপপ্রাপ্ত হইল। কপিলবস্তু নগরীও কালবশে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া এখন কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া শ্বাপদ-

* কপিলবস্তু, লুম্বিনী, ললিতপুর, পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থানের পুরাতত্ত্ব-আবিষ্কারক প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাক্যবংশীয় বংশবলী এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন ;—
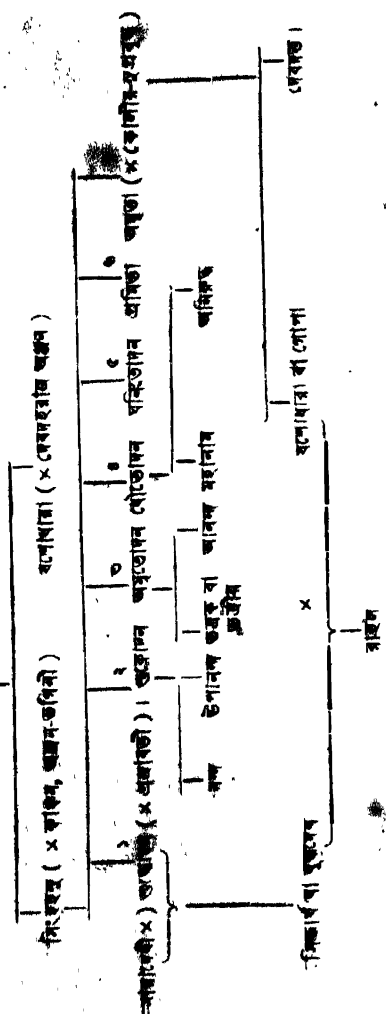
নতুন ভূতত্ত্বে আরণ্য প্রদেশে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। ধন্য নির্জ্জনতার লীলা! কে জানিত যে, নির্জ্জনিক বনের একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ জগতের এক-তৃতীয়াংশের ধর্ম্মরূপ অমৃতের নিঝর ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনকারী ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলাভূমিরূপে পরিণত হইবে। আর ধন্য ভারত! তোমার বক্ষে যে মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কপিলবস্তু নগরের নির্জ্জন প্রদেশে উৎপত্তি, তাহা সিদ্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই শাক্যনগরী আবার সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে যোগসমাধি লাভ করিয়াছে। ধন্য তুমি! তোমারই সন্তান অহিংসা-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, এবং খৃষ্টগুরুরও আদি উপদেষ্টা। ভারত-জননী! এত রত্ন প্রসব করিয়াছ, তবুও আমরা তোমাকে জানি না, জানিতে চাহি না; তোমাকে মায়ের মত ভালবাসি না! শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

রাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল।

পালবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই বংশের অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। বুদ্ধদেবের দশ-বলকে নমস্কার করিয়া এই তাম্রশাসনের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের দশ বল এই ;—

দান-শীল-ক্ষমা-বীর্য্য-ধ্যান-প্রজ্ঞা-বলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধবলানি বৈ।

তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক এই ;—

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাশ্রিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুধামবুলোপলস্তাঃ।
সেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি।

দ্বিতীয় শ্লোকে জানিতে পারি, দয়িত-বিষ্ণু ঐ বংশের প্রবর্ত্তক। তাঁহার রাজা বা মহারাজ কোনও উপাধি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাকে 'সর্ব্ববিদ্যাবদাত' বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই। দ্বিতীয় শ্লোক এই ;—

শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ
শশধর ইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া
অজনি দয়িত-বিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ।

দয়িত-বিষ্ণু হইতে বপ্যট জন্মগ্রহণ করেন। বপ্যটের কীর্ত্তিমালা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহাকে রাজা বা মহারাজ বিশেষণ দেখিতে পাই না। তিনি [illegible] ছিলেন; নতুবা তাঁহাকে [illegible] করিতে হইবে কেন? [illegible]-কালে বিরোধিগণের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। তৃতীয় শ্লোক এই;—

> [illegible] কৃতিভিঃ কৃতী।
> [illegible] শ্রীবপ্যটঃ॥

বপ্যটের পুত্রের নাম গোপাল দেব। গোপাল দেবকেই পাল-বংশের প্রথম রাজা বলা যাইতে পারে। পরিব্রাজক তারানাথের মতে, গোপাল দেব বঙ্গ ও মগধ জয় করেন। ইহাতে বোধ হয়, মগধ পালবংশের আদি বাসস্থান নহে। গোপাল দেবের পূর্ব্বে গৌড় সাম্রাজ্য কতকগুলি খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শূর-বংশের রাজত্বের শেষভাগে দেশের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটাইতেন। গোপাল দেব তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যাচার নিবারণ করেন। এক রাজার অধীন হওয়ায় প্রজাগণের [illegible]-শ্রী বর্দ্ধিত হয়। চতুর্থ শ্লোক এই;—

> মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করো গ্রাহিতঃ।
> শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
> যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
> শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥

গোপাল দেবের ভূপাল ও লোকপাল, এই দুইটি নাম দেখিতে পাই। আইন-আকবরিতে প্রথম ও দিনাজপুরের আমগাছির তাম্রশাসনে দ্বিতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। নালন্দায় গোপাল দেবের যে শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গোপাল দেব মগধ জয় করেন।

গোপাল দেবের মহিষীর নাম শ্রীদেদ্দ দেবী। দেদ্দ দেবী রাজার প্রণয়-পাত্রী ছিলেন। দেদ্দ দেবীর গর্ভে ধর্ম্মপালের জন্ম হয়। ধর্ম্মপাল অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র-সেনার পরাক্রম সমুদ্র-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে আছে,—"ধর্ম্মপাল যখন দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিতেন, তখন [illegible] পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইত। শেষদেব অতি কষ্টে পৃথিবী ধারণ করিতেন। বিধাতা পৃথু রাম নলকে একত্র দেখিবার

জন্য ধর্ম্মপালের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল সংসঙ্গে যাত্রা করিলে, মহেন্দ্রের মনে হইত, যাদ্ধাজাই যাইতেছেন; গোপেরা গোষ্ঠে, বনচরেরা বনে, শুকেরা পঞ্জরোদরে ধর্ম্মপালের যশোগান কীর্ত্তন করিত। তাহা শুনিয়া ব্রীড়ায় ধর্ম্মপালের মুখ অবনত হইত,—ইত্যাদি।

ধর্ম্মপাল প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তি, যবন, গান্ধার, কীর অর্থাৎ কাশ্মীর পর্য্যন্ত তাঁহার পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল। কান্যকুব্জের বৃদ্ধগণ স্বর্ণময় জলকুম্ভে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথা ;—

ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগান্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥

ধর্ম্মপালের সময় আমরাজ কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। আমরাজের অপর নাম চক্রায়ুধ। আমরাজের সহিত ধর্ম্মপালের পূর্ব্বকালের শত্রুতা ছিল। পরে উভয়ের বন্ধুত্ব হয়। আমরাজ আপনার দুর্দান্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া আমরাজকে পুনরায় কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে কনোজের বৃদ্ধগণ সন্তোষ লাভ করেন। তাম্রশাসনে লিখিত আছে ;—

জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥

চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের নিকট আনতিবামন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ অবনত হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জের অপর নাম মহোদয়। পাটলীপুত্র-নিবাসী প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত শূরপাল আমরাজের সভা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূরপালের অপর নাম বপ্পভট্ট। বপ্পভট্ট সূরির সরস্বতী-স্তোত্রপাঠে জানা যায়, তিনি বীরনির্ব্বাণের তের শত বৎসর পরে এই সরস্বতী-স্তোত্র রচনা করেন। ৮৯৫ সংবতে বপ্পভট্টের মৃত্যু হয়। বর্দ্ধন-কুঞ্জর নামক এক জন বৌদ্ধ-পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত "গৌড়বহ" নামক কাব্যের প্রণেতা কবিবর বাক্‌পতি, প্রথমতঃ যশোধর্ম্মদেবের সভায়, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের সভায় কিয়ৎকাল থাকিয়া, শেষ সময়ে ধর্ম্মপালের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল গঙ্গার বাম তীরে একটি পর্ব্বতের উপর বিক্রমশিলা নামক একটি বিহার স্থাপন করেন। এই বিহারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত প্রচুর ভূমি দান করেন। বিক্রমশিলার অপর নাম দেববিহার। বর্ত্তমান শিলাও গ্রামে বিক্রমশিলার স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিহারের নিকট এক শত আটটি প্রাকারবেষ্টিত দেবমন্দির ছিল। রাজা এখানে ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানার্থ এক শত আট জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে এই বিদ্যালয়গুলি ছয়টি দ্বার-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হয়। জেতারি মুনি বিক্রমশিলায় একটি সত্র স্থাপন করেন। সেখানে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে আহার পাইত। জেতারি বরেন্দ্রভূমির সনাতন নামক রাজার পুত্র। ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। মালদহের নিকটে একটি স্থানে সনাতনের বাটী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এ দেশের লোক রূপ-সনাতন ছাড়া অন্ত সনাতনকে চেনে না; সেই জন্ত সনাতনের রাজধানীকে গৌড়মন্ত্রী সনাতনের বাসস্থান বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বিক্রমশিলার সজ্ঘারামের ভিতর এইরূপ চারিটি সত্র (Boarding or Hostel) ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় রাজকীয় সাহায্যে সুন্দররূপে চলিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত লইয়া ছয় জন দ্বার-পণ্ডিত যে মীমাংসা করিতেন, সজ্ঘারামের শাসনকর্ত্তাকে তাহা মানিয়া চলিতে হইত। শাসনকর্ত্তা বিদ্যার্থিগণের নৈতিক উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জিনরক্ষিত, বিক্রমশিলা-বিহারে রাজগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয়েন। ইনি রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের (প্রবলের) কন্তা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধি-রাজ বিশেষণ দেখিতে পাই। ধর্ম্মপাল গৌড় অধিকার করিয়া 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। গৌড়েশ্বর, বিশেষতঃ পঞ্চগৌড়েশ্বর, তৎকালে সম্মানজনক উপাধি ছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিলে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাটকে বুঝাইত। পালরাজগণ মগধ সাম্রাজ্যকে পূর্ব্ব অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মৌর্য্য, অন্ধ্র ও গুপ্ত সম্রাটগণের ন্তায় তাঁহারা পরাক্রমশালী হইতে পারেন নাই।

ধর্ম্মপাল পরমসৌগত হইলেও পরধর্ম্মদ্বেষ্টা ছিলেন না। মহাসামন্তাধি-

পতি নারায়ণ বর্ম্মা নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ-সেবার ব্যয়-নির্ব্বাহের সাহায্যার্থ, যুবরাজ ত্রিভুবন পালের দ্বারা ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে ভূমি দান করেন। সেই ভূমি-দানের বিষয় আমাদের অবলম্বিত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ভূমি-দানের সময় রাজা পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবারে ছিলেন। সেখানে তাঁহার সেবার জন্য জম্বুদ্বীপ হইতে রাজগণ সমাগত হইয়াছিলেন। গঙ্গার উপর নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরদেশীয় সামন্তগণ মহারাজকে অনেক অশ্ব উপঢৌকন দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা জম্বুদ্বীপ শব্দে কি বুঝিতেন, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই শব্দ দ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ভারতবর্ষ বুঝাইত। রাজা কোনও প্রয়োজনবশতঃ পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিংবা পাটলীপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। অশোকের সময়ের পাটলীপুত্র শোণের ভাঙ্গনে নষ্ট হইয়াছিল। উহার নিকটে এই সময়ে যে নব পাটলীপুত্র স্থাপিত হয়, ইহা সেই পাটলীপুত্র। ধর্ম্মপাল বর্দ্ধনকুটীরের সত্তর মাইল উত্তরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কামরূপের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য, অথবা তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

এই সময়ে গৌড়রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এ পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, তীর ভুক্তি ও শ্রীনগর ভুক্তি,—এই তিনটি ভুক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। পাটলী প্রদেশ শ্রীনগর ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। হিন্দুদের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় এইরূপ ভুক্তিকে দণ্ডপথ বলিত। ভুক্তিগুলি কতিপয় 'মণ্ডলে' ও মণ্ডলগুলি কতিপয় 'বিষয়ে' বিভক্ত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে ভুক্তিগুলির সরকার, মণ্ডলগুলির পরগণা ও বিষয়গুলির মৌজা নাম হয়। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি 'বিষয়' হইত। ধর্ম্মপাল নারায়ণ দেবের সেবার উদ্দেশ্যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ক্রোঞ্চশ্বভ্র, গোপিপ্পলী, মাঢাশাল্মলী ও পালিতক গ্রাম প্রদান করেন। এ সমুদায় স্থান কোথায় ছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, এই সকল গ্রাম গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ছিল; কারণ, গৌড়ের নিকটে এই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাম্রশাসনে শ্বভ্র, গঙ্গিনিকা, যবনিকা, যানক, [illegible]বীটী, অৰ্দ্ধস্রোতিকা, [illegible]লিকা, খাটিকা, জোলিক, গোমার্গ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

খর্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ,—গর্ত ; দ্বীপিকা শব্দের অর্থ,—ক্ষুদ্র দ্বীপ বা নদীর চর ; খাটিকা শব্দের অর্থ,—খাড়ী ; জোলক শব্দের অর্থ,—জোলা। মালদহ জেলায় গঙ্গা নদীর বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গঙ্গা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত এই জেলার সমুদায় পশ্চিমাংশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতকে পূর্ব্বে গঙ্গিনিকা বলিত। যানিক, যানক ও অর্দ্ধস্রোতিকা শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। জৈনভ্রায়িকা, পরকর্ম্মকৃৎ ও দেবকুলিকা শব্দও বুঝা যায় না। প্রদত্ত চারিটি গ্রামের চতুঃসীমা লিখিত হইয়াছে। স্থালীকট বিষয়, আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল ও উড্র মণ্ডল প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ও মণ্ডলের নাম পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু-রাজত্বকালে মণ্ডলগুলি খুব বড় ছিল। তৎকালে দশখানি গ্রাম লইয়া একটি বিভাগ হইত। দশ গ্রামের রাজস্ব-আদায়কারীকে দশ-গ্রামিক বলিত। কয়েকটি দশ-গ্রাম লইয়া একটি বিষয় হইত। রাজস্ব-আদায়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সমুদায় বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পদস্থ লোকদিগকে জানাইয়া ও তাঁহাদের সম্মতি লইয়া ভূমি দান করা হইয়াছিল।

১। রাজা	৮। দণ্ডশক্তিক	১৫। নাকাধ্যক্ষ	২২। মহামহত্তর
২। রাজনক	৯। দণ্ডপাশিক	১৬। বলাধ্যক্ষ	২৩। দশগ্রামাদি-বিষয়-ব্যবহারিক
৩। রাজপুত্র	১০। চৌরোদ্ধরণিক	১৭। তরিক	
৪। রাজামাত্য	১১। দোঃসাধিক	১৮। শৌল্কিক	২৪। জ্যেষ্ঠকায়স্থ
৫। বিষয়পতি	১২। দূত	১৯। তদাযুক্তক	২৫। মহত্তর
৬। ষষ্ঠাধিকৃত	১৩। গমাগমিক	২০। বিনিযুক্তক	২৬। গৌল্মিক
৭। সেনাপতি	১৪। অভিত্বরমাণ	২১। ভোগপতি	২৭। মহাসেনাপত্যাধিপতি

উল্লিখিত পদ-সমূহের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও রাজতন্ত্রের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। সমুদায় পদের অধিকার স্পষ্ট বুঝা যায় না। রাজপুত্র ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, সুতরাং সমুদায় বিষয় তাঁহাকে জানান হইত, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহার সম্মতি লওয়া হইত। রাজাগণের নিম্নে রাজনকের সম্মান ছিল। বোধ হয়, এখনকার জমীদারশ্রেণীর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামিগণকে রাজনক বলা হইত। দণ্ডশক্তিক দণ্ড প্রদান করিতেন। দণ্ডপাশিক দণ্ডদানের যন্ত্রগুলির অর্থাৎ শূল, খড়্গ প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক সংস্কৃত অভিধানের মতে, দোঃসাধিক শব্দের অর্থ,—দ্বারপাল। গমাগমিক ও অভিত্বরমাণ, কিংবা গমাগমিকাভিত্বরমাণ

দ্রুতগামী বার্ত্তাবহদের অধ্যক্ষ ছিলেন। তরিক নৌ-সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নাকাধ্যক্ষ ও গৌল্মিক শান্তিরক্ষার্থ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। অদ্যাপি মালদহ জেলায় 'নাকা' শব্দটি প্রচলিত আছে। বিনিযুক্তক কর্ম্মচারিনিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রত্যেক 'বিষয়ে'র হিসাব রাখিবার জন্য যে কার্য্যালয় ছিল, বিষয়পতি তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। বিষয়-আফিসে জমীর পরিমাণ ও রাজস্বের হিসাব থাকিত। হিন্দুরাজত্বকালে বিষয়ী বা বিষয়পতি রাজার নিকট শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। নিকটবর্ত্তী গৌড় রাজ্যে যে সেইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।* দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিষয়ীকে দেশমুখ বলিত। মুসলমান-আমলে বিষয়পতিদের বোধ হয় চৌধুরী নাম হইয়াছিল। ষষ্ঠাধিকৃত রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি মুসলমান-আমলের মজুমদার। উড়িষ্যার সামন্তেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সেনাপতিও ছিলেন। গৌড় রাজ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মহাসামন্তাধিপতি সামন্তদের রাজা ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কায়স্থেরা তৎকালে গোমস্তার কার্য্য করি[illegible]। জ্যেষ্ঠকায়স্থ বিষয়-আফিসে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিতেন। দশগ্রামিক দশগ্রামের রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন।

যে রাজতন্ত্র এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার কার্য্য যে সুন্দররূপে চলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপালের মহাসামন্তের নাম,—নারায়ণবর্ম্মা। তিনি জাতিতে ক্ষাত্রয় ছিলেন। তাম্রশাসনে রাজপুত্র দেবট-কৃত আলীর উল্লেখ আছে; এই দেবট কে, তাহা জানিতে পারি নাই। এই তাম্রশাসনখানি ধর্ম্মপালের রাজত্বের দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষে প্রদত্ত হয়। ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয় নাই। ভগবান্ নুন্ননারায়ণ দেবের সেবা-নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। লাটদেশীয় দ্বিজগণ বিগ্রহের সেবা করিতেন।

ধর্ম্মপালের সময় লাউসেনের অভ্যুদয় হয়। লাউসেন ময়নাগড়ের রাজা ও ধর্ম্মপালের সেনাপতি ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল-মতে ৭০৩ শকে লাউসেনের আবির্ভাব হয়। ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। অজয় নদের তীরে ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীগড় নামক স্থানে ইছাই ঘোষ নামক এক ব্যক্তি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। লাউসেন বহু যুদ্ধের পর তাঁহাকে নিহত করেন। বহুকাল হইতে পশ্চিম রাঢ়ে গোপ জাতির একটি রাজ্য

ছিল। উহারা সদ্‌গোপ নামে খ্যাত ছিল। উত্তর বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতিদেরও একটি রাজা ছিল। এই সকল রাজা পালবংশীয়দের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কামরূপের রাজা কর্প্পূরধবল বা কর্পূরধবল লাউসেন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মপালের মন্ত্রী কয়েকবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসেন।

ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ভূমি দান করেন। প্রদত্ত গ্রামের নাম ধামসার। এই আদিগাঞী ওঝা ও রাঢ়ীয়শ্রেণীদিগের আদি বরাহবন্দ্য, উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। লাহেড়ী-বংশাবলীতে আছে,—

শ্রীধর্ম্মপালঃ সুরসরিদ্ধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞীবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরকৃতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥

শ্লোকান্তর্গত বিষয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ধর্ম্মপালের পূর্ব্বেই রাজত্ব করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দীক্ষা।

১

"দাদা! এ ফটোগ্রাফ্‌খানা তোমার পছন্দ হয়?"

প্রোফেসর কিরণচন্দ্র বসু হঠাৎ গভীর অধ্যয়নে বাধা পাইয়া শুষ্ক রুক্ষ কেশগুচ্ছ ভ্রূ হইতে মস্তকের দিকে কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া চাহিলেন। কিরণচন্দ্রের অনুপম সুন্দর মুখখানি শীর্ণ দেখিয়া স্নেহময়ী ভগ্নী হৃদয়ে ব্যথা পাইল।

"দাদা। তুমি রাত্রি জাগিয়া অত পড়িও না।"

কিরণ। কেন বল ত?

কুমুদিনী। তোমার চ'খের কোণে কালিমা পড়িয়াছে।

কিরণ। আরও কিছু?

কুমুদিনী। অল্প বয়সেই চুল পাকিতেছে।

কিরণ। আরও কিছু?

কুমুদিনী। তুমি খাইতে পার না। না খাইলে কয় দিন বাঁচিবে?

কিরণচন্দ্র কিছু সংক্ষিপ্তভাবে হাসিলেন; এবং ভগিনীর স্নেহের প্রতিদানে তাহার দিকে একটু বিষণ্ণ ভাবে চাহিলেন।

"কুমু! নয়নের কালিমা, শুভ্রকেশ ও অল্পাহারের সহিত মানব-জীবনের উদ্দেশ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। তুমি একখানা ফটোগ্রাফের কথা কি বলিতেছিলে?"

কুমুদিনী। ওঃ! সেটা ভুলিয়া গিয়াছি। এই দেখ।

কিরণচন্দ্র ফটোগ্রাফখানি হাতে লইয়া চিত্রকরের ন্যায় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

"এটা কি মেম সাহেব?"

কুমুদিনী হাসিয়া খুন! "ও মা! সে কি? ও যে আমার সই ইন্দুমতী? খুব সুন্দরী; কেমন, না?"

কিরণ। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরীর চক্ষু বিড়ালের ন্যায় কটা, এবং মাথার চুল পাকা বিলাতী কুমড়ার ন্যায় লাল।

কুমুদিনীর মুখ শুকাইয়া গেল।

"দাদা! ওটা ফটোগ্রাফের দোষ বোধ হয়। ইন্দুর ন্যায় সুন্দরী বেথুন স্কুলে কেহই ছিল না। কিংবা বোধ হয়, বিলাতে গিয়া রং কটা হইয়া থাকিতে পারে।"

কিরণ। তোমার সখী বুঝি ব্যারিষ্টার ঘোষের কন্যা?

কুমুদিনী। তা কি তুমি জান না?

কিরণ। শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই! আমরা দরিদ্র কলেজ-অধ্যাপক, ইতিহাসের বহির্ভূত কোনও বিষয় স্মরণ-পথে বড় লিপ্ত থাকে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমার সখীর রুচি অতি জঘন্য।

কুমুদিনী। কোন্ রুচি?

কিরণ। ঐ বিলাতী শাটীনের গাউনটা সমুদ্রের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া আসিলে ভাল হইত। ভারত-আকাশে আর পরী উড়িবার স্থান নাই।

কুমুদিনী। কেন?

কিরণ। সবই রক্তিম। শ্মশানের পূর্ব্বলক্ষণ।

কুমুদিনী। তুমি ইন্দুকে দেখিলে কখনই নিন্দা করিতে না। জানি না,—কেন ওরূপ সজ্জা; কিন্তু ইন্দুর মন যে কত উচ্চ, তাহা তুমি জান না।

কিরণ। দেখ কুমু! পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, অনেকের মন চিলের ন্যায় উচ্চ দিকে উঠে, কিন্তু নজরটা থাকে ভাগাড়ের দিকে।

কুমুদিনী ঈষৎ রাগিয়া বলিল, "যদি গাউন এত নিন্দনীয় হয়, তবে শাস্ত্রের কথা 'ওঁকে' শুনাইও।"

'ওঁকে' অর্থাৎ কুমুদিনীর স্বামী ব্যারিষ্টার অটলবিহারী দত্তকে। কিরণ-চন্দ্রের সামান্য পিতৃদত্ত বিষয়টুকু সযত্নে রক্ষা করিয়া অটলচন্দ্র সোদরোপম স্নেহ-পাশে কিরণকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। কলেজের প্রোফেসারি পদ প্রাপ্ত হইয়াও কিরণ অটলচন্দ্রকে ছাড়িতে পারেন নাই।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, কিরণচন্দ্রের মনটাকে সংসারের দিকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হয়; এবং ইন্দুমতীকে দেখিলে কিরণচন্দ্র যে সেই সনাতন পথে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

কুমুদিনীর রাগ দেখিয়া কিরণচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

"কুমু! তুমি রাগ করিও না। সংসারটার মধ্যে অনেক গভীর কথা আছে। রূপ, যৌবন, সাজসজ্জা, উচ্চহাস্য, সকলই ক্ষণিক। আমাদিগের একটি মহৎ কর্ত্তব্যপালনের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে হৃদয়ের ব্যাকুলতা না দেখিলে জাতীয় জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়।"

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলিল, "সই আমাদের বাড়ীতে শীঘ্রই আসিবে। আর একটি শুভ সংবাদ তোমাকে দিতেছি। নারায়ণগড়ের জমীদার মিষ্টার সেনের বড় ইচ্ছা যে, সইয়ের সহিত আলাপ করেন।"

কিরণ। তোমার সখী তাঁহারই উপযুক্ত।

কুমুদিনী। যে সইকে দেখে, সেই ভুলিয়া যায়। কেবল তোমার চক্ষু দু'টি টিপু সুলতানের মত।

কিরণচন্দ্র। বোধ হয়, মহীশূরে টিপু সুলতান নারায়ণগড়ের বীরেন্দ্র সেন অপেক্ষা অধিকতর মান্য গণ্য ও চিরস্মরণীয়। সে বেচারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল।

কুমুদিনী। আচ্ছা, কে কাহার জন্য প্রাণ দেয় দেখা যাবে।

এবম্প্রকারে ভ্রাতাকে শাসন করিয়া ও ক্ষুদ্র মুষ্টি উত্তোলন করিয়া মানিনী কুমুদিনী চলিয়া গেল। কিরণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—কি বিপদ! এই নীরব গৃহে শীঘ্রই একটা বিপ্লব ঘটিবে। মিষ্টার সেন, মিস্ ইন্দুমতী, পিয়ানো, গীত, বাদ্য, উচ্চহাস্য, কটাক্ষ, প্রেম!

বোধ হয় বাসাটা বদলাইয়া ফেলিলে ভাল হয়।

সম্মুখে কুমুদিনীর কৃত কার্পেটে অলস্ত অক্ষরে,—

"হৃদয়ে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর।"

যাহাদিগের হৃদয় নাই, তাহাদিগের উপায় কি?

চিন্তা ও হৃদয়ের উদ্বেগে কিরণচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২

তাহার দুই দিন পরেই প্রকাণ্ড 'ফিটন্' আসিয়া ব্যারিষ্টার অটল দত্তের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত। 'ফিটন্' হইতে ইন্দুমতী বাহির হইল। যেন মেঘ হইতে ডানাকাটা পরী।

প্রমাদ গণিয়া প্রোফেসার কিরণচন্দ্র স্বীয় অধ্যয়ন-গৃহে লুক্কায়িত হইলেন; এবং কপাট অর্গলবদ্ধ করিলেন।

ইন্দুমতী দ্রুতপদে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে কে থাকে?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে দৃঢ়স্বরে কিরণচন্দ্র বলিলেন, "আপনি উপরে চলিয়া যান।"

ইন্দুমতী ভাবিল, "কি কঠোর স্বর!"

"কুমু! কুমু! কুমুদিনী! সই!"

পাপিয়ার ন্যায় স্বর স্তরে স্তরে ত্রিতলে উঠিল!

তাহার পর দুইটি শব্দ। আরোহিণীর ও অবরোহিণীর। আরোহিণী অবরোহিণীর সহিত আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধা।

চুম্বনের ও আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাস দেখিয়া মিষ্টার দত্ত ধীরে ধীরে গবাক্ষের পার্শ্বে গিয়া শিশ্ দিতে লাগিলেন। "ও ডিয়ার, ডিয়ার, স্ত্রীলোক মাত্রেই এক রকমের।"

"কুমু! মিষ্টার দত্ত কই? অটল বাবু! আপনি সোনা পাইয়াছেন। আপনার সুখ দেখিয়া আমার হিংসা হয়।"

অটল দত্ত মৎস্য-কণ্ঠ-বিদ্ধ বিড়ালের ন্যায় কাতরভাবে একটু কাশিলেন, একটু হাসিলেন, এবং রুমাল দিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ মুছিলেন।

"মিস্ বোস! আপনার স্নেহ দেখিয়া আমি বড় 'অ্যাফেক্টেড' হইয়াছি। ঈশ্বর করুন, এইরূপ স্নেহ যেন চিরদিন থাকে।"

ইন্দু। অটল বাবু! আমাকে 'ইন্দু' বলিবেন। স্নেহই ঈশ্বরের, প্রেমই ঈশ্বরের। তিনি অন্য কোথাও থাকেন না। চিরদিনই সেখানে—চিরদিন।

"কুমু! তোর জন্য কি আনিয়াছি, দ্যাখ্ না। এই গ্যারিবল্ডীর চিত্র, ইতালী হইতে। এখানা সুইস্। আর এইটুকু 'আইভি', প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের সমাধি হইতে।"

কুমুদিনী। তুই আমেরিকায় গিয়াছিলি?

ইন্দু বলিল, "হাঁ। ওটুকু স্বদেশহিতৈষিতার স্মরণ-চিহ্ন। কি সুন্দর সমাধিস্থান! ওয়াশিংটনেরই উপযুক্ত। স্থির, বিজন, শান্তিময়! সেই নীরব, অন্ধকারময় সমাধি হইতে আমেরিকার প্রথম জাতীয় জীবন জাগিয়াছিল।

"কুমু! আমি সেখানে ঘুমাইয়াছিলাম। সেই মহাবীরের চরণতলে। প্রশান্ত মহাসাগরও সে চরণ ধৌত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।"

কুমুদিনী ভাবিল, ইন্দু কি দেবী? কি সুন্দর চক্ষু! কি সুন্দর জ্যোতিঃ! অটল বাবুও নীরবে তাহার অনুমোদন করিলেন।

"কুমু! তোর ছেলে পুলে হয় নাই?"

কুমুদিনী। না। ছি! তোর লজ্জা নাই।

ইন্দুমতী লাল টুকটুকে জিহ্বার অগ্রভাগ, মুক্তাপাঁতির ন্যায় দন্তে ঈষৎ পীড়ন করিয়া, মাথায় ওড়নাখানি টানিয়া দিল। অটল বাবু সস্ত্রীক সেই ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কি অপূর্ব্ব!

অটল। সবই 'ওরিজিনাল্'।

কি আনন্দের দিন! সন্ধ্যার সময় বন্ধুবর্গ সমাগত হইল। গৃহ আলোকময়! কত দিন পরে নীরব গৃহে পুরাতন পিয়ানোর স্বর! কত দিন পরে গান! সই গিয়া অবধি কুমুদিনী কাহারও গান শুনে নাই।

"সই! তোর বিয়ে হ'লে আর এ গান শুনিতে পাইব না।"

ইন্দু। গান কি চিরকাল শুনা যায়? আমি মরিয়া গেলে কাহার গান শুনিবি?

কুমুদিনী। দাদা! তুমি একলা এক কোণে বসিয়া রহিলে কেন?

ইন্দু। 'দাদা'! কুমু, তোর 'দাদা'?

কুমু। হাঁ, প্রোফেসার কিরণচন্দ্র বসু।

ইন্দু। যাঁহার রচিত মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের আমেরিকায় দুইবার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে?

কুমু। বোধ হয়।

ইন্দু। তুই এতক্ষণ বলিস্ নাই?

কুমু। কেন বল্ ত?

ইন্দু। আমরা উঁহাকে 'শিবাজী' বলিয়া থাকি।

কুমু। আমি টিপু সুলতান বলি।

ইন্দু। আচ্ছা, দেখা যাউক কোন্‌টা।

উভয়ে ধীরে ধীরে কিরণচন্দ্রের দিকে গেল।

কুমু। দাদা! আমার সই ইন্দু।

কিরণচন্দ্র। অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

ইন্দু। আপনার নাম আমি 'শিবাজী' রাখিয়াছি।

কিরণচন্দ্র। কথাটা 'শিবজী'। শিবাজী অত্যন্ত ভুল।

ইন্দু। শিবা শব্দের অর্থ শৃগাল। শিবজী শ্মশানে থাকেন, শিবাও শ্মশানে থাকে। সুতরাং উভয়ে একই।

কিরণচন্দ্র। শিবজী মহারাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন।

ইন্দু। কিন্তু পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিতেন।

কিরণ। আপনার ইতিহাসপ্রিয়তা প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনি অনর্থক শিবজীর নিন্দা করিবেন না।

কিরণচন্দ্রের জ্বলন্ত চক্ষু দেখিয়া কুমুদিনী ভয় পাইল। "দাদা! শিবের স্ত্রীর নাম শিবা বোধ হয়।"

ইন্দু খুব হাসিয়া উঠিল।

"তবে কি শিবের সহিত শৃগালের বিবাহ হইয়াছিল?"

কিরণচন্দ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিল, "সই! তুই দাদাকে চটালি কেন?"

ইন্দু কুমুদিনীর কানে কানে বলিল, "সই। তোর দাদা আমাকে দু' চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রথমেই রাগ করিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়াছিল। সংসারে সকলে সকলকে দেখিতে পারে না। তোর দাদা শিবজী, টিপু সুলতান নয়।"

যদিও কিরণচন্দ্র অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর রূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

"কুমু! আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার সখীর মত রূপ দুর্লভ। ফটোগ্রাফখানা নিতান্ত অধম হইয়াছিল। তবে ও রূপ জগতে না থাকাই ভাল।"

কুমুদিনী। তবে তোমার ইচ্ছা, সই জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হয়? তুমি কি নিষ্ঠুর!

কিরণ। তুমি অতি সরলা; বুঝিতে পার না। রূপে মোহ হয়, অহঙ্কার হয়। প্রথমতঃ, অত সাহেবিয়ানা ভাল নয়। সাহেবিয়ানাতে হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তোমার সখীর মত নির্লজ্জা, বেহায়া মেয়ে আমি কুত্রাপি দেখি নাই। আমার বোধ হয়, তোমার সখীর বিবাহ হইলেও আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে তাঁহাকে অধিক মিশিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কুমুদিনী। কল্য তুমি চলিয়া গেলে মিষ্টার সেন আসিয়াছিলেন।

কিরণচন্দ্র। আমি কোর্টশিপের পক্ষপাতী নহি। তবে আমাদিগের বিলাতফেরত ও ব্রাহ্মসমাজে উহা অল্প রকম চলিয়াছে। সবই চলিবে। কিন্তু যেখানে স্ত্রীলোক, সেখানেই গরলের উৎপত্তি।

"আর যেখানে পুরুষ, সেখানেই সুধা!"

ইন্দুমতী ইত্যবসরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহই দেখে নাই। তবে কি আমাদের কথা ইন্দু শুনিয়াছে? কুমুদিনীর অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু ইন্দুর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা গেল না।

ইন্দুমতী ধীরে ধীরে বলিল, "কিরণ বাবু! আপনি সাহেবদিগের উপর বড় চটা!"

কিরণ। বোধ হয় খানিকটা।

ইন্দু। কেন? তাহারা শত বর্ষ ধরিয়া অপত্যস্নেহে বাঙ্গালী জাতিকে পালন করিয়াছে বলিয়া?

কিরণ। বঙ্গের বিভাগই তাহার প্রমাণ!

ইন্দু। সে কেবল বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার গুণে।

কিরণ। আপনি বোধ হয় জন মর্‌লীর নিকট ভারতের ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ?

ইন্দু। পূর্ব্বে এখানেই কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম। মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে চুরী আটকাইতে গিয়া বাবা বিতাড়িত হন; তাহার পর তিনি ভগ্নহৃদয়ে ইহসংসার ছাড়িয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গ ও ব্রাহ্মসমাজের উপর নব্য যুবকগণের কটাক্ষপাত তাহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রূপও দেখিয়াছি।

কিরণ। আর সাহেবদিগের উৎপীড়নগুলি বোধ হয় দেখেন নাই।

ইন্দু। আমার ছোট পিসীর বিধবা কন্যা সুধাকে ময়মনসিংহের একটি জমীদার কাছারী-বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহার পর আর তাহাকে পাওয়া যায় নাই। দেশের রাজা ও নবাবগণের অনেক কীর্ত্তি আছে। কিরণ বাবু! খুনখারাপি, উৎপীড়ন ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা কি কেবল বিলাতেরই একচেটিয়া ? সমাজমাত্রেই পশু ও মানুষ উভয়ই আছে।

কিরণ। আপনার বিলাতী দীক্ষাকে ধন্যবাদ।

ইন্দু। বাঙ্গালীর দীক্ষা ইংরাজের নিকট; বাঙ্গালীর শিক্ষা ইংরাজের নিকট। কিন্তু সময়ের গুণে গুরুর বিরুদ্ধে শিষ্য অস্ত্রধারণ করে। ইহা অধঃপতনের লক্ষণ।

উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের লক্ষণ দেখিয়া কুমুদিনী একটু হাসিয়া বলিল, "সই! তুই সাহেব বিয়ে করিস্।"

ইন্দু। কুমু! বাঙ্গালী যথার্থ সাহেব হইলে দেশের এত দুর্দ্দশা হইত না। বাঙ্গালী যথার্থ আর্য্য হইলেও দেশের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। বাঙ্গালী সাহেব ও হিন্দু, উভয়েরই অপকৃষ্ট ভাগ। যাহার নিজের উঠিবার শক্তি নাই, সে সমগ্র দেশকে উঠাইবে কি করিয়া ? বাঙ্গালী একেবারে সাহেব হইয়া গেল না কেন ?"

কিরণচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এখন অবসর পাইয়া বলিলেন,—"আপনার উপর দেশ উঠাইবার ভার অর্পিত হয় নাই, সুতরাং কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। আমরা দরিদ্র, আমাদিগের পন্থা এক; আপনারা বিলাসিনী, আপনাদিগের পন্থা অন্য। তবে আমার মিনতি এই যে, আপনার পথে অন্যকে আহ্বান করিয়া নষ্ট করিবেন না। বরং অজ্ঞান অন্ধকারে থাকা ভাল; কিন্তু এ সর্ব্বনেশে জ্ঞান হইতে দরিদ্রের দূরে থাকা উচিত।"

কিরণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী পূর্ব্বাপেক্ষা হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। এমন সময় মিষ্টার সেনের একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত।

কুমুদিনী। সই! ইহার মধ্যে বোধ হয় শুভ সংবাদ আছে।

ইন্দু। বোধ হয়।

পত্রখানি ইন্দু কুমুদিনীকে দেখাইল। মিষ্টার সেন এক ঘণ্টার জন্য কল্য ইন্দুর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ইন্দু। এটা একটু নূতন রকম নয়?

কুমুদিনী। সম্পূর্ণ বিলাতী।

ইন্দু। কিন্তু ইহার মধ্যে দেশী ও বিলাতীর পার্থক্য দেখা যাইবে। আমি মিষ্টার সেনের সহিত বাগানে সাক্ষাৎ করিব। তাহাই উত্তর দিব।

কুমুদিনী একবার হতাশভাবে চাহিল।

"সই! তুই যাই করিস্ না কেন, আমার মনে হয় সব সুন্দর।"

ইন্দু কুমুদিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "উহাই ভালবাসার লক্ষণ। ভালবাসায় দোষ দেখে না। কুমু! প্রাণের সই! আমি চিরজীবন তোর কাছেই থাকিব। আমার পিতা নাই, মাতা নাই, ভালবাসার কেহই নাই। কাকা বিলাতেই বোধ হয় থাকিবেন। আমি কোথায় যাইব কুমু?"

কুমুদিনী। আমার বড় সাধ ছিল যে,—

ইন্দু। তোর দাদা আমাকে বিবাহ করিবেন না।

কুমুদিনী চমকিত হইয়া ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল। ঐ চক্ষু, ঐ স্বর, ঐ মুখের ভাব কি এ জগতের?

"সই! দাদা তোর পায়ের নখেও লাগে না।"

ইন্দু সুধা বর্ষাইয়া হাসিল।

"সই! আমি তাঁহার চরণপ্রান্তের যোগ্যা নই। তাঁহার পাষাণ হৃদয় আমার ক্রন্দনে গলিবে না। আমরা কেবল কাঁদিতে জানি; ভালবাসিতে জানি না।

"আর দেখ সই! এ কথা যেন তাঁহার কানে যায় না। আমার পিতৃদত্ত ঐশ্বর্য্য কণ্টকস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অটলকে বলিস্, অনাথ ও ক্ষিপ্তদিগকে বিতরণ করিয়া দিতে।"

কুমুদিনী। ক্ষিপ্ত?

ইন্দু। হাঁ, যাহাকে বলে পাগল! জানিস্ না, আমার একটু পাগলের ছিট আছে। উঃ! বড় মাথা ধরেছে।

ইন্দুমতী ভ্রাতা ভগ্নীর কথোপকথন শুনিয়াছিল বলিয়া, কিরণচন্দ্র যে তাহারই প্রতিহিংসায় দুই সখীর কথা শুনিতে গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নয়। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, এবং তখনও ভাবনা দূর হয় নাই।

বিরুদ্ধ ভাবই জগতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

সে রাত্রিতে বোধ হয় ইন্দুমতীও ঘুমায় নাই। কিরণচন্দ্রও ঘুমান নাই। জগতে দেহই ঘুমায়, মন বোধ হয় ঘুমায় না। মন আধার পাইলে, দেহ ছাড়িয়া তাহাই লইয়া থাকে। স্বপ্ন তাহার আভাষ।

স্বপ্নের মধ্যে প্রেমের স্বপ্নই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

প্রেমের স্বপ্নের নায়িকা রমণী। সংসার মায়ার আগার। মায়ার মূলে রমণী। মায়া হইতে জীবনের উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাস হইতে সাধ। সাধ হইতে সংসার, কর্ম্মক্ষেত্র, ধন, জন, দারা, সুত। এইরূপে মায়া চিরন্তন জ্ঞান-চক্ষু আবৃত করিয়া বিশ্ব প্রকটিত করিতেছে। তাহারই মধ্যে সমাজ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর।

ইতিহাসটা পুরাতন, কিন্তু চিরপ্রচ্ছন্ন; অতএব সুন্দর।

মায়ার মধ্যে বিষ ও সুধা উভয়ই আছে; অতএব ঈশ্বর ও নিরীশ্বরত্ব আছে।

রাত্রি বড় স্তব্ধ। যে রমণীর প্রেমে মহেশ্বর চির-উন্মাদ, যে প্রেমে ট্রয় ও গ্রীস দেশের ধ্বংস হইয়াছিল, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে ও কালিদাস পাগল হইয়াছিলেন; যে প্রেম আত্মাকে চিরজাগ্রতাবস্থায়ও চঞ্চল করিয়া থাকে; সেই প্রেম আজ ক্ষীণ, জীর্ণ, শীর্ণ, কিরণচন্দ্রকে বিশ্ব-সিংহাসনতলে একটি ক্ষুদ্র সিংহাসনে বরণ করিতেছিল।

কিরণচন্দ্র বরণীয় ও সুন্দর। ইন্দুমতী বরণীয়া ও সুন্দরী।

কিন্তু উভয়েরই চক্ষু নিমীলিত। স্বপ্ন সেই আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিল। একটি হৃদয় অন্যটির দিকে যাইতেছিল। দেহ জানিতে পারিল না; দেহী জানিয়া পুলকিত। যাঁহার বিধান, তিনিই কেবল সাক্ষী।

সেই স্বপ্ন-চন্দ্রাতপে ইন্দু কিরণের সহিত যুক্তা হইল। কিরণচন্দ্র এত দিনে জীবন পাইল। জীবনের সাধ পাইল। সংসার দেখিল, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র দেখিল।

প্রভাতে বাগানে ফুল ফুটিয়াছিল। শিশির তাহার [illegible] আকর্ষণ করিতে-ছিল। প্রভাত-বায়ু তাহা লইয়া ধীরে ধীরে জগতে বিতরণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার মর্ম্ম কেহই জানিত না।

পাগলিনীর ন্যায়, অন্যাকৃষ্টার ন্যায়, ইন্দুমতী ধীরে ধীরে বাগানের দিকে গেল। বাগানের দ্বারে কুমার বীরেন্দ্র সেন একখানা ফিটন হইতে অবরোহণ করিয়া ইন্দুমতীকে অভিবাদন করিলেন।

ইন্দু হাসিল।

"আপনার সহিত আমার একটিমাত্র কথা আছে।"

মিঃ সেন। এ কি ভাব! এ কি দীন বেশ!

ইন্দু। আমি আপনাকে ছলনা করিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন।

মিঃ সেন। কিসের ছলনা ইন্দু?

ইন্দু। আমি নির্লজ্জা, প্রগল্‌ভা, আমি বেহায়া। আমি কুশিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম। ভ্রাতার ন্যায় ভগ্নীর উপর মমতা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

মিঃ সেন। ইন্দু! ইন্দু! প্রাণের ইন্দু! তুমি কি পাগল?

"মিষ্টার সেন! আপনিই পাগল, আমার হাত ছাড়িয়া দিন।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দুর রূপের তেজ অবমাননা পাইয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। মিঃ সেন তড়িদ্বেগে ইন্দুকে হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করিলেন।

ইন্দু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমার অবমাননা করিবেন না?"

এমন সময়ে গম্ভীর স্বরে কে পশ্চাৎ হইতে বলিল,

"আপনার সহিত আমার কথা আছে, একবার গেটের বাহিরে আসুন।"

মিঃ সেন দেখিলেন, কিরণচন্দ্র!

"আপনার অসভ্যতা দণ্ডনীয়।"

কিরণচন্দ্র বীরেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেলেন।

"আপনার যদি প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঐ মাঠে চলুন, নচেৎ কুক্কুরের ন্যায় দূর হইয়া যান।"

তাহার পর উভয় পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ বর্ষণ হইল; কিন্তু কিরণচন্দ্রের রণপটুতা দেখিয়া সেন মহাশয় অবিলম্বে চম্পট দিলেন।

মূর্চ্ছিতা ইন্দুমতী শয্যায়। কুমুদিনী চিন্তাকুলা, শয্যার শিয়রে। কিরণচন্দ্র উপস্থিত।

"দাম্ভা কি হইয়াছিল বল ত?"

কিরণচন্দ্র। একটা বিলাতী অভিনয়।

ইন্দুমতীর চক্ষু উন্মীলিত হইল; আবার পড়িয়া গেল। আজ এত লজ্জা কেন?

ইন্দু ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু স্বদেশীর হাতে?"

কৈ? ইন্দুর গাউন কোথায়, নেকলেস্ কোথায়? আজ মলিন বসন কেন?

কুমু। ছি! ছি! সই, তুই ঝীর কাপড় পরিয়াছিস্?

ইন্দু। সই! তোরা বিলাতী, তোদের কাপড় কই? তবে ঝাঁটা গাছটা অন্ধকারে খুঁজিয়া পাই নাই।

কিরণ। সেটা কি আমার জন্য ইন্দু?

ইন্দু আবার লজ্জায় নয়নকমল দুটি নিমীলিত করিল।

"না, সে তাহার জন্য। ঝাঁটা স্বদেশী, মুষ্টিযোগটা বিদেশী। তুমি স্বদেশী হইয়া বিদেশী উপায় অবলম্বন করিলে কেন? [illegible] শিবজী করিতেন না।"

কিরণ। ইন্দু! ইন্দু! ওটা তোমার নি[illegible] দীক্ষা। শিবজী একবার দিল্লী হইতে বিদেশী পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছি[illegible]ন।

কুমুদিনী উভয়ের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। সে কেবল আহ্লাদে মূর্চ্ছা যায় নাই।

ত্রিকাল।

—:•:—

১

ছিল ভক্তি, ছিল প্রীতি, ছিল সাধনার গীতি,
ছিল তপোবন,
ছিল বেদবিধি ধর্ম, উদ্‌ঘাটিত জ্ঞান-মর্ম্ম,
আধ্যাত্ম-জীবন।
নদী গিরি কুঞ্জবন কম্পিত সকল ক্ষণ
বেদোদাত্ত স্বরে,
লক্ষ লক্ষ কর্ম্মবীর পূজা দিত জননীর
লক্ষ অসি করে।

কি অনিন্দ্য অভিনব সত্তা-মাত্রা ছিল তব
হে বিরাট ভূপ!
তাই আজি মনে হয় শ্রদ্ধা তুমি জ্ঞানময়
হে অতীত-রূপ!

২

সে অতীত হ'ল শেষ, আজিকে প্লাবিয়া দেশ
আছ বর্ত্তমান;
ধর্ম্মহীন বিধিহীন দারিদ্র্য ধূলিতে লীন
লক্ষ্যহীন-প্রাণ।
স্বার্থ আর অজ্ঞানের বেধেছে বিষম ফের
ক্ষুদ্র গণ্ডী মাঝে,
দুর্ব্বল ভিক্ষান্ন-ভোগী নরকুল চিররোগী
দাসত্বের সাজে।
ত্যজ্যপুত্র জননীর ত্রস্ত চক্ষু ভরা নীর
জীর্ণ চীর, দীন!
কলি নহ, কালি তুমি ঘৃণা তুমি, দুঃখভূমি
কলঙ্কমলিন।

৩

হে ভবিষ্য! এস তুমি আঁধার ভারতভূমি
প্লাবিয়া আলোকে,
আন তব বজ্রধ্বনি উদ্বোধিয়া ঝনঝনি'
এই জড় লোকে।
তেয়াগিয়া রুগ্নশয্যা পাশরিব দৈন্য লজ্জা
ঘৃণ্য বর্ত্তমান,
আপন সর্ব্বস্ব তরে বহিব মায়ের তরে
ভক্তিমুক্ত প্রাণ।
হেরি আশা-মূর্ত্তি ধরি' নামিতেছ ত্বরাত্বরি'
বহি' অসি ঢাল,
এস,—লহ পূজা অর্ঘ্য, বহি আন চতুর্ব্বর্গ
হে ভবিষ্য কাল!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

—:*:—

উপকথা।

শ্রীযুক্ত শেখ চিল্লি 'মডারণ রিভিউ' পত্রে হিন্দুস্থানের গ্রাম্য উপকথা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমরা একটির সারসংগ্রহ করিলাম;

কোনও নগরে সাত জন স্বর্ণকার বাস করিত। তাহারা খুব নিপুণ কারিগর; অলঙ্কার ও হীরামুক্তাখচিত নানাবিধ স্বর্ণের গহনা এত সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারিত যে, তাহাদের নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত নগরের কিছু দূরে একটি গ্রামে এক জন প্রতাপান্বিত সমৃদ্ধিশালী রাজপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয়, এই জন্য তিনি ঐ সাত জন স্বর্ণকারকে তাঁহার গ্রামে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। তাহারা প্রচুর পুরস্কারের প্রত্যাশায় একটি নিবিড় বন অতিক্রম করিয়া নিরাপদে সেই গ্রামে আসিয়া রাজপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ তাহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া একটি গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, এই গৃহে বসিয়া তোমাদের সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। রাজপুরুষের প্রকাণ্ড রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা এত ভীত হইয়াছিল যে, প্রথমে তাহারা কার্য্য করিতে অসম্মত হইল, কিন্তু প্রচুর পুরস্কারের লোভে অবশেষে সম্মত হইল। তখন সেই রাজপুরুষ তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি (হাপর, জাঁতা, হাতুড়ী ইত্যাদি) সাজাইয়া দিলেন। সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি জিনিসগুলিও তাহাদিগকে দিলেন; এবং অন্য একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন,—'এই ঘরে তোমরা শয়ন করিবে, আর এই ছাগীর দুগ্ধ পান করিবে; এই দুগ্ধে তোমাদের সাত জনেরই পর্য্যাপ্ত হইবে: অন্য আহারের প্রয়োজন হইবে না; এমন সুমিষ্ট দুগ্ধ কখনও পান কর নাই, ইহা অত্যন্ত বলকারক, এবং ইহাতে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিবে। আর এই শয্যায় তোমরা সাত জনে আরাম করিয়া শয়ন করিতে পারিবে; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে, সাত দিনের মধ্যে আমার কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে, অতএব এখনই তোমরা কার্য্য আরম্ভ কর।'

স্বর্ণকারেরা রাজপুরুষের এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, কিন্তু তাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া যাহাতে দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই কার্য্যগুলি শেষ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সায়াহ্নকৃত্য শেষ করিয়া ঐ ছাগীর দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক সকলে পান করিল। তাহারা এত পরিতৃপ্ত হইল যে, রাজপুরুষকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিল। এমন সুমিষ্ট দুগ্ধ তাহারা জীবনে কখনও পান করে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দুগ্ধ পান করিবামাত্র একটা নেশার আবেশ আসিল। শয়ন করিবার জন্য তাহারা শয্যার নিকট গমন করিলে দেখিতে পাইল যে, দুই জন মাত্র লোকের শয়ন করিবার স্থান আছে। অগত্যা অপর ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঐ ছাগী ভূমিশায়ী ব্যক্তির পদ-লেহন করিতে করিতে ক্রমে ঐ হতভাগ্যের দেহের সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিল। রক্তাভাবে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময়ে একটি ভীষণ শব্দধ্বনি হইল, এবং একটি তড়িৎ আলোক-রশ্মি ঐ ঘরে দেখা গেল। তৎপরেই রাজপুত্রটি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—'ভগিনী! কেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছ? ক্ষুধা কি মিটিয়াছে?' তখন ছাগী উত্তর করিল, 'রাক্ষস ভাই! যত দিন তুমি আমায় মানুষের রক্ত দিবে, তত দিন আমার ক্ষুধা মিটিবে।' তৎক্ষণাৎ একটি ভীষণ শব্দ হইল, এবং রাজপুত্রটি মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

স্বর্ণকারেরা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিল যে, তাহাদের মধ্যে এক জন গৃহে নাই। তাহারা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। সাত দিবসের মধ্যে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; অগত্যা তাহারা অধিকতর পরিশ্রমের সহিত কাজ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় পুনরায় তাহারা ছাগীর দুগ্ধ পান করায় তন্দ্রার আবির্ভাব হইলে, শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল যে, শয্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াছে; পাঁচ জনের অধিক শয়ন করিবার স্থান নাই। অগত্যা পাঁচ জন শয্যায় ও অবশিষ্ট ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিল। সে দিবসও মধ্যরাত্রে ছাগী ভূমিশায়ী স্বর্ণকারের পদলেহন করিতে আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে সমস্ত রক্ত পান করাতে তাহারও মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব রাত্রে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজও ঠিক সেইরূপ ঘটিল। পর দিন প্রাতে স্বর্ণকারগণ নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইল যে, তাহাদের এক জন বন্ধু কোথায় নাই। অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু কিছুই ফললাভ হইল না। তাহারা অত্যন্ত হতাশ হইয়া, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিল। এইরূপে পাঁচ দিবসে পাঁচ জন স্বর্ণকার নিরুদ্দেশ হইল।

ষষ্ঠ দিবস প্রভাতে অবশিষ্ট দুই জন স্বর্ণকার পরস্পর পরামর্শ করিয়া এই রহস্য-উদ্ঘাটনে কৃতসঙ্কল্প হইল। গাঢ় নিদ্রাই তাহাদের অনিষ্টের মূল; এই জন্য তাহারা এই উপায় উদ্ভাবন করিল যে, সে দিন রাত্রে তাহারা নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে পরস্পরের কেশ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিবে। সে দিনও সন্ধ্যাকালে তাহারা ঐ ছাগীর দুগ্ধ পান করিল, এবং যেমন তন্দ্রা আসিল, অমনই উভয়ে উভয়ের কেশ পরস্পর দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া শয্যার নিকটে গিয়া দেখিল, খাটে এক জনমাত্র শুইবার উপযুক্ত স্থান আছে। অগত্যা ঐরূপ বন্ধন অবস্থায় অপর ব্যক্তি ভূতলে শয়ন করিল। আজও পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় ঐ ছাগী আসিয়া যে স্বর্ণকার ভূতলে শুইয়াছিল, তাহার পা চাটিতে লাগিল। যখন ঐ ছাগী তাহার রক্ত পান করিতে উদ্যত হইল, কেশে কেশে বন্ধন থাকায় তাহার বন্ধুর কেশে টান পড়াতে সে জাগিয়া উঠিল, এবং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বুঝিল যে, তাহারা নরশোণিতলোলুপ রাক্ষসের রাজত্বে আসিয়া পড়িয়াছে!

প্রভাত হইতে না হইতে স্বর্ণকার দুই জন কোনওরূপ ছল করিয়া বাহির হইয়া প্রাণরক্ষার্থ ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছাগী জানিতে পারিয়া এক অপূর্ব্বশ্রী অলোকসামান্যা রমণীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল, এবং করুণ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'হে স্বামিন্! আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? ওগো! আমায় ছাড়িয়া যাইও না, আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।' কিন্তু স্বর্ণকার রাক্ষসীর ছলনা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আরও বেগে ছুটিতে লাগিল। পথিমধ্যে একটি বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইয়া সে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। বিল্বতরু শিবের আশ্রয়স্থল, তাই সে একমনে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে প্রভু! আপনি ভূত, প্রেত, রাক্ষসীর সংহারকারী, আমায় এই রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রাণদান করুন।' মহাদেব তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। রমণী বিল্ববৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে ও স্বর্ণকারকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সে গাছে উঠিতে পারিল না। অগত্যা সে বৃক্ষমূলে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল,—'হে নিষ্ঠুর! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? একবার নামিয়া আইস, এত বড় গাছে উঠিতে আমার সাহস হইতেছে না, নতুবা আমি তোমার কাছে যাইতাম। আমার জীবনসর্ব্বস্ব! হৃদয়ের দেবতা! তোমায় অনুনয় করি, একবার নামিয়া আইস!' এইরূপে বক্ষে করাঘাত করিয়া সে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনিতে সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে এক রাজা মৃগয়া করিতে করিতে ঐ বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক পরমসুন্দরী রমণী ক্রন্দন করিতেছে। রাজা তাহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীর মুখে সমস্ত অবগত হইয়া তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শাখাসীন স্বর্ণকারকে ডাকিয়া বলিলেন,—'হে প্রিয় বন্ধু! তুমি কেন তোমার পরমসুন্দরী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছ? নামিয়া আইস, উহাকে গৃহে লইয়া যাও।' সত্য ঘটনা বলিলে রাজা তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না, এই বিবেচনা করিয়া স্বর্ণকার উত্তর করিল,—'হে রাজন! আপনি উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন; আমি উহাকে ত্যাগ করিয়াছি, কখনই গৃহে লইয়া যাইব না, উহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।' রাজা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'প্রজার নিকট হইতে কোন[illegible] আমরা বিনামূল্যে গ্রহণ করি না। দুই লক্ষ টাকা দিতেছি, নামিয়া আসিয়া গ্রহণ ক[illegible] স্বর্ণকার বলিল, 'বৃক্ষমূলে রাখিয়া যান। আমি শপথ করিয়াছি যে, এই রমণী চক্ষুর অন্তরাল না হইলে আমি কোনও মতে বৃক্ষ হইতে নামিব না।' অগত্যা রাজা বৃক্ষমূলে টাকা রাখিয়া মায়াবী রমণীর সহিত রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মহাসমারোহে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রাজার একটি ঘোটক, একটি কুকুর ও একটি প্রিয় সন্তান ছিল। তাহাদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। এক দিবস রাত্রে ছদ্মবেশিনী রাক্ষসী ঘোটকটিকে খাইয়া ফেলিল, এবং তাহার অস্থিগুলি অপর রাণীদিগের শয়নগৃহে নিক্ষেপ করিল। প্রভাতে যখন রাজা শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় ঘোটকটিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার আদরিণী নব মহিষীর নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুষ্টা রাক্ষসী বলিল, 'অপরাপর রাণীর গৃহে সন্ধান করুন [illegible] পাইবেন।' রাজা তৎক্ষণাৎ

অপর রাণীদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয় ঘোটকের অস্থিগুলি তাঁহাদের গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া রাজা রাণীদিগের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। রাণীরা তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা বিশ্বাস করিলেন না।

পরদিন প্রিয় কুকুরটির ঐরূপ দুর্দ্দশা হইল। তৎপরদিন তাঁহার প্রিয় পুত্র এইরূপে ভীষণ ভাবে হত হইল। অপর রাণীরা যে এই সকল হত্যার কারণ, রাজার মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহাদের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু রাজার ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইল না। অবশেষে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে রাণীদের বধাজ্ঞা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে একটি অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অনাহারে মৃত্যুই তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল। তাঁহারা কূপমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ভীষণ অনাহার-কষ্ট আর সহ্য হয় না। জঠরজ্বালায় তাঁহারা এত দূর অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা অবশেষে পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে দৈব অনুগ্রহে এক রাণী একটি সন্তান প্রসব করিলেন। তৎপর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, নবপ্রসূত সন্তানের মাংস ভক্ষণ করিয়া কিছুদিন জীবন ধারণ করিবেন। রাণীরা সংখ্যায় সাত জন ছিলেন। তাঁহারা সন্তানটিকে সাত টুকরা করিয়া সাত ভাগ করিয়া লইলেন। এইরূপে কিছু দিন জীবনধারণের পর তাঁহাদের মধ্যে আর এক জন অপর একটি সন্তান প্রসব করিলেন। জঠরানল শান্ত করিবার জন্য নবপ্রসূত সন্তানটিকে তাঁহারা সাত ভাগ করিয়া লইলেন। একে একে এইরূপে ছয় রাণী ছয়টি সন্তান প্রসব করিলেন, এবং তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে জীবনধারণ করিলেন। অবশেষে যখন সপ্তম রাণী একটি সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাহার মাংসের জন্য অন্য ছয় রাণী দাবী করিলেন। তখন ছোট রাণী বলিলেন,—'ভগিনীগণ! আমার সন্তানকে আমি হত্যা করিতে দিব না; তোমরা আমার অংশে ভোজন করিবার নিমিত্ত যে ছয় টুকরা মাংস দিয়াছ, তাহা আমি স্পর্শও করি নাই; এই লও, তোমরা ভক্ষণ কর, উহাতে তোমাদের পর্য্যাপ্ত হইবে। আমার সন্তানকে ছাড়িয়া দাও।' দেবাদিদেব মহাদেব রাণীর এই আচরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কূপমধ্যে আবির্ভূত হইলেন, এবং রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রিয় কন্যা! আমি তোমার দুঃখের কথা অনেক দিন শুনিয়াছি; কিন্তু দেখা করিবার সুবিধা না পাওয়াতে এত দিন এখানে আসিতে পারি নাই। অতঃপর আমি তোমাদের আট জনের আহারের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিব। তোমরা সাত ভগিনী ও তোমার সন্তান তাহা ভোজন করিবে।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। অতঃপর সাত রাণী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বর প্রেরিত খাদ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই রাজপুত্র বর্দ্ধিতকায় ও বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হইল। সে এক দিন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! আমার কি পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য কেহ নাই? তাঁহারা কোথায় থাকেন?' রাণী এই প্রশ্নে

মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাছা! তোমার পিতা নাই; তোমার মাতামহ জীবিত আছেন; তিনি নগরে সূত্রধরের কার্য্য করেন; তিনি আমাদের এই আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।' রাজপুত্র বলিলেন, 'মা! আশীর্ব্বাদ করুন, এবং তাঁহার অনুসন্ধানে যাইবার অনুমতি দিন; এই ভীষণ অন্ধকারময় কূপ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।' মাতা কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; কিন্তু সন্তানও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; অগত্যা মাতা স্বীকৃত হইলেন। যুবরাজ মাতামহের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

মাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যুবরাজ শীঘ্রই মাতামহের গৃহের সন্ধান করিয়া লইলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'দাদা মহাশয়! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, এবং এই নগরের যাহা কিছু আশ্চর্য্য বস্তু আছে, তাহাও দেখিব।' বৃদ্ধ 'নাতি'কে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার জন্য আমি কি তৈয়ার করিয়া দিব?' যুবরাজ উত্তর করিলেন, 'আমাকে এরূপ একটি কাঠের ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া দিন, যাহার উপর আরোহণ করিয়া আমি শূন্যমার্গে ও ভূমিতলে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারি।' সূত্রধর মাতামহ অল্প দিবসের মধ্যেই যুবরাজের মনোমত ঐরূপ একটি ঘোটক প্রস্তুত করিয়া দিলেন। যুবরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই দারু-ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক রাজবাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজদরবারে একটি কর্ম্মের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা, তাঁহার সৌজন্যে ও রাজপুত্রের ন্যায় আকার ও গঠনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন, এবং তাঁহার নবপরিণীতা রাণীর (রাক্ষসী) মহলের কর্তৃত্বভার প্রদান করিলেন। তাঁহার আগমনে নগরের মধ্যে ও রাণীর মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাণীও জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিল। রাজার মুখের ছায়া তাঁহার মুখে এত দূর প্রতিফলিত ছিল যে, রাক্ষসী দেখিয়াই চিনিতে পারিল যে, ইনি নিশ্চয়ই রাজপুত্র।

রাত্রিকালে রাক্ষসী তাহার অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। একখানি মলিন বসন পরিয়া কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া 'গোঁসাঘরে' গিয়া বসিয়া রহিল। এ দিকে রাজা নিয়মিত সময়ে শয়নগৃহে আসিয়া দেখেন যে, রাণী তথায় নাই। পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, 'মহারাজ! রাণীমা আজ সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই, কেবল কাঁদিতেছেন; তিনি এখন গোঁসাঘরে আছেন।' রাজা এই সংবাদ শুনিবামাত্র, বিশেষ অনর্থশঙ্কা করিয়া দ্রুতপদে গোঁসাঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, রাণীর নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছে। পদানত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে রাণী বলিল, 'আপনি অনুমান করেন যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে কোনও মায়া মমতা নাই; কত দিন হইল আমি আমার পিতা মাতাকে দেখি নাই, তাঁহাদের জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আমাকে এখনই সেখানে পাঠাইয়া দিন। যদি আমায় না পাঠান, তাঁহারা কে কেমন আছেন, এই সংবাদ ও 'বনস্পতি চাউল' (যে গাছে সুসিদ্ধ তণ্ডুল জন্মায় ও ঊর্দ্ধে ৮০ হাত পর্য্যন্ত যাহার আয়তন হয়) ও 'সঞ্জীবনীজল'

[illegible]

বলিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া [illegible] আমার উপর আপনার একটুও ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে একটুও বিলম্ব [illegible] আর আমার অভিলাষ যে [illegible] যুবরাজকে এই কার্যের জন্য [illegible] প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং কর্তারাণীকে (বীর পুত্র) ডাকাইয়া [illegible] আদেশ করিলেন। রাণীও তাহার পিতাকে একখানি চিঠি লিখিয়া তাহার হস্তে দিল।

যুবরাজ কালবিলম্ব না করিয়া রাক্ষস-দেশে যাত্রা করিলেন। সেই ঘোড়া [illegible] তাঁহার একমাত্র সহায়। কিছু দিন গমন করিতে, তিনি পথিমধ্যে এক দুর্ভেদ্য জঙ্গল দেখিতে পাইলেন। ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। জঙ্গলমধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ দেখিয়া ভীত হইলেন বটে, কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মামা! [illegible] ত? এখন বিদায়।' সিংহ প্রথমে তাহাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে, আজ তাহার সুপ্রভাত। অতি কোমলকায় আহার্য্য জন্তু তাহার সম্মুখে আসিয়া [illegible] কিন্তু 'মাতুল' সম্বোধনে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে ভাবিল কি, এ জন্তুটা বোধ হয় তাহার ভাগিনেয় হইবে! এই বিবেচনায় সিংহ তাহাকে [illegible] দিল। যুবরাজও ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুর সহিত এক একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পথ অতিক্রম করিলেন। বনপ্রান্তে দূরে একটি কুটীর দেখিয়া যুবরাজ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক যোগিপুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন। যুবরাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ধ্যাননিরত মহাপুরুষের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, 'যোগিবর! আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমায় বলিয়া দিন, আমি কোথায় 'বনস্পতি চাউল' 'সঞ্জীবনীয় সলিল' ও রাণীর পরিবারের সংবাদ পাইব? এই পত্রোপরি লিখিত ব্যক্তির কোথায় সন্ধান পাইব?' যোগী যুবরাজের এই কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক দিনের জন্য তাঁহার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন, এবং ইহাও স্বীকার করিলেন যে, পর দিন তাঁহাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিবেন। অতঃপর যুবরাজ আহারান্তে শয়ন করিলে উক্ত যোগী প্রজ্বলিত 'ধুনী'র আলোকে যুবরাজের বাক্স হইতে মোহরাঙ্কিত চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহার মর্মার্থ এইরূপ,—

'প্রিয় ভাই! এই পত্রবাহক তোমার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ইহাকে হত্যা করিবে ও ভোজন করিবে।—ইতি, তোমার স্নেহের 'ছাগী-রাক্ষসী'।'

যোগী এই পত্রখানি পুড়াইয়া ফেলিলেন, এবং ইহার পরিবর্তে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিলেন,—'প্রিয় ভ্রাতা! এই পত্রবাহক আমার প্রিয় পুত্র ও তোমার ভাগিনেয়। অতএব ইহার আদর যত্নের যেন ত্রুটী না হয়। ইহার হস্তে 'বনস্পতি চাউল' ও 'সঞ্জীবনীয় সলিল' পাঠাইবে, আমার বিশেষ অনুরোধ।—ইতি, তোমার স্নেহের 'ছাগী রাক্ষসী'।'

অতঃপর পত্রখানি পূর্ববৎ শীলমোহর করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। প্রভাতে যুবরাজ [illegible] তিনি তাঁহাকে রাক্ষস-রাজ্যে যাইবার পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—'বৎস! যদি বিজয়ী হও, আসিবার সময় রাক্ষসপুরীতে যে সমস্ত কঙ্কাল পাইবে, সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিও, কোনও মতে বিস্মৃত হইও না।'

অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে রাক্ষসপুরীতে উপস্থিত হইলেন। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবরাজ সেই পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত রাজপুরুষের হস্তে প্রদান করিলেন। রাক্ষস-রাজপুরুষ পত্রপাঠে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজকে তাঁহাদের-আলয়ে তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গের নিকট লইয়া গেলেন। সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল। এইরূপে আদরে রাক্ষসপুরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির উপায়চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন বৃদ্ধা মাতামহীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিদিমা! কই, তোমাদের দেশের আশ্চর্য্য জিনিস ত আমায় কিছুই দেখাইলে না? তোমাকে ও মামাকে আমি অতিশয় ভালবাসি। পাছে তোমাদের কোনও বিপদ হয়, সেই ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। দিদিমা! তোমাদের জীবন ও মৃত্যু কিসের মধ্যে আবদ্ধ আছে?' বৃদ্ধা এই ছলনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না; সে বলিল,—'নাতি! তাহার জন্য তোমার কিছু চিন্তা নাই; রাক্ষসদের জীবন অতিশয় রহস্যময়।' এই বলিয়া বৃদ্ধা যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া একটি কক্ষে লইয়া গেল। সেই গৃহে একটি বৃহৎ পিঞ্জর আছে। ঐ পিঞ্জরে কাকাতুয়া, ময়ূর, কপোত, চাতক প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী রহিয়াছে। অতঃপর রাক্ষসী বলিল,—"নাতি! এই সকল পক্ষীই আমাদিগের জীবন। ইহারা মরিলে আমরা মরিব, তজ্জন্য ইহাদিগকে এত যত্নের সহিত লালনপালন করিতেছি। এই যে দাঁড়কাক দেখিতেছ, ইহা আমার জীবন; এই কাক তোমার মামার জীবন; এই ময়ূরী তোমার মাতার জীবন।' তখন যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিদিমা! 'বনস্পতি চাউল' ও 'সঞ্জীবনীর সলিল' কোথায়?' বৃদ্ধা সাদরে সেগুলিও দেখাইয়া দিল।

অতঃপর বৃদ্ধা নাতিকে জহরতের গৃহ ও অন্যান্য অনেক আশ্চর্য্য জিনিস দেখাইল। ইত্যবসরে যুবরাজ তাহাদের ভক্ষিত জীবের স্তূপাকৃত কঙ্কালরাশির গৃহটিও দেখিয়া লইলেন।

এক্ষণে তিনি অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন কোনও দূর গ্রামে এক আত্মীয় রাক্ষসের বাটীতে সকল রাক্ষস রাক্ষসীর নিমন্ত্রণ হইল। তাহারা সকলে নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গমন করিলে, যুবরাজ প্রকৃত অবসর বুঝিয়া পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একে একে সকল পক্ষীগুলিকে বিনষ্ট করিলেন; কেবল ঐ ময়ূরীটিকে বিনাশ না করিয়া সঙ্গে লইলেন। দুর্গের ধারে রাক্ষস রাক্ষসীর মৃতদেহ সকল পর্ব্বতপ্রমাণ হইল। অতঃপর যুবরাজ 'বনস্পতি চাউল', 'সঞ্জীবনীর সলিল', বহুবিধ রত্নালঙ্কার ও উক্ত কঙ্কাল সকল সংগ্রহ করিয়া সেই যোগি-পুরুষের কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাক্ষসপুরীর সমস্ত দ্রব্যসম্ভার যুবরাজ যোগিপুরুষকে উপঢৌকন দিলেন। যোগী সেই সকল কঙ্কালের উপর 'সঞ্জীবনীর সলিল' সেচন করিতে লাগিলেন। সেই মৃতসঞ্জীবনী সলিলে সকলেই জীবিত হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে উক্ত ছয় জন স্বর্ণকারও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সম্মুখস্থিত যোগিবরকে তাহাদের অপর বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারিল, এবং আনন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। অতঃপর স্বর্ণকার যোগী তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং বলিলেন, 'আমি তোমাদের উদ্ধারসাধন ও রাক্ষসদের বিনাশসাধন মানসে এই কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছিলাম।' এক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না।

যুবরাজকেও তাঁহার সমস্ত ইতিহাস জ্ঞাপন করাইলেন, এবং সকলে একত্রিত হইয়া মন্ত্রগজরাজ ও যাবতীয় দ্রব্যাদি সহ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনরায় সেই জঙ্গলে উপস্থিত হইলে 'সিংহ-মামা', 'বাঘ খুড়া' প্রভৃতি যাবতীয় জন্তু তাহাদের এক একটি শাবক যুবরাজকে উপঢৌকন দিল। যুবরাজ ইহাদিগকেও সঙ্গে লইলেন।

এইরূপে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে যুবরাজ যাদুকরের বেশ ধারণ করিয়া সেই সাত জন স্বর্ণকার সমভিব্যাহারে রাজদরবারে উপনীত হইলেন। তিনি রাজসমীপে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক দেখাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ সম্মতি প্রকাশ করিলে যুবরাজ প্রথমে একটি বাঁশী বাজাইলেন। বাঁশী শুনিয়া যাবতীয় জন্তু যুবরাজকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে তিনি 'বনস্পতি চাউল'-বৃক্ষের শাখাটি রোপিত করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সুগন্ধি সুমিষ্ট প্রস্তুত তণ্ডুল পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সকলে তাহা ভোজন করিয়া নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। তৎপরে তিনি একটি গভীর পুষ্করিণী খনন করিলেন, এবং উহাতে সেই 'সঙ্গীতশীল সলিল' নিক্ষেপ করিবামাত্র তন্মধ্য হইতে অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীতপ্রবাহ উত্থিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যাদুকরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল। সাত দিন ক্রমাগত অবিশ্রাম সঙ্গীতলহরীতে রাজভবন মুখরিত হইতে লাগিল। সপ্তম দিনে যাদুকর 'অদ্ভুত ময়ূরী নৃত্য' দেখাইব বলিয়া রাজধানীতে প্রচার করিয়া দিলেন। বহুজনসমক্ষে এই ক্রীড়া আরম্ভ হইল। 'ময়ূরী'কে সভার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং যখন সে নৃত্য করিতে লাগিল, তখন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল যে, তাহার পার্শ্বে রাণী (রাক্ষসী) নৃত্য করিতেছে। রাজা ইহা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন, এবং গম্ভীরভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর যাদুকর 'ময়ূরী'র একটি পা ভাঙ্গিয়া দিল। তথাপি 'ময়ূরী'-নৃত্য করিতে লাগিল, এবং তাহার সহিত রাণীও (রাক্ষসী) নৃত্য করিতে লাগিল। অতঃপর যাদুকর 'ময়ূরী'র একটি পক্ষ ছেদন করিল; রাণীরও একটি হাত ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে যাদুকর 'ময়ূরী'র মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল; রাণীও বিকট রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে সভামধ্যে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন যাদুকর বলিল,— 'মহারাজ! এই রাক্ষসী আপনার জনপদধ্বংসের কারণ।'

কিয়দ্দিবস গত হইলে, সেই সাত জন স্বর্ণকার সাত রাণী ও সাত যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের সমীপে উপনীত হইলেন, এবং স্বর্ণকার যোগী মহারাজকে সমস্ত ঘটনা বিদিত করিয়া কনিষ্ঠ যুবরাজের ভ্রমণকাহিনী ও অদ্ভুত কৌশল ও বীরত্বের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজও এইরূপে তাঁহার প্রিয় মহিষী, সন্তানগণ ও যাবতীয় প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং অবশিষ্ট জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করিলেন।

প্রাচীন পুণ্ড্র-রাজ্য।

——:•:——

[লেখক-প্রণীত অমুদ্রিত "গৌড়ের ইতিহাস" হইতে উদ্ধৃত।]

পুরাণে দৃষ্ট হয়, আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে বলি নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে; তাঁহাদের নামানুসারে, তাঁহাদের স্থাপিত রাজ্যগুলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও [illegible] নাম হয়। (১)

করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম পুণ্ড্রদেশ। পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ অদ্যাপি এ দেশে পুণ্ড্র নামে বাস করিতেছে। অঙ্গদেশ হইতে আর্য্য-সভ্যতা পুণ্ড্র-রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। (২) মহাভারতের নানা স্থানে পুণ্ড্র-জাতির উল্লেখ আছে। শান্তি পর্ব্বের ৬৫তম অধ্যায়ে পুণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবী বলা হইয়াছে। যথা:—"পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। ...মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ॥" অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রগণ গজ-যুদ্ধে বিশারদ ছিল,—

"প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।

অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥

... ...

গজ-যুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত॥

তেষাং চৈঃ প্রেরিতা নাগা নরানশ্বান্ রথং নাপ।

হত্বোরাক্ষিপ্য মমৃদুঃ [illegible]॥

মনুসংহিতায় আছে,—ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণদের অদর্শন জন্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়-জাতি আচারভ্রষ্ট হইয়া যায়। পুণ্ড্রজাতির আচার

---

(১) অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামা কথিতা ভুবি।— মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১০৪।৫০।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণ হইতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রদেশের নাম হইয়াছে।

(২) এই ঘটনা এখন হইতে অন্ততঃ সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে ২৯তম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পুণ্ড্রগণ জামদগ্ন্যের ভয়ে গিরিকন্দরে লুকায়িত ছিল; ব্রাহ্মণদের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়।

তেষাং ত্ববিহিতং কর্ম্ম তদ্ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাম্।
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।
এবং তে দ্রাবিড়াভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রধর্ম্মিণঃ।

কর্ণ পর্ব্বের ২২শ অধ্যায়ে আছে,—

পুণ্ড্রস্যাগততো নাগঃ চলন্তমিব পর্ব্বতম্।
সংযেবঃ প্রবত্তাইদ্বনারাচৈরকরৎ ত্রিভিঃ।
ছিন্ন?কঃ বিযন্তারং বিবর্ম্মাধ্বজজীবিতম্।
তং কৃত্. ছিন্নং ভূঃ সহদেহবোঽশ্বমভাষাৎ।

বৌধায়ন স্মৃতিতে আছে,—আর্য্যপুরুষের পুণ্ড্র-বঙ্গাদি দেশে গমন করিলে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পুনঃস্তোম-যজ্ঞ করিতে হয়। (১) শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে আছে, ভরত রাজা পুণ্ড্রদেশের অব্রহ্মণ্য নরপতিকে জয় করেন। যথা,—

কিরাত-হূণান্ যবনান পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশান্ শকান্।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহন ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্।—৯।২০।১৮।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে আছে,—অর্জ্জুন পুণ্ড্রদিগকে জয় করিয়াছিলেন। যথা,—

ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কেশরী।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্।
তত্র তত্র চ ভূরীণি ম্লেচ্ছসৈন্যান্যনেকশঃ।
বিজিগ্যে ধনুষা রাজন্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ।

"দশকুমার-চরিতে" মিথিলা-রাজের পুণ্ড্র-রাজ্যের আক্রমণ-সঙ্কল্প ও তদ্দেশের দুর্ভিক্ষের কথা লিখিত আছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পুণ্ড্র-রাজ্যের লোক মিথিলায় যাইয়া উৎপাত করিত।

রামায়ণে পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে কোষকারদিগের দেশের উল্লেখ আছে। উত্তর-বঙ্গে পুণ্ড্র একটি প্রধান জাতি। খৃষ্ট-জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, পৌণ্ড্র-

---

(১) দেবল-স্মৃতিতে আছে,—'সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্রাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গোড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি।' এই বচনে পুণ্ড্রের নাম না থাকিলেও, যখন অঙ্গ-বঙ্গের নাম আছে, তখন পুণ্ড্রদেশ বাদ পড়ে নাই। বোধ হয়, স্মৃতির রচনা-কালে, পুণ্ড্র-রাজ্য অঙ্গের অধীন ছিল।

বর্দ্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নামক বণিক্-খাখার সন্ধান জৈনদের কল্পসূত্র-গ্রন্থে পাওয়া যায়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত স্থানে এক সময়ে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হইত। এখানে যাহারা পলুর ব্যবসায় করিত, তাহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের পুণ্ডরীক নাম ছিল। বোধ হয়, পুণ্ডরীক বা পুণ্ড্র-শব্দ হইতে পলু-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও পুণ্ড্রজাতি আপনাদিগকে পুণ্ডরীক বলিয়া থাকে। মুসলমান-রাজত্ব-কালে বহু লোক মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করায় ইহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। রেশমকীট-পালন ও রেশমোৎপাদন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই জাতির অধিকাংশ এখন বৈষ্ণবপন্থী। তেজস্বিতায় ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিনিচয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের পূর্ব্বসংখ্যা বজায় থাকিলে; এই বীর-প্রকৃতি জাতি কর্ত্তৃক হিন্দুসমাজের বল বর্দ্ধিত হইত। মহানন্দা নদী এই জাতির বাসস্থানের পশ্চিম সীমা ছিল। বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" পৌণ্ড্র-বাসের উল্লেখ আছে;—সম্ভবতঃ উহা পুণ্ড্র-দেশীয় রেশমী বস্ত্র।

করতোয়া ও মহানন্দা পুণ্ড্র-রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ নদী। মহাভারতে মহানন্দার নাম আছে। বন পর্ব্বে আছে,—পাণ্ডবেরা নন্দা ও অপরনন্দা পার হইয়া অধিবঙ্গ তীর্থে গিয়াছিলেন। নন্দা ও অপরনন্দার কোনওটি মহানন্দা হইতে পারে। অধিবঙ্গ, বোধ হয়, বঙ্গের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান। অনুশাসন পর্ব্বের ২৫শ অধ্যায়ে আছে—

> পুনরাবর্ত্তনন্দাং চ মহানন্দাং চ সেব্য বৈ।
> নন্দনে সেব্যতে দান্তস্বপ্সরোভিরহিংসকঃ॥
> উর্ব্বশীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
> লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীক-ফলং লভেৎ॥

লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, আমরা উল্লিখিত মহানন্দাকে পুণ্ড্র-রাজ্যের মহানন্দা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মহানন্দা নাম দেখিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালে ইহার তীরে ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য ছিল;—পুণ্ড্ররাজ্যই সেই রাজ্য। মহানন্দার পশ্চিম পারে সাধারণতঃ আর্য্য-বংশীয় ও পূর্ব্ব পারে অনার্য্য-বংশীয় লোকের বাস ছিল।

করতোয়া (১) পুণ্ড্ররাজ্যের একটি প্রধান নদী ছিল। হিমালয় হইতে

---

(১) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রীকবণিক 'পেরিপ্লস্ অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান্' অর্থাৎ 'আরব্য-সমুদ্রবাহি-বাণিজ্য-বিবরণ' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। খৃষ্টীয়

বঙ্গদেশের উত্তরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছিল, সে সকল বরেন্দ্রের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে না পারিয়া, উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়া করতোয়া ও মহানন্দা নাম ধারণ করিয়াছিল। করতোয়া পূর্ব্বকালে অতি প্রকাণ্ড নদী ছিল। কোনও সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন দিকের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পতিত হইত। উভয়ের প্রবাহ নিম্নবঙ্গে ৭৫ ক্রোশ অন্তরে ছিল। করতোয়া তৎকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। হরিণঘাটার নিকট সমুদ্র করতোয়াকে গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও সুন্দরবনে করতোয়া নাম্নী একটি স্রোতস্বতী আছে। মাথাভাঙ্গা করতোয়ার দেহ বলিয়া অনুমিত হয়। করতোয়া হইতে কুমার, ইছামতী নবগঙ্গা ও চূর্ণী বাহির হইয়াছিল। করতোয়া উপর দিক্ হইতে বিলুপ্ত হইলে, এই সকল নদী গঙ্গার সংস্রবে আসিয়াছে। এই সকল ঘটনা কোন্ সময়ে হয়, তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বকালে গঙ্গার প্রধান জলস্রোত ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইত। কিংবদন্তী আছে,— কোনও দৈত্য গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। পলিমাটীকে ঐ দৈত্য মনে করিলে চলিতে পারে। ভৈরব পূর্ব্বকালে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছিল; ইহা অতি প্রকাণ্ড নদ ছিল। পরে জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বাহির হইয়া ভৈরব-দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করিল; ভৈরব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ সময়ে করতোয়া মাথাভাঙ্গা নামে ভৈরবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। এই সকল নদী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। নদীয়া জেলায় বহুসংখ্যক মরা নদীর খাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোনও সময়ে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়া বড় নদী ছিল। কারণ, পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়ার উল্লেখ অধিক

শতাব্দীতে টলেমি তাঁহার ভূ-বৃত্তান্ত লেখেন। 'পেরিপ্লস্' গ্রন্থে ও টলেমির পুস্তকে কিরাদিয়া নামক প্রদেশ ও গাঙ্গি নামক সামুদ্রিক বন্দরের নাম আছে। কিরাদিয়া, বোধ হয় করতোয়ার নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান। কিরাত জাতির—কিংবা করতোয়া নদীর—নামানুসারে কিরাদিয়া নাম হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। আমার বোধ হয়, কিরাত-জাতির নামানুসারে কিরাতীয় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিরাতীয় শব্দ হইতে গ্রীক্ উচ্চারণে কিরাদিয়া হইয়াছে। করতোয়া নদীর নামও, আমার বিবেচনায় কিরাত-জাতির নাম হইতে হইয়াছে। পুরাণে আছে, গৌরী-বিবাহ-কালে, হর-কর-বিগলিত-তোয় হইতে করতোয়া নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উহা যে কাল্পনিক গল্পমাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি-মতে বগুড়া জেলার মরিচা সেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার দশকাহনিয়া সেরপুর করতোয়ার দুই পারে ছিল। উহা পার হইতে দশ কাহন কড়ি লাগিত। বক্তিয়ার খিলিজি যখন করতোয়া পার হন, তখন উহা গঙ্গার তিন গুণ বিস্তৃত ছিল। বক্তিয়ার খিলিজির ইতিহাস-লেখকেরা উহাকে ভঙ্গমতী বলিয়াছেন। করতোয়া পবিত্র নদী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মহাস্থানগড়ে করতোয়ার মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। এখন করতোয়া সামান্য নদী মাত্র।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে পুণ্ড্ররাজের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা পাঁড়ুয়া; মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীরে স্থাপিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট গঙ্গা হইতে ভাগীরথী ও পদ্মা বাহির হইয়াছিল। অনেকের অনুমান,—পদ্মা কোনও কালে, স্বতন্ত্র নদী ছিল; তখন এত বড় ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও দেবীভাগবতে পদ্মাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে। পদ্মা গঙ্গার প্রবাহ গ্রহণ করিয়া এত বড় হইয়াছে; উহার উপর দিকের প্রবাহ বিলুপ্ত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরি ও ডিবরোসের মানচিত্রে পদ্মাকে বড় নদী বলা হইয়াছে। অতএব ভাগীরথী পূর্ব্ব হইতেই ক্ষীণ হইতেছিল। ভাগীরথী যে পূর্ব্বে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দুরা পদ্মাকে পবিত্র নদী বলিয়া বিবেচনা করেন না; ভাগীরথীকেই পবিত্র নদী মনে করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, কৌশিকী নদী পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত; উহা গঙ্গায় পতিত হইলে উহার স্রোত ঘুরিয়া পদ্মার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গৌড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কেহ কেহ মহাস্থানগড়কে, কেহ বা বর্দ্ধনকুটীকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে এক মোগল-জাতি পুণ্ড্র-রাজ্য আক্রমণ করে। তাহারা পুণ্ড্রজাতির কোনও হানি করিতে না পারিয়া, পুণ্ড্র-রাজ্যের প্রজা হইয়া বাস করে। এই জাতির অধিকাংশ পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ইহারাই পোদ। পোদেরা কোচ জাতির আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া, পুণ্ড্ররাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ-বঙ্গে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়। পরে ভড়-নামক পরাক্রান্ত জাতি বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে পুণ্ড্র-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করে। এক সময়ে

ভড়েরা অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমুদয় গঙ্গাতীর অধিকার করিয়াছিল। বাঙ্গালার পাল-রাজগণের সহ ইহাদের কোনরূপ সংস্রব থাকিতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চণ্ডালেরা পুণ্ড্র-রাজ্যের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকের অনুমান; কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডালেরা বাঙ্গালার অনূপদেশের প্রাচীন অধিবাসী। ফরিদপুর অঞ্চলের চণ্ডালদের মধ্যে প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে তাহারা বঙ্গদেশে (ঢাকা প্রদেশে) বাস করিত; ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইহা সম্ভব যে, আর্য্যদের বঙ্গদেশে আগমনে, তাহারা সে দেশ ত্যাগ করিয়া নূতনোৎপন্ন বর্ত্তমান ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও যশোর প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছে। চন্দেল নামক জাতি পুণ্ড্র-রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী হইতে পারে। চন্দেলদের নামানুসারে চান্দলাই পরগণার নাম হইয়াছে। চন্দেল ও পোদদের সহস্র লক্ষ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। "শব্দকল্পদ্রুমে" পৌণ্ড্র শব্দে চন্দেল দেশের নাম আছে;—উহা মালদহ জেলার চান্দলাট পরগণা।

পুণ্ড্র-রাজ্যের নিকটেই কৌশিকী-কচ্ছ রাজ্য ছিল। কৌশিকী-কচ্ছ পরে পুণ্ড্র-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। গড়চণ্ডা, অলিচণ্ডা, ভাণ্ডার, কাণ্ডারণ, কুশিধা, ভালুকা (ভল্লূক) প্রভৃতি স্থান কৌশিকী-কচ্ছের অন্তর্গত ছিল। স্থানীয় অবস্থা দেখিলে অনুমান হয়, কাণ্ডারণে পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-স্তূপ ছিল। রাজসূয়-যজ্ঞকালে ভীমসেন পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছের রাজা মহৌজাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে ধাবিত হন।

আহীর-জাতি কোনও সময়ে পুণ্ড্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ, ভড়দের আক্রমণের পূর্ব্বে আহীর-জাতি পুণ্ড্রাজ্য আক্রমণ করে। উত্তর-বঙ্গে গোয়ালপাড়া, গোয়ালবাড়ী প্রভৃতি নামের নগরগুলির অধিকাংশ তাহাদের স্থাপিত। আহীরদের সময়ে পাহাড়পুরে (বলিহারের নয় মাইল উত্তর) একটি কালী-মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখনও তাহার প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে; এত বড় মন্দির এখন প্রায় দেখা যায় না।

পূর্ণিয়া জেলার অসুরগড় নামক স্থানে একটি গড়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। লোকে বলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে ব্রাহ্মণজাতীয় পঞ্চ ভ্রাতা অসুরদের সাহায্যে এই গড় নির্ম্মাণ করেন। পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বেণুগড় নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এই সম্বন্ধে ঐরূপ কিংবদন্তী আছে। এই সকল দুর্গ ভড় কিংবা আহীর জাতির নির্ম্মিত।

চীন পর্য্যটক হিউয়েন্‌সাং, (বৈদিক নাম হেনৎসো) ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। (১) হিউয়েন্‌সাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম পুন-ন-ফা-তন লিখিয়াছেন। হিউয়েন্‌সাং-এর মতে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীর হইতে ৬০০ লি অন্তর। ৬ লিতে ১ মাইল। কোন্ স্থান হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দূরত্ব গণিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। হিউয়েন্‌সাং-এর সময়ে উত্তর-বিহার বৃজি ও বৈশালী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উভয় রাজ্যই পুণ্ড্র-রাজ্যের পশ্চিম-সীমান্ত মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণে হিরণ্যপর্ব্বত রাজ্য ছিল; ইহার বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের। এই সময়ে ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম অঙ্গ-রাজ্যের অধীন ছিল। হিউয়েন্‌সাং লিখিয়াছেন,—"পুণ্ড্র-রাজ্যের পরিমাণ ৪০০০ লি; রাজধানীর পরিমাণ ৩০ লি; রাজ্যটি ঘন-বসতি-সম্পন্ন। ভূমি সমতল, বালুকা ও কঙ্করময়। রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়; অপর্য্যাপ্ত কাঁঠাল জন্মে। জল-বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। রাজধানীতে ২০টি সঙ্ঘারামে হীনযানমতাবলম্বী ৩০০০ বৌদ্ধ-শ্রমণ বাস করে। এক শত হিন্দু-দেবালয় আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও কার্ত্তিকেয়-উপাসক অধিক ছিল। রাজধানীর ২০ লি পশ্চিমে একটি সঙ্ঘারাম, তাহার অদূরে একটি অশোক-স্তূপ ও একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।" অঙ্গ, কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত রাজ্য সীমান্তে থাকায় বুঝা যায় যে, তখন পুণ্ড্র রাজ্য খুব বড় ছিল না। পুণ্ড্র রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে একটি বড় নদী পার হইলে কামরূপ রাজ্যে যাওয়া যায়। কামরূপে সে সময়ে ভাস্করবর্ম্মা নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। হিউয়েন্‌সাং সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনও রাজার নাম করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই রাজ্য তৎকালে কান্যকুব্জ-রাজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। হিউয়েন্‌সাং সমতটের বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"ইহার জলবায়ু কোমল। অধিবাসিগণের ব্যবহার মনোজ্ঞ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, কষ্টসহিষ্ণু ও বিদ্যোৎসাহী।"

পুণ্ড্ররাজ্য দীর্ঘকাল মগধের প্রদ্যোতন, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, কণ্ব ও অন্ধ্র-বংশীয়দের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রদ্যোতন-বংশ ১০৮ বৎসর, শিশুনাগ-বংশ ৩৬২ বৎসর, নন্দ-বংশ ১০০ বৎসর মগধে

---

(১) হিউয়েন্‌সাং-এর সময় গৌড়, বঙ্গ, হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ—এই কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

[illegible] করেন। পুণ্ড্রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে বিখ্যাত শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহুর জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন; জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সোমশর্ম্মা; মাতার নাম সোমশ্রী। চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ৭৬ বৎসর বয়সে মহীশূর-রাজ্যের অন্তর্গত হাসান্ পুর জেলার শ্রাবণবেল-গোলায় ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত আছে,—তিনি সমতটজয়ী ছিলেন। সমতটজয়ীর সাম্রাজ্য যে পুণ্ড্রদেশকে আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হূণদের কর্ত্তৃক গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে, পুণ্ড্ররাজ্য তাঁহাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। তখন পুণ্ড্র-রাজ্য কিয়ৎকালের জন্য স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল।

"কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দেবসেন নামক রাজার কন্যা দুঃখলব্ধিকার স্বয়ংবরের কথা আছে। পুণ্ড্রদেশের স্থানে স্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, মহাক্ষত্রপস্বামী রুদ্রসেন প্রভৃতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের কান্তার ও রাজার নাম ব্যাঘ্র লিখিত আছে। কান্তারকে এখন কেয়ার বলে। মহাস্থানগড়ে মহেন্দ্রসিংহ পরাক্রমের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কুমার গুপ্তের নাম ক্ষোদিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, পুণ্ড্ররাজ্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মীনসার নামক আর একটি রাজার নাম পাওয়া যায়; ইনি গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ধ্বংসকারী হূণজাতীয় লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কোনও সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সম্রাট অশোক মহাস্থানের নিকট একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ যে, বুদ্ধদেব এখানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়াছিলেন। অশোকের ভ্রাতা বীত-শোক পরিব্রাজক-বেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করিতেন। কোনও সময়ে জৈনেরা বৌদ্ধদের অপমান করিয়াছিল বলিয়া অশোক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার অনুমতি দেন, এবং তাহাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে সতর হাজার জৈনের প্রাণ যায়। পাণ্ডুয়ার গোপ-পল্লীর এক গোয়ালা জৈন-ভ্রমে বীতশোকের শিরশ্ছেদ করে। এই অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য হেতু, প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজ অঙ্গ-বঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন।

শীলবর্ষে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। বগুড়ার সন্নিহিত নাগর ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রাচীন নাম শীলবর্ষ। অনেক প্রাচীন কাগজপত্রে এই স্থানের শেলবরস্ নাম দৃষ্ট হয়,—ইহা শীলবর্ষ শব্দেরই অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে কোনও সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের ৮৫৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে আছে,—তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে সমাগত কৌশিক-গোত্রীয় কেশবদীক্ষিতকে লোহগ্রাম দান করেন।

পুণ্ড্র-রাজ্যের অন্তর্গত পাটলাচণ্ডী ও চণ্ডীপুরের রণচণ্ডীর নাম পুরাণে দৃষ্ট হয়। পাটলাচণ্ডী এখন পাতালচণ্ডী নামে প্রথিত। (১) বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, চণ্ডীপুর একটি পীঠস্থান; এখানে প্রচণ্ডা দেবী বিরাজ করেন। যথা,—"চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডবতী শিবা" (বৃহন্নীলতন্ত্র, ৫ম পটল)। "দেশাবলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও চণ্ডীপুরের নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্ররাজ্যের মধ্যে (এখন দিনাজপুর জেলায়) ধীবরদীঘী নামক একটি প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্ট হয়; উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বার শত ফুট। প্রবাদ যে, এখানে এক জন ধীবর রাজা রাজত্ব করিতেন। এই দীঘীর ভিতরে প্রায় ত্রিশ গজ-পরিমিত দীর্ঘ একটি প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত আছে। নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া অনেকে উহাকে অশোক-স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করেন। কোনও সময়ে পুণ্ড্র-রাজ্য যে অশোকের সাম্রাজ্যের অধীন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিউয়েন্‌সাং-এর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অধিপতি ছিলেন। লিখিত আছে, রাজা শশাঙ্ক গ্রহ-বৈগুণ্য হেতু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া তাহার শান্তির জন্য সরযূতীরস্থ বালার্ক-সমাজ হইতে বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ, শঙ্কর, দেববর, সুশর্ম্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি ও মাধব, এই দ্বাদশ জন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করেন। হিউয়েন্‌সাং কর্ণসুবর্ণকে কী-লো-না-সু-কা-ফা-না বলিয়াছেন। যখন তিনি কর্ণসুবর্ণে আগমন করেন, তখন তথায় লো-টো-বী-চি বা রক্তভিত্তি নামক সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। তখন এই রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারামে দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। পঞ্চাশটি হিন্দু-দেবালয় ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ লোক

(১) পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৫০৩ অধ্যায়ে ১০৮টি প্রধান তীর্থের নাম আছে। তাহাতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাটলতীর্থের নাম উক্ত হইয়াছে,—'বিপাশায়াং বিপাপস্থ পাটলঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে'।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। রাজধানী প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত ও রাজ্যের পরিধি দেড় শত ক্রোশ ছিল। রাজধানীতে বুদ্ধদেবের আত্মীয় দেবদত্তের মতাবলম্বীদের তিনটি সঙ্ঘারাম ছিল। কর্ণসুবর্ণের কোনও রাজা এক জন দক্ষিণাপথবাসী শ্রমণের প্রার্থনায়, রক্তভিত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। এখানে অশোকস্তূপও ছিল। বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া সাত দিন ধর্ম্মপ্রচার করেন,—লোকে এইরূপ বলিত।

শশাঙ্কের সহিত মালব-রাজের মিত্রতা ছিল। মালবরাজ বিদ্রোহী হইয়া কান্যকুব্জেশ্বর গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করেন। গ্রহবর্ম্মা স্থাণীশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালব-রাজ রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া মালবপতির শাসন করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবপতিকে পরাজিত করিলে, শশাঙ্ক নরেন্দ্র রাজ্যবর্দ্ধনকে স্ব-শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করেন, (৬০৬ খৃঃ) এবং কান্যকুব্জ অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যশ্রীকে গৌড়ে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। গুপ্ত নামক কোনও ব্যক্তির সাহায্যে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে পলায়ন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন কনোজ অধিকার করিয়া, ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য, কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ ও অধিকার করেন। (১) হর্ষবর্দ্ধন গৌড়ে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয়ার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু উত্তর-ভারতের সমুদয় স্থান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। ২) মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ ভাগী-

---

(১) এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজ নরেন্দ্রগুপ্তের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি রোহিতাশ্বগড় বা রোটাসগড়ের পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষোদিত আছে। অপরটি মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সামন্ত মহারাজ সৈন্যভীতের দান-বিষয়ক লিপি। ইহা তিন শত ওগ্রাব্দে, অর্থাৎ ৬১৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। অতএব জানা যাইতেছে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও শশাঙ্কের রাজ্য যায় নাই। হর্ষবর্দ্ধন ১৩ বৎসর চেষ্টা করিয়াও শশাঙ্ককে দমন করিতে পারেন নাই।

(২) হর্ষবর্দ্ধনের পর, অঙ্গ-বঙ্গ-গৌড় প্রভৃতি মগধরাজ আদিত্যসেনের অধীন হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিব্বতীয়গণ বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করে।

নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। রাজবাড়ী-ডাঙ্গা, রাক্ষসীডাঙ্গা, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, ঠাকুরবাড়ী-ডাঙ্গা প্রভৃতি কর্ণসুবর্ণের সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। রাক্ষসী-ডাঙ্গা, বোধ হয়, অশোক-স্তূপের ভগ্নাবশেষ। গুপ্তবংশীয় রাজগণ কত কাল কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। ইহার পর, গৌড়ে শূর-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কর্ণসুবর্ণের ইষ্টক-স্তূপমধ্য হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি রাজগণের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কোনও সময়ে পুণ্ড্র-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষরূপ প্রচার হইয়াছিল। এখনও অনেক স্থানে ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ পতিত রহিয়াছে। মাধাইপুরের কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বটতরুমূলে বিস্তর বৌদ্ধমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া মাধাইপুরের কালী-মন্দিরকে কোনও বৌদ্ধতান্ত্রিকদেবীর মন্দির বলিয়া বোধ হয়। এখন সে প্রাচীন মন্দির নাই; হিন্দুরা ইহার স্থলে কালী-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মাধাই-পুরের বিলের পশ্চিম-পার্শ্ব দিয়া মাঁড়গা, মাধাইপুর, ভাটরা, শান্তিপুর প্রভৃতি ঘন-বসতিসম্পন্ন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মাধাইপুর অতি বিখ্যাত স্থান ছিল। মাধাইপুরকে কখনও কখনও মাধাইসিংহের গড় বলা হয়। মাধাইসিংহ, বোধ হয়, পাণ্ডুয়ার কোনও রাজার সামন্ত বা দুর্গপাল ছিলেন।

পাণ্ডুয়ার পার্শ্বদেশে আইহোরাণী বা বহিহোরাণীর বেদী। আইহো-রাণী এখন হিন্দু-দেবী। এ দেশের মহিলাগণ সৌভাগ্য-কামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। লোকে বলে,—পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ যুবা পত্নী-সমভিব্যাহারে নিজের বাটীতে যাইতেছিলেন; এই স্থানে উপস্থিত হইলে পিপাসার্ত্ত হন। পত্নী ও শিবিকা-বাহকগণকে রাখিয়া, জলান্বেষণে দূরে গমন করেন। এমন সময়ে পাণ্ডুয়ার এক রাজকুমার বিট, চেট ও বিদূষকাদি সহ সেই স্থানে উপনীত হন, এবং ব্রাহ্মণ-পত্নীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি বল-প্রকাশে উদ্যত হন; শিবিকা-বাহকগণ ভয়ে পলায়ন করে। অশরণা ব্রাহ্মণ-জায়ার ঐকান্তিক প্রার্থনায় বেদী হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হয়; তিনি দুরাত্মগণের বিনাশ করেন। তদবধি এতদঞ্চলে ভগবতী আইহোরাণীর মাহাত্ম্য-প্রচার হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন,—পুণ্ড্রদেশ ইক্ষুবিশেষের উৎপত্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সেই ইক্ষুকে পুণ্ড্র-ইক্ষু বলে। দেশের নামানুসারে পুণ্ড্র-ইক্ষুর নাম হইয়াছে, কি পুণ্ড্র-ইক্ষুর নামানুসারে দেশের নাম হইয়াছে, নিশ্চয় বলা যায় না। পুণ্ড্র-রাজ্যের একটি পরগণার নাম উত্ত্বর পরগণা। উত্ত্বর এক প্রকার ইক্ষুর নাম; সেই ইক্ষুর নামানুসারে পরগণার নাম হইয়াছে কি না, বলা যায় না। আমার বোধ হয়, পুণ্ড্র-ইক্ষুর নামানুসারে পুণ্ড্রদেশের নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের ললাটের ত্রিপুণ্ড্রে পুণ্ড্র-ইক্ষুত্রয়ের আকারের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গঙ্গাতীরের গৌড়, পুনর্ভবা-তীরের দেবকোট ও করতোয়া-তীরের মহাস্থান,— এই রাজ্যের তিনটি প্রধান নগর ছিল; বর্দ্ধনকুটী অন্য একটি নগর।

ঘটক-কারিকার মতে—শূর-বংশীয়গণ গৌড়রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু পুণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহাদের রাজধানী ছিল, ইহা জানা গিয়াছে। তখন পাণ্ডুয়া অপেক্ষা গৌড়নগর প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল; তজ্জন্য রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। শশাঙ্ক নরেন্দ্রও 'গৌড়েশ্বর'-উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী"তে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের জয়ন্ত নামক রাজার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। জয়ন্ত ও আদিশূর একই ব্যক্তি,—ইহা আমরা "ভূশূরেণাপি রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ"—ব্রাহ্মণডাঙ্গা-নিবাসী ৺ বংশীবদন বিদ্যারত্নঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা গ্রন্থের এই বচন হইতে জানিতে পারি।

কুলাচার্য্যদের গ্রন্থে শূর-বংশীয় কবিশূর, মাধবশূর, আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, প্রদ্যুম্নশূর, বরেন্দ্রশূর ও অনুশূর, এই নয় জন রাজার নাম জানিতে পারি। (১) "লঘুভারত"-কারের মতে, আদিশূর তেজঃশেখর নামক রাজার বংশজাত। তেজঃশেখরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বাচস্পতিমিশ্রের কুলরমার মতে, আদিশূরের পিতার নাম মাধবশূর ও পিতামহের নাম কবিশূর।

আদিশূর প্রথমে সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে গৌড় রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে এক এক জন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীরের ইতিহাসে আছে, রাজা জয়াপীড় ৭৫১ খৃষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সন্ধ্যাকালে নগরে প্রবেশ করেন। তাঁহার অনুযাত্রিগণকে গঙ্গাতীরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। (২)

---

(১) রাঢীয় কুলমঞ্জরীর মতে, আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর, অবনীশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর, ও অনুশূর, এই সাত জন রাজা রাজত্ব করেন।

(২) তখন গঙ্গানদী পীরগঞ্জে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিয়াছিল।

তখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দিরে আরতি হইতেছিল। দেবনর্ত্তকী কমলা মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল। জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্য ও নৃত্য-দর্শনে মোহিত হন; কমলাও এই অপরিচিত ব্যক্তির সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের আবাসে প্রবেশ করে। কমলা সংস্কৃত জানিত, এবং তাহার বাস-গৃহের সাজ-সজ্জা স্বর্ণময় ছিল। সে সময়ে পাণ্ডুয়ায় সিংহ-ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। নগরবাসীরা এই জন্তুর বিনাশ করিতে পারে নাই। (৩) যাহা হউক, জয়াপীড়, কমলার মুখে নগরবাসীদের বিপদের কথা শুনিয়া সিংহের উদ্দেশে গমন করেন। জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার অঙ্গদ সিংহের মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে। পরদিন নগরবাসিগণের মুখে সিংহের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, জয়ন্ত সপার্ষদ ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হন, এবং সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত অঙ্গদ দেখিতে পান। ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে জয়াপীড়ের পূর্ব্বদেশাভিযান-সংবাদ পাইয়াছিলেন; অনুসন্ধানে, কমলার গৃহে তাঁহাকে পাওয়া গেল। জয়ন্ত জয়াপীড়কে সসম্মানে আপনার আলয়ে আনিয়া, আপনার কন্যা কল্যাণীদেবীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। জয়ন্ত জামাতার সাহায্যে আপনার রাজ্য বাড়াইয়া লন। তখন পুণ্ড্র-রাজ্য গৌড়, দেবকোট, মহাস্থান, সন্তোষ ও রঙ্গপুর, এই পঞ্চ প্রদেশে বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। জয়ন্ত এই সমুদয় রাজ্য জয় করিয়া 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি এত দূর সম্মানিত ছিল যে, পরবর্ত্তী কালে ভূমিশূন্য রাজারাও এই উপাধি ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। জয়াপীড় নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণী ও দেবনর্ত্তকী কমলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। কিছুকাল পরে কল্যাণী ভর্তৃকুল হইতে পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। আদিশূর তাঁহার কল্যাণমল্ল নাম দিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পুত্রাভাবে কন্যাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা বশিষ্ঠ-সংহিতাতে দৃষ্ট হয়। তখন ভূশূরের জন্ম হয় নাই। এই ঘটনার পর ভূশূরের জন্ম হয়।

আদিশূরের সময় পুণ্ড্র রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। যে সময়ে এ দেশে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় বিধি-ব্যবস্থা

(১০) পূর্ব্বকালেও সেখানে সিংহ ছিল? আমাদের দেশে কামরূপে সিংহ থাকার কথা উল্লিখিত আছে।

প্রচলিত হয় নাই। তজ্জন্য এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সহজেই লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। আদিশূর আপনার রাজ্যে বৈদিক-ধর্ম্মপ্রচারার্থ অভিলাষী হইলেন। তিনি দেখিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বেদবিধি জানেন না। তজ্জন্য তিনি কনোজরাজ্যের কোলাঞ্চ দেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পূর্ব্বে এ দেশে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধ, জৈন ও তান্ত্রিক মতের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য কাশ্মীর ও কনোজ-রাজগণের বিশেষ চেষ্টা ছিল। কাশ্মীর-রাজের সহিত পুণ্ড্ররাজের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, পুণ্ড্ররাজ্যে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র বলেন, আদিশূর কাশী-রাজের সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আধিক্য ও নিজের রাজ্যে তদভাব নিরীক্ষণ করিয়া ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কেহ বলেন, আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কাহারও মতে রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্র-পতন-দোষের শান্তির জন্য, নিজ পত্নী কাশী-রাজ-দুহিতা চন্দ্রমুখীর অনুরোধানুসারে, আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়। ফল কথা, কনোজ, কাশ্মীর, কাশী প্রভৃতি রাজ্যে তখন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল; আদিশূরও সেই চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা আসিয়াই যে আদিশূরের জন্য যজ্ঞ করেন নাই, এমন নহে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ফলে আদিশূরের পুত্র ভূশূরের জন্ম হয়। কোনও কোনও কুলপঞ্জিকাকারের এইরূপ বিশ্বাস। পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। পাণ্ডুয়ার হোমদীঘী ও ধূম-দীঘীর তীরে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঘটককারিকা বলেন, তাঁহারা বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। আদিশূর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন, বিক্রমপুরের কোনও স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল না। যে সময়ে সেন-রাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করেন, সে সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটককারিকা নাই। পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ সেন-রাজগণের বিক্রমপুর রাজধানীকে বাড়াইবার জন্য তথায় আদিশূরের রাজধানী কল্পনা করিয়া, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সেই স্থানে আনিয়াছেন।

কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, তদ্বিষয়ে নানা মত আছে।

রাঢ়ীয় শ্রেণীদের মধ্যে—আদিবরাহবংশ। এই আদিবরাহকেই [illegible] গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল ভূমিদান করেন। ছান্দড়কে আদিশূর হরিকোটি গ্রাম প্রদান করেন, উহা মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান; উহার বর্ত্তমান নাম গোপবল্লভপুরী। ত্রিবেণীতে ছান্দড়ের তীর্থাবাস [illegible] ছিল। আদিশূর যাঁহাদিগকে কত চেষ্টা করিয়া দূরদেশ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগকে নিকটে না রাখিয়া দূরে রাখিলেন কেন, বুঝা যায় না। "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-কার নিজ মত-সমর্থনের কোনও প্রমাণ দেন নাই। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, কামকোটি, হরিকোটি ও পঞ্চ-কোটিকে মালদহ জেলাতেই স্থাপন করিয়াছেন। তিনিও কোনও প্রমাণ দেন নাই! এ দিকে ঢাকা জেলার লোকেরা মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঞ্চসার গ্রামকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণেরা প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—ভট্টনারায়ণ "বেণীসংহার" নাটকের প্রণেতা। আমার তাহা বোধ হয় না; উহা ভট্টনারায়ণ সিংহ নামক কোনও ব্যক্তির রচিত। "বেণীসংহারে" ভট্টনারায়ণকে "মৃগরাজলাঞ্ছিত" উপাধিতে বিশেষিত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচ জন কায়স্থও এ দেশে আগমন করেন। কায়স্থদের কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে,—আদিশূরের সময় সাতাইশ জন কায়স্থ গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। আদিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য সাতাইশখানি গ্রাম প্রদান করেন। ঘটকের গ্রন্থ ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যে বংশের যে খুঁত ছিল, ক্রমশঃ তাহার পূরণ হইয়াছে। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সকল বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ব্রাহ্মণদের কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে,—দ্বিজগণের শুশ্রূষার জন্য ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন। বাছিয়া বাছিয়া পাঁচ জনকেই আনা হইল কেন, বুঝা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য কায়স্থদিগকে ও বৈদিকধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে আনা হইয়াছিল। রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে কায়স্থেরা বোধ হয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আসিতেন না। তাদৃশ আচার-পূত তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিয়া পথ চলিতে, বোধ হয়, তাঁহাদেরও আপত্তি হয় নাই।

বরেন্দ্রশূরের রাজত্বকালে [illegible] বরেন্দ্রভূমি নাম হয়। (১) পাল-বংশীয় রাজগণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, শূরবংশীয়গণ দক্ষিণে গিয়া অন্য একটি পুণ্ড্রনগরের পত্তন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই নগর হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহিত রাঢ়দেশে গমন করিলেন; অনেকে বরেন্দ্রদেশেই থাকিলেন। যাঁহারা রাঢ়ে গমন করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়, এবং যাঁহারা বরেন্দ্রদেশেই থাকিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আখ্যা হইল। দেশ-ভেদে এই নাম-ভেদ হইল; বাস্তবিক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ একই মূল হইতে উৎপন্ন। সে সময়ে, বোধ হয়, শূর-বংশীয় রাজগণের পক্ষে ও পাল-বংশীয় রাজগণের পক্ষে দুইটি দল হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা শূর-বংশীয়দের পক্ষে [illegible] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পাল-রাজগণের পক্ষে ছিলেন। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম প্রদান করেন; তাহা হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঁই-এর উদ্ভব হয়।

মাধবাচার্য্যের "শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে"র মতে, শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড়দেশীয় পণ্ডিতদিগকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ শূর-বংশীয়দের রাজত্বকালেই এই ঘটনা হয়। পাল-বংশীয়গণ গৌড় অধিকার করিলেও, শূর-বংশীয়গণ বহু দিন দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এ দেশে আগমন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে প্রথিত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদচর্চ্চা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। নবাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-চর্চ্চা ছিল; তজ্জন্য, ইঁহাদের বৈদিক সংজ্ঞা হয়। এই ব্রাহ্মণেরা পাল ও সেন বংশের রাজত্ব-কালে ভূমিদান পান। এক এক দল এক এক সময়ে আসিয়া যে যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদের সমাজের নাম হয়। আদিশূর যখন পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন এ দেশে সাত শত

---

(১) এই মতটি সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। কূর্ম্মপুরাণের কূর্ম্মচক্রে আছে—'প্রাচ্যাং মগধ-শোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ। বর্দ্ধমান-তমোলিপ্ত-প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥ আগ্নেষ্যাং মঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ-ত্রৈপুরকোশলাঃ॥" ইতি স্মার্ত্তধৃতজ্যোতিস্তত্ত্বান্তর্গত কূর্ম্মচক্রম্। কূর্ম্মপুরাণ নিতান্ত আধুনিক নয়, উহা শূরবংশের অগ্রেই রচিত হইয়াছিল। অতএব বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমোলিপ্ত, উদয়াদ্রি, বঙ্গ, উপবঙ্গ, ত্রৈপুর প্রভৃতি বিভাগ যে শূরবংশের অগ্রেই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণের বাস ছিল, [illegible] সরস্বতী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রদান করা হয়। ইঁহাদের অনেকে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট পুণ্ড্রক নামক স্থানে বহুসংখ্যক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় ও বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন। সরস্বতী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, পরে তাহার সপ্তশতিকা ([illegible]) [illegible] নাম হয়।

শূর-বংশীয়দের রাজত্বকালে আমারি বা আমাই প্রকাণ্ড নগর ছিল। ইহা ও ইহার নিকটবর্ত্তী যোগীলুকা, পাহাড়পুর প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়, এ সকল একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঘটনার, যোতলালা, দেবতলা, এই রাজত্বকালে বড় নগর ছিল। দিনাজপুর হইতে বগুড়া যাইবার পথের ধারে কোতলাল অবস্থিত ; এখনও ইহাতে কতিপয় হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে।

তিস্তা, আত্রেয়ী, যমুনা, করতোয়া, পুনর্ভবা, তঙ্গন, মহানন্দা, ঘর্ঘরা, নাগর ও নারদ,—এই রাজ্যের প্রধান নদ নদী ছিল। তিস্তা তিন বার নিজের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে ; নিজের পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। তিস্তা শব্দ হইতে ত্রিস্রোতা হইয়াছে ; তিব্বতীয় বর্ণগ্র ভাষায় তি ও দি শব্দের অর্থ জল। পূর্ব্বে তিস্তার জলে পরিপুষ্ট আত্রেয়ী এখন সামান্য নদী। আত্রেয়ী স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পড়িত ; এখনও দক্ষিণ বঙ্গে আত্রেয়ী নামক একটি নদী দেখা যায়। করতোয়া-তীরস্থ মহাস্থানে একটি দুর্গ ছিল। পুনর্ভবা-নদীতীরস্থ দেবকোট প্রসিদ্ধ নগর ছিল ; দেবভূতি নামক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। শূরবংশ এখন বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

যে সময়ে শূরবংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের আদি রাজা খড়্গোদ্যমের তাম্রশাসন আস্রফপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ ও জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। খড়্গবংশের রাজ্য পরে শূরবংশের অধিকৃত হয়। ইহার পর পালবংশীয়গণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

"দাঠাবংসো"

—:*:—

[সিংহলে বুদ্ধদেবের দন্ত-পূজা-বিষয়ক ইতিবৃত্ত।]

বিদেহরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি রাজগণ, কপিলবস্তুর শাক্য-সমূহ ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণলাভের পর তদীয় শবের দগ্ধাবশিষ্ট দন্ত প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তদুপরি স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়া মহাপূজা ও মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। (১) বুদ্ধদেবের অভাবে বৌদ্ধগণ তাঁহার দন্ত, কেশ প্রভৃতিকেই তাঁহার স্থানে স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করে। সিংহলে কখন কি প্রকারে এই দন্তধাতু-পূজা প্রচলিত হয়, "দাঠাবংসো" (দংষ্ট্রাবংশ) নামক পালি-গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রচয়িতা কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল ও মনোরম। সিংহলে এই গ্রন্থ অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিখিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণিত ঘটনা বিনয়-পিটকের 'মহাবগ্‌গ' ও 'মহাপরিনির্ব্বানসুত্ত' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। মহাপরিনির্ব্বানসুত্তের কথা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন (২।৩৮)। এই গ্রন্থখানিকে ঠিক ইতিবৃত্ত বলা চলে না; অনেক অদ্ভুত কথা আছে, যাহা পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের ন্যায় অবিশ্বাস্য। তথাপি এই সমস্ত বর্জ্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করিলে সিংহলে দন্ত-পূজা-প্রবর্ত্তনের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে পারা যায়। নিম্নে গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিবরণ নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃত ভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে।

'দাঠাবংসে'র রচয়িতার নাম ধর্ম্মকীর্ত্তি। তিনি নিজের সম্বন্ধে মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"'কালকনগর' বংশালঙ্কার (২) পরাক্রম নামক মহীপতি 'পরাক্রান্তিভুজে'র

---

(১) মহাপরিনির্ব্বানসুত্ত; ৬।২১-৭২,

(২) সিংহলের প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশ। মহাবংশে ইহা বর্ণিত আছে।

(৩) (পরাক্রমবাহুর) অর্থাৎ নিজের মহিষী পাণ্ডু (৪) কুলোৎপন্না বিবিধসদ্‌গুণ-শালিনী লীলাবতীকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, এবং পাণ্ডু নরেন্দ্র-বংশোৎপন্ন কুমার মধুরিন্দকে (৪) (মধুরেন্দ্র) বুদ্ধানুশাসন ও কলায় সুশিক্ষিত করিয়া রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করেন। পরাক্রম বুদ্ধ-শাসনের চিরস্থিতি বাঞ্ছা করিয়া গ্রন্থকারকে প্রার্থনা করেন, এবং তিনি তদনুসারে সিংহলের স্বদেশ-ভাষায় জিন-দন্তধাতুবংশ কবিগণকর্ত্তৃক রচিত থাকিলেও, 'নিরুত্তিয়া-মাগধিকায়' নিরুক্তিতে অর্থাৎ পালি ভাষায় তাহা সঙ্কলিত করেন।" (৫)

আবার গ্রন্থ-শেষে নিজের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যিনি চন্দ্রগোমি (৬) রচিত উত্তম শব্দ-শাস্ত্রের বিবৃতি পঞ্জিকার টীকা (রত্নমতী) করিয়াছেন, যিনি (বুদ্ধঘোষ-কৃত) 'সমন্তপাসাদিকা' নামক বিনয়ার্থ কথার ও 'অঙ্গুত্তরনিকায়' অর্থকথার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, যিনি সংযমিগণের জন্য 'বিনয়সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং যিনি সুপ্রসিদ্ধ মহাস্বামী সারিপুত্রের শিষ্য, সেই শুদ্ধাশয়, করুণাদিগুণোদয়, তর্কাগমাদিকুশল, বিশারদ, সর্ব্বত্র খ্যাতকীর্ত্তি, পরীক্ষক, শ্রদ্ধাধন, রাজগুরু, আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি শ্রোতৃজনের প্রসাদকারক এই দন্তধাতুবংশ প্রণয়ন করিলেন।" (৭)

---

(৩) সিংহলে খ্রীষ্টীয় ১১৫৩ পর্য্যন্ত নয় জন পরাক্রমবাহু নামে রাজা রাজত্ব করেন। এখানে যাঁহার নাম ধৃত হইয়াছে, তিনি প্রথম। ইঁহার স্ত্রীর নাম লীলাবতী। 'পোলন্নরুর' বা 'পুলুত্থিনগর' -নামক নগরে (ইহা অনুরাধপুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত) লীলাবতী তিনবার রাজ্য করেন, এবং তিনবারই সিংহাসন-চ্যুত হন। মহাবংশ-প্রকাশক Turnour সাহেবের মতে তাঁহার রাজ্য সময় প্রথমবার ১১৯৭—১২০০, দ্বিতীয়বার ১২০৯—১২১০, তৃতীয়বার ১২১১—১২১১।—(Vide Turnour's Mahawanso, Appendix, Lxvi.

(৪) দক্ষিণভারতের তঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর ও মাদুরা নগরে পূর্ব্বে যথাক্রমে চোল, চের ও পাণ্ডু নামক যে তামিল নরপতিগণ রাজ্য করিতেন, ইঁহাদের মধ্যে পাণ্ডুরাজগণ সিংহলের পুরোত্তর অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাণ্ডুরাজগণের মধ্যে দুই এক জন বৌদ্ধও ছিলেন,—প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুবংশেরই নাম এখানে ধৃত হইয়াছে। মধুবিন্দ বা 'মধুরেন্দ্র' শব্দে মধুরা বা মাদুরা নগরই বিবক্ষিত।—Ibid. Index and glossary p. 14.

(৫) দাঠাবংসো, ১।৪—১০।

(৬) চন্দ্রগোমী সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক। বর্দ্ধমান (১১৪০) স্বকৃত গণরত্নমহোদধিতে পাণিনি প্রভৃতির সহিত ইঁহারও নাম ধরিয়াছেন,—"শালাতুরীয়-শকটাঙ্গজ-চন্দ্রগোমি-দিগ্বস্ত্র-ভর্তৃহরি-বামন-ভোজমুখ্যাঃ।"

বোপদেবও ধাতুপাঠে "[illegible]" ইত্যাদি পদ্যে ইঁহাকেই ধরিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; (কেহ কেহ বলেন সিকা ৪৮০)। স্থান সম্বন্ধে কেহ বলেন (শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর) বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ।—Satish Vidyabhusana's Pali grammar, xviii.

(৭) দন্তধাতুজ্ঞানগাথা ১-৬।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গ্রন্থকার পরাক্রমবাহুর প্রবর্ত্তনায় তাহা রচনা করেন। সিংহলের পরাক্রমবাহু নামক রাজগণের মধ্যে ইনি প্রথম। (প্রথম টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রথম পরাক্রমবাহু বৌদ্ধ ১৬৯৬ অব্দে, অর্থাৎ খ্রী ১১৫৩ অব্দে রাজত্ব করেন। অতএব গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তিও ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি যে সারিপুত্রকে নিজের গুরু-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের শিষ্য নহেন। তিনিও প্রথম পরাক্রমবাহুর সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি পরাক্রমবাহুর মহিষী লীলাবতীর রাজত্বসময়ে পরলোকে গমন করেন।

যে ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়বিন্দুর রচয়িতা, যিনি দিঙ্‌নাগাচার্য্যের 'প্রমাণসমুচ্চয়ে'র বিবৃতি, প্রমাণবার্ত্তিক, প্রমাণবিনিশ্চয় ও প্রসন্নপাদ নামক তর্ক-গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া বহু পরিচয় পাওয়া যায়, (৮) যিনি জিন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তার্কিকের পর তর্কশাস্ত্রের উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার কৃত গ্রন্থ Wu-hing অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া চীন পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, (৯) তিনি আমাদের এই 'দাঠাবংস-কার' ধর্ম্মকীর্ত্তি হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেন না, ন্যায়বিন্দু-কার ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৯-৬৯৮ 'দাঠাবংস-কার' ধর্ম্মকীর্ত্তি দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১৫৩) বর্ত্তমান ছিলেন।

সুভাষিতাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ও সদুক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্যসংগ্রহাত্মক গ্রন্থ-সমূহে 'ধর্ম্মকীর্ত্তি' বা 'ভদন্ত ধর্ম্মকীর্ত্তির' নামে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে "সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহঃ ..." ইত্যাদি যে শ্লোকটি ধর্ম্মকীর্ত্তির নামে উদ্ধৃত, সাহিত্যদর্পণ-কারও (১০ পরিচ্ছেদ) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন স্বকীয় 'ধ্বন্যালোকে' (৩য় উদ্যোত) "লাবণ্যদ্রবিণব্যয়ে ন গণিতঃ, ক্লেশে মহান্ স্বীকৃতঃ, ..." ইত্যাদি শ্লোক ধর্ম্মকীর্ত্তির নামেই ধরিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্রও তাঁহার ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় (কাব্যমালা, ১।১৩৭ পৃঃ) ধর্ম্মকীর্ত্তির

(৮) Vide K. B. Pathak's article on the authorship of Nyayabindu in the Journal of the Bombay Branch of R. A. S, 1895, vol xix No L 1, pp. 49-59; also G. A Jacob's Note on the authorship of Nyayabindu in the Journal of the R. A. S. April 1905, pp. 361-362.

(৯) Vide Jakakasu's A Record of the Buddhist Religion, by I-tsing, pp. xlvi, 182.

বলিয়াই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুভাষিতাবলী-কারও তাহাই বলিয়াছেন।

এই কবি-ধর্ম্মকীর্ত্তি যে বৌদ্ধ, তাহা তাঁহার 'ভদন্ত'-বিশেষণই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত উভয় ধর্ম্মকীর্ত্তিই বৌদ্ধ। এখন ইহাদের মধ্যে কাহার কবিতা ঐ সকল গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণেয়।

ঐ গ্রন্থসমূহে যে সকল শ্লোক ধর্ম্মকীর্ত্তির নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই এক ধর্ম্মকীর্ত্তির লেখনী হইতে নিঃসৃত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে। তবে ইহাদেরর মধ্যে কোনও কোনও শ্লোক যে ন্যায়বিন্দুকার ধর্ম্মকীর্ত্তির, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধ্বন্যালোক-কার আনন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোক ধরিয়াছেন, বলা হইয়াছে। এই আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার সাম্রাজ্যে ছিলেন (৭৭৭—৯০৬)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্য-বিচার-চর্চ্চায় ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে (১০৫০) বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব আনন্দবর্দ্ধন ও ক্ষেমেন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে দাঠাবংসকার ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোকের উল্লেখ করিতে পারেন না। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভদন্ত ধর্ম্মকীর্ত্তি' নামে ন্যায়বিন্দুকার ভিন্ন আর কাহাকেও পাওয়া যায় না। অতএব বাধ্য হইয়া ন্যায়বিন্দুকার ধর্ম্মকীর্ত্তিকেই ঐ সকল শ্লোকের রচয়িতা বলিয়া স্থির করিতে হয়।

বাসবদত্তার "বৌদ্ধসঙ্গতিমিব অলঙ্কারভূষিতাম্" এ স্থলে (২৩৫ পৃঃ সোসাইটী সং) ধর্ম্মকীর্ত্তিরই অলঙ্কার-গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া টীকাকারগণ মনে করেন। কিন্তু এই অলঙ্কার-গ্রন্থ যে সাহিত্যসম্বন্ধীয় অলঙ্কার নহে, তাহা মূল আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। বৌদ্ধসঙ্গতির (বা সংহতির) সহিত এ অলঙ্কারের কোনও সম্বন্ধই দেখা যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক কোনও গ্রন্থ হইবে। এই জন্যই নারায়ণ সিংহ বলিয়াছেন, "অলঙ্কারো বৌদ্ধশাস্ত্রে ভূষণে পুংসি ভূষিতে।" বাসবদত্তার এই স্থলে ধর্ম্মকীর্ত্তির "বৌদ্ধসঙ্গতি" গ্রন্থ (?) কি প্রকারে উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায় না; এবং ধর্ম্মকীর্ত্তি যে প্রাচীন অলঙ্কার-লেখকগণের অন্যতম, তাহারও প্রমাণ নাই। (১০)

(১০) "Dharmakirti is one of the older writer's on Alamkara. His work Buddhasamgati is mentioned by Subandhu in the Vasavadatta," Aufrect in Weber's Indische Studien xvi. 204; and the Peterson's Introduction to the Subbhashitavali, p. 47.

এ স্থলে এ বিষয়ের আর অধিক আলোচনা না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক; পাঠকগণ অবলোকন করুন, রাঠাবংসে কি বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোনও সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ 'অমর' নগরীতে কোনও ধনী ব্রাহ্মণের বংশে 'সুমেধ' নামে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর অনভিভবনীয় কোনও কল্যাণ-পদের অন্বেষণ করিবেন বলিয়া চিন্তা করেন। অনন্তর করুণার্হ ব্যক্তিবর্গকে বিবিধ ধন-ধান্য সম্পদ প্রদান করিয়া ও নিখিল বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের সন্নিহিত 'ধার্ম্মিক' নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তত্রত্য আশ্রমে তপস্যা-সাধনে যথোচিত ধ্যান-সুখ লাভ করেন।

এক দিন সুমেধ 'অগাধজ্ঞেয়োদধিপারদর্শী' ভগবান্ দীপঙ্কর বুদ্ধকে আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যস্থিত পঙ্কলের উপর নিজের শরীরকেই সেতু-রূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া শুইয়া পড়িলেন,—যাহাতে সভিক্ষু ভগবান্ দীপঙ্কর বুদ্ধ কর্দ্দম স্পর্শ না করিয়াই ঐ পঙ্কল উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মহামুনি দীপঙ্কর তাঁহার ঐ অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সিদ্ধিলাভের উল্লেখ করিলেন; এবং তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে সুমেধ পুনর্ব্বার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (জাতক, ১ম খণ্ড, সুমেধ-কথা) অতঃপর তিনি বহুজন্ম ও বহুকাল যাবৎ বোধি-(জ্ঞান)-প্রাপ্তির বিবিধ উপায় অনুষ্ঠান করিয়া 'তুষিত' লোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সে স্থান হইতে অবতরণ করিয়া 'কপিলপুরে (কপিলবাস্তু) শাক্যকুলকেতু নৃপতি শুদ্ধোদনের মহিষী মহামায়ার উদরে সিদ্ধার্থ নামে উৎপন্ন হন।

সিদ্ধার্থ একদা উদ্যান-পথে যথাক্রমে এক একটি জরাহত, আতুর, মৃত ও প্রব্রজিত লোককে দেখিতে পাইয়া সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠেন; এবং নিশীথে 'কন্থক' নামক অশ্বের সাহায্যে প্রিয় 'ছন্দক'-সারথির সহিত রাজকুল ত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। পরে তিনি 'অনোমা' নদীর (শাক্য-প্রদেশস্থ গঙ্গার শাখা) মুক্তাফল-ধৌত সিকতাসুন্দর তটদেশে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা স্বীয় শীর্ষবন্ধন ছিন্ন করিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিলেন; ত্রিদশেশ্বর তাহা স্বর্ণ 'চংগোটে' (সম্পুটক, কৌটা, চোঙ্গা) ধারণ করিয়া স্বীয় নগরে তদ্দ্বারা 'চূড়ামণি' নামে এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর সিদ্ধার্থ সরোজযোনি (ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক আহৃত চীবরাদি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব-

ধৃত বসনযুগল, আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা ভক্তিভরে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সদনে নীলাদিবর্ণ শোভিত বারশ যোজন উচ্চ 'দুষ্য-(বস্ত্র) 'চৈত্য' নির্ম্মাণ করিলেন।

সিদ্ধার্থ বোধি-(জ্ঞান)-লাভের জন্য ছয় বৎসর অত্যন্ত অধ্যবসায় করিয়াছিলেন। তিনি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় নিসর্গোৎপন্ন বোধিবৃক্ষমূলে চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত ("তিণাসনে চুদ্দস হত্থসম্মিতে") তৃণাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সপর্ব্বত ধরণীকে কম্পিত করিয়া মার-সেনা পরাজিত করিলেন, এবং বোধি-জ্ঞান লাভ করিলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন; সশৈলকানন দশ লোকধাতু কম্পিত হইয়া উঠিল। লবণসমুদ্র শান্ত হইল; ভুবনে মহা জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল; অন্ধ বিমল লোচন লাভ করিল; বধির শব্দ শ্রবণ করিল; মূক মধুর বচনে আলাপ করিল; পঙ্গু লীলাসহকারে চরণক্ষেপ করিল; কুব্জ ঋজু ও সৌম্যশরীর হইল; অবীচি প্রভৃতি নরকের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; জন্তুগণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইল; নিরত বুভুক্ষু প্রেতসমূহের ক্ষুধাদি তিরোহিত হইল; প্রাণিগণের রোগাদি বিপত্তি শান্ত হইল।

অনন্তর তিনি চিরাভিলষিত-বোধিলাভ-জাত আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সপ্ত দিবস সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। পরে গগনাঙ্গনে উত্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাবে ত্রিদিবাধিবাসিগণের বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক সংশয় অপনোদন করিয়া, তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক জয়াসনের পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থান করিয়া সপ্ত দিবস নির্নিমেষনয়নে সেই আসন ও বোধি-বৃক্ষের অর্চ্চনা, সপ্ত দিবস স্বাধিষ্ঠিত স্থান ও জয়াসনের অন্তরালবর্ত্তী দেব-নির্ম্মিত মহার্ঘ রত্নাঙ্গনে ভ্রমণ, এবং সপ্ত দিবস বোধিদ্রুমের পশ্চিম দিকে রত্নালয়ে উপবেশন পূর্ব্বক "সমন্ত পট্‌ঠান"—নীতি (অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তিম ভাগ) চিন্তা করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে অপ্রতিহত জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরও সাত সাত দিন যথাক্রমে 'অজপাল'-বটমূলে, 'মুচলিন্দ'-বৃক্ষতলে ও 'রাজায়তন' তরুর নিম্নে সমাধি করিয়া অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল ও দন্তকাষ্ঠ আনিয়া দিলেন। (বিনয় মহাবগ্গ, ১।২—৪) চাতুর্মহারাজিক দেবগণ (দিক্‌পাল) শিলাময় পাত্র আহরণ করিয়া দিলে; বুদ্ধদেব তাহাতে বণিক্‌দ্বয়ের নিকট হইতে মধুমিশ্রিত 'পিণ্ড' (খাদ্য) গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। অতঃপর

তপস্সু ও ভল্লুক নামক বণিগ্‌দ্বয়কে ত্রিশরণে [illegible] করিয়া পূজার নিমিত্ত নিজের কেশ প্রদান করিলেন। (মহাবংশে [illegible] কেশপ্রদানের কথা নাই, ১।৪) অনন্তর বুদ্ধদেব সেই অজপাল বটবৃক্ষ-মূলে 'সহম্পতি' ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া লোকের [illegible] সংগ্রহের জন্য বারাণসীতে গমন করিলেন; এবং সেই ধর্ম্মরাজ সংযতগণের নিকেতন 'ইসিপতনে' উপস্থিত হইয়া আষাঢ়-পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে দিগন্তরাল উদ্ভাসিত হইলে, দেব ব্রহ্মাদির স্তুতিতবল-হর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিলেন। কৌণ্ডিন্য ও ব্রহ্ম প্রমুখ অষ্টাদশ কোটি লোক সেই সময়ে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাণের স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গচতুষ্টয় জানিতে পারিয়াছিল; এক মহোজ্জ্বল দীপ্তি আবির্ভূত ও বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা সকল দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্তর শাস্তা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া শিক্ষা দিতে দিতে বোধিলাভের নবম মাসে পৌষ-পূর্ণিমায় লঙ্কায় আগমন করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী (গংগাতীরে ২।২) (১) 'মহানাগবন' নামক উপবনে যক্ষগণের সমিতিতে উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক বাতান্ধকারবৃষ্টিতে তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ার্দ্দিত করেন। পরে যক্ষগণ অভয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্থান প্রদান করিলে, তিনি সেই স্থানে চর্ম্মখণ্ড বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলেন; এবং তাঁহার অদ্ভুত প্রভাবে চর্ম্মখণ্ডে অগ্নি সংযোগ হইয়া জ্বালাকলাপে চারি দিক সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। নিশাচরগণ বেগে সমুদ্রবেলায় সমবেত হইলে, তিনি তাহাদিগকে "গিরিদীপে" (গিরিদীপ) (২) আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধদেব সেই দেবসমাগমে ধর্ম্ম-দেশনা করিলে বহু কোটি প্রাণী ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর তিনি 'সুমনকূটে' (৩) মহাসুমনাকে পূজার জন্য নিজ কেশ প্রদান করিয়া জেতবনে গমন করিলেন। মহাসুমনা ঐ কেশ এক স্তূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

---

(১) সিংহলীভাষায় 'গঙ্গা' শব্দে সাধারণতঃ নদীমাত্রকেই বুঝায়। See Hand book of Sinhalese Grammar, by Siman De Silva, p 9; and the word *river* in the English-Sinhalese Dictionary, by H. M. Gunasekara, p. 607.

অতএব এ স্থানে গঙ্গা শব্দও সাধারণ নদী অর্থেই প্রযুক্ত বোধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই গ্রন্থখানি সিংহলী ভাষা হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে।

(২) "An island in which the Yakkhas were floated away from Ceylone"—M. Coomar Swami.

(৩) ইহা এখন 'শ্রীপাদ' বা 'Adam's peak' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার উপরিস্থিত বুদ্ধপদচিহ্নকে বৌদ্ধের ন্যায় হিন্দু ও মহম্মদীয়েরাও পূজা করেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] পর্বত ও সমুদ্রবাসী চুলোদর (মহোদর) ও [illegible] নামক মাতুলভাগিনেয় [illegible] জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, বুদ্ধদেব নাগদ্বীপে (৪) আগমন করেন। তিনি যে দিন নাগ-দ্বীপে উপস্থিত হন, তাহা তাঁহার বোধিলাভের পঞ্চম বর্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় উপোসথ দিবস। তিনি তাঁহাদের বিবাদ-ভঞ্জন-প্রসঙ্গে বহু নাগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, বোধিলাভের অষ্টম বর্ষে বৈশাখ-পূর্ণিমায় 'মণি-অক্ষি' নামক নাগেন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার গৃহে পঞ্চ শত ভিক্ষুর সহিত গমন করেন। তিনি সেখানে 'কল্যাণচৈত্য' সমীপে মহার্হ আসনে উপবেশন করিলে, নাগেন্দ্র তাঁহাকে দিব্য ভোজ্যে সন্তুষ্ট করিলেন। বুদ্ধদেব সে স্থানে ধর্ম্ম-দেশনা করিয়া 'সুমনকূটে' নিজের চরণাঙ্ক প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বহু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বোধিলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবনধারণ করিয়া, নবাঙ্গ-সূত্রাদি অনুশাসন প্রদান করিয়া, ভবকান্তার হইতে অসংখ্য লোককে উদ্ধার করিয়া, মল্ল রাজগণের কুশীনারা নগরে, শালকুঞ্জে, শালদ্রুমদ্বয়ের মধ্যে, মহার্হ মঞ্চে উত্তরশীর্ষে সিংহ-শয্যায় শয়ন করিয়া, বৈশাখী-পূর্ণিমার প্রথম প্রহরে মল্লরাজগণকে, মধ্যম প্রহরে সুভদ্রকে ও পশ্চিম প্রহরে ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া, প্রত্যূষে ধ্যান-সমাপত্তিতে বিহার করিতে করিতে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অনাহত বস্ত্র ও কার্পাস-তূল দ্বারা পঞ্চাশৎবার বেষ্টনপূর্ব্বক তৈল-পূর্ণ স্বর্ণ-দ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া মল্ল-রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ ১২০ হস্ত উচ্চ চন্দন দারুময় চিতার উপর স্থাপন করিলেন। স্থবির মহাকাশ্যপ ধর্ম্মরাজকে (বুদ্ধকে) বন্দনা না করিলে চিতায় অগ্নি জ্বলিবে না—দেবতাদের এই ইচ্ছা হেতু, মল্ল-রাজ্যাধিনায়কগণ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হন নাই। মহাকাশ্যপ স্থবিরের ইচ্ছায় বুদ্ধদেবের চরণযুগল বস্ত্র ও চিতা ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; এবং তাঁহার বন্দনা শেষ হইলে, আবার যথাস্থানে চলিয়া গেল। চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; কিন্তু বুদ্ধদেবের ইচ্ছায় তাহাতে

---

(৪) নাগদ্বীপ সম্বন্ধে কুমার স্বামী বলেন,—"Some islands near Jaffna, in the north of Ceylone, are yet called Nagdwn, where temples are dedicated to a *Naga Thampiran* or Snake-god. The images worshipped in them are those of Snakes. Nagdirpa is, however, supposed to be an island near Paumben.

তাঁহার শরীর ভস্মসাৎ না হইয়া চতুর্দ্দিকে মুক্তা ও কাঞ্চনপ্রভ দেহ-ধাতু সকল বিপ্রকীর্ণ হইতে লাগিল ; কেবল তাঁহার উষ্ণীষ, দুই চক্ষু ও চারিটি দন্ত,—এই সপ্ত ধাতু বিপ্রকীর্ণ হয় নাই। আকাশ হইতে নিপতিত ও মহীতল হইতে উদ্গত জলধারা ঐ চিতানল নির্ব্বাপিত করিলে, শারিপুত্র স্থবিরের অন্তেবাসী সরভু স্থবির গ্রীবা-ধাতু গ্রহণ করিয়া 'মহিয়ঙ্গন'-নামক স্থানে স্তূপে রক্ষা করিয়া কঞ্চুক চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। 'ক্ষেম' নামক মুনি চিতা হইতে বামদংষ্ট্রা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অষ্ট নরপতির (অজাতশত্রু প্রভৃতির) মধ্যে বুদ্ধদেবের দগ্ধাবশিষ্ট ধাতু-গ্রহণ নিমিত্ত বিসংবাদ উপস্থিত হইলে, দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ তাহা অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন ; বিবাদ নিবৃত্ত হইল ; এবং সেই অধিপগণ হৃষ্ট-তুষ্টমনে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়া তদ্দ্বারা চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। ইন্দ্র, গান্ধার-রাষ্ট্রবাসিগণ ও নাগ-রাজসমূহ এক একটি দংষ্ট্রা গ্রহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ক্ষেম মুনি স্বগৃহীত দন্ত-ধাতু দন্তপুরস্থ কলিঙ্গাধীশ ব্রহ্মদত্তকে অর্পণ করিলে, তিনি বিবিধ রত্নখচিত এক মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র কাশীরামও যথোচিত দন্ত-ধাতুর পূজা করিয়া পরলোকগত হইলেন। তাঁহার পুত্র সুনন্দও ভক্তিভরে সেই দন্ত-ধাতুর অর্চ্চনা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। ইহার পরেও অনেক রাজা মুনীন্দ্রের দন্ত ধাতুর সৎকার করেন।

প্রবলপরাক্রম প্রজার উপকারী 'গুহসীব' নরপতি লাভ-সৎকারলোলুপ অবিদ্যান্ধ নির্গ্রন্থগণকে (দিগম্বরজৈন) অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় বর্ণদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেও, অপর লোকে তাহা করে নাই। প্রজাবর্গ প্রত্যহই বিবিধ প্রকারে মুনীন্দ্রের দন্তধাতুর পূজা করিত। একদা তাহারা দন্তধাতুর পূজা করিয়া স্তুতি শব্দে নগরকে অত্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। সেই শব্দে নরপতি বাতায়ন খুলিয়া পূজাপরায়ণ নাগরিকবর্গকে দেখিতে লাগিলেন ; এবং অমাত্যের সহিত তদ্বিষয়ক কথোপকথনে সেই উৎসবের কারণ ও বুদ্ধদেবের প্রভাব জানিতে পারিয়া রত্নত্রয়ে অনুরক্ত হইলেন ; এবং দন্তধাতুর পূজা করিয়া তীর্থিকগণের (বৌদ্ধেতর ধর্মপ্রচারক) বৈমনস্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সৌমনস্য সম্পাদন করিবেন। তিনি তীর্থিক

নিগ্রন্থগণকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায়, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া পাটলিপুত্র নগরে গমন করিল। সেই সময়ে পাটলিপুত্রে জম্বুদ্বীপের অনন্তবলবাহন পাণ্ডু নামে নরপতি ছিলেন। তাহারা ইহার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন—"আপনি সর্বদেব-বন্দিত রাজা, কিন্তু আপনি দেবগণকে নিত্য নমস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার সামন্ত মহীপাল 'গুহসীব' সেই সমস্ত দেবতার নিন্দা করিয়া মনুষ্যের শবাস্থির পূজা করিতেছে।" পাণ্ডু ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া অপর সামন্ত নরপতি 'চিত্তযান'কে কহিলেন, "তুমি কলিঙ্গ রাষ্ট্রে গমন করিয়া গুহসীব ও তাহার অহর্নিশ-বন্দিত শবাস্থি এখানে আনয়ন কর।" চিত্তযান তদনুসারে দন্তপুরের অদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলে, কলিঙ্গাধিপতি গুহসীব সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে গজ প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। চিত্তযান তাঁহার সদভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, সমৃদ্ধ দন্তপুরে প্রবেশ করিয়া নগর-দর্শনে আনন্দিত হইলেন; এবং অবশেষে গুহসীবের প্রাসাদে আগমন করিয়া পাণ্ডু রাজার আদেশ প্রকাশ করিলেন। গুহসীব সেই দুরতিক্রম দারুণ আদেশ শ্রবণ করিলেও প্রসন্ন-মুখে চিত্তযানকে বলিলেন, "যে ব্যক্তি পরম কারুণিক বুদ্ধদেবকে অবজ্ঞা করে, সে নিজেই বঞ্চিত হয়।" চিত্তযান গুহসীবের তাদৃশ বুদ্ধ-বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণে নিজের প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন; এবং গুহসীবের সহিত মহার্ঘ ধাতুমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, শ্বেতাতপত্রের অধঃস্থিত রত্নচিত্রিত দন্তধাতু-করণ্ড (পেটিকা) দর্শন করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। কলিঙ্গনাথ করণ্ড বিবৃত করিয়া মহীতলে জানু স্থাপন ও অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বুদ্ধশ্রেষ্ঠের স্তুতি ও অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সেই দন্তধাতু হইতে একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হইলে, চিত্তযান সসৈন্যে বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অতঃপর চিত্তযান পাণ্ডু নরপতির দুরতিক্রম আদেশের কথা নিবেদন করিলে, কলিঙ্গাধিপতি 'দন্তপুর' নগরীকে ধ্বজপুষ্পধূপাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, স্বয়ং মহার্হ দন্তধাতু-করণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া, দীর্ঘপথ অতিবাহনে ক্রমে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাটলিপুত্রাধিপতি সভামধ্যে উপস্থিত গুহসীবকে নির্ভীক দেখিয়া ক্রোধে সেই নিগ্রন্থগণকে

আদেশ করিলেন যে, তাঁহার [illegible] [illegible] নির্মাণ করুক। তাহারাও তদনুসারে রাজাঙ্গনে গভীর গর্ত খনন করিয়া ও তাহাতে তীক্ষ্ণ অনল প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে ঐ দন্তধাতুও নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তৎপ্রভাবে সেই অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া রথচক্রের ন্যায় বৃহৎ একটি মনোরম পদ্ম আবির্ভূত হইল, এবং ঐ দন্তধাতু তাহার কর্ণিকার উপর অবস্থান করিতে লাগিল। মনুষ্যগণ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ানন্দপূর্ণ হৃদয়ে নানা রত্নরাজি দ্বারা তাঁহার পূজা করিল, এবং তৎপ্রতি নিজ নিজ বিরুদ্ধ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিল। কিন্তু [illegible] পাণ্ডু ইহাতেও স্বীয় বিরুদ্ধ বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিয়া, বুদ্ধ-দন্তকে লৌহকূটোপরি রাখিয়া মুদ্গরাঘাতে ভগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফলোদয় হইল না। বিস্ময়াবিষ্ট নরপতিকে কোনও ঈর্ষাপরায়ণ নির্গ্রন্থ নিবেদন করিল যে, পৃথিবীতে নারায়ণের রামাদি অনেক অবতার হইয়াছে। এই শবাস্থি তাঁহারই একজনের হইবে; অন্যথা ইহার এতাদৃশ প্রভাব কিরূপে হইতে পারে? রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যদি তোমাদের উক্তি সত্য হয়, তবে এই কূটোপরি নিমগ্ন দন্তধাতুকে আমার সম্মুখে তোমরা বিচলিত কর, এবং তজ্জন্য আমার নিকট হইতে যথোচিত বস্তু গ্রহণ কর।" শঠ তীর্থিকগণ বিচিত্র প্রকারে নারায়ণের স্তুতি করিয়া জল দ্বারা সেই দন্তধাতুকে ধৌত করিলেও তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইল না। অনন্তর বঙ্গাধিনাথ সেই তীর্থিকগণকে নিন্দা করিয়া, সেই স্থান হইতে দন্তধাতুকে উত্তোলন করিবার উপায়ের জন্য নগরীতে ভেরী-শব্দে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি কূটলগ্ন দন্তধাতু উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিবে সে রাজার নিকট হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে।

সুভদ্র নামে নগরের এক শ্রেষ্ঠীপুত্র সেই ভেরী-রব শ্রবণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে [illegible] সামাজিকগণের হৃদয়ঙ্গম ভাষায় বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "শ্রেষ্ঠি-শ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদ বহু ধন ব্যয়ে ক্রীত ভূখণ্ডে জেতবন বিহার নির্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আমার প্রপিতামহ হইতেন। আজ সেই ত্রিলোকনাথ [illegible] প্রতি আপনারা আমার ভক্তিভাব অবলোকন করুন।" সুভদ্র এইরূপে বিবিধ প্রকারে বুদ্ধদেবের গুণকীর্তন করিয়া কহিলেন যে, সেই মহাকারুণিক অনন্তজ্ঞানশালী বুদ্ধদেবের এই দন্তধাতু সেই [illegible] আকাশে উত্থিত হইয়া

চন্দ্র-ন্যায় জ্ঞান শোভা বাহনপূর্বক সকলের সম্মুখে অবলোকন করুক। দন্তধাতু তৎক্ষণাৎ আকাশে উদিত হইয়া সকলকে নিদর্শন করিল। নিগ্রন্থগণ পাণ্ডু নরপতিকে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ইহা শ্রেষ্ঠি-পুত্রের বিদ্যার বল, দন্তধাতুর প্রভাব নহে।" নরপতি কহিলেন, "ভদ্র! তুমি অপর কোনও প্রভাব প্রদর্শন কর, যাহাতে সকলেরই ঐ দন্তধাতুর প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে।" ভদ্র বুদ্ধের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে দন্তধাতুকে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিল। তাহা রাজহংসীর ন্যায় উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া সর্বজনকে আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত করিয়া কেলি করিল। অনন্তর পশ্চিমে গর্ত খনন করিয়া তাহাতে দন্তধাতু নিক্ষিপ্ত হইল, এবং মৃত্তিকায় সেই গর্ত পূর্ণ হইল; কতকগুলি হস্তী তাহা পদদলিত করিল, সেই ভূমি সহসা বিদীর্ণ হইয়া মণিময় কর্ণিকাযুক্ত কাঞ্চন-পত্রশোভিত রৌপ্যকেশরমণ্ডিত ভাস্বর চক্রপ্রমাণ একটি পদ্ম উদ্গত হইল। মুহূর্তমধ্যে দিঙ্মণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া বুদ্ধ-দন্তধাতু সেই পদ্মের উপর পরিদৃষ্ট হইল। সমবেত জনগণ তদুপরি বস্ত্র ও আভরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সাধুবাদে নগর পুণ্যময় করিয়া তুলিল।

কিন্তু সেই তীর্থিকগণ নরপতিকে ঐ ঘটনা বঞ্চনারূপে বুঝাইয়া দন্ত-ধাতুকে এক আবদ্ধ পরিখা-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরিখা তৎক্ষণাৎ হংস-মধুকরাদি-মুখরিত, কমল-পরিশোভিত সরোবরের ন্যায় হইয়া উঠিল। নরগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া নরপতিকে নিবেদন করিল যে, যে ব্যক্তি মুনিপুঙ্গবের এতাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ না হয়, তাহার প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? নৃপতি তাহাতে নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া দন্তধাতুর সৎকারে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি বিবিধ প্রকারে বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ মস্তকে দন্তধাতু স্থাপন করিলেন, এবং তদবস্থায় সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া মহোৎসবের সহিত অন্তঃপুরে (নগরাভ্যন্তরে) মহার্ঘ আসনে তাহা রক্ষা করিলেন। বিবিধ প্রকারে দন্তধাতুর পূজা হইতে লাগিল। মহীপতি তদনন্তর এক বিবিধ-রত্ন-চিত্রিত মন্দির নির্মাণ করিলেন ও গুহশীবকে নিজের ন্যায় সম্মান প্রদান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর পাণ্ডু যথোচিত রাজধর্ম পালন করিতে আসিলে 'ক্ষীরধার' নৃপতি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে ক্ষীরধার পরাজিত হন।

পাণ্ডু রাজ্যভার নিজ পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া গুহশীবকে দন্তধাতু প্রদান করিলে, তিনি স্বরাষ্ট্রে গমন করিলেন। পরে দন্তধাতুর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া পাণ্ডু মহীপতি পরলোকে দেবসমাজে নিরন্তর বাস করিলেন।

অনন্তর একদা উজ্জয়িনী-রাজকুমার দন্ত কলিঙ্গাধিপতি গুহশীবের নগরে তাঁহার সহিত অচিরকাল বিবিধ সদালাপে দন্তধাতুর বন্দনা করেন। গুহশীবের 'হেমমালা' নামে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি কুমার দন্তকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া পরমাদরে তাঁহার সহিত হেমমালার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে দন্তধাতুর পূজায় নিযুক্ত করিয়া যথাশক্তি বিভব দান করিলেন।

ক্ষীরধার নৃপতি রণাঙ্গনে নিপতিত হইলে তদীয় ভাগিনের কুমারগণ বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়া দন্তধাতু গ্রহণের জন্য নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "হয় বুদ্ধের দন্তধাতু অর্পণ কর, নয় 'জয়শ্রী জননী' সংগ্রাম কেলি কর।" গুহশীব মন্ত্রণা করিলেন যে, তাঁহার দেহে প্রাণ থাকিতে দন্তধাতু অর্পণ করিবেন না; এবং কুমার দন্তকে বলিলেন যে, তিনি যেন ব্রাহ্মণের বেশে সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে ঐ দন্তধাতু স্থাপন করেন। কুমার উত্তর করিলেন যে, সেখানে তাঁহাদের কাহারও কোনও বন্ধু, বা 'জিনচরণসরোজে' ভক্তিমান্ লোক নাই; অতএব জলনিধির পর পারে ক্ষুদ্র দেশ সিংহলে কি প্রকারে তিনি দন্তধাতু লইয়া যাইতে পারেন। গুহশীব উত্তর করিলেন যে, সিংহলে বুদ্ধের শরীর-ধাতু পূর্ব্বেই রক্ষিত আছে; বুদ্ধের ভবভয়হারী ধর্ম্ম সেখানে বর্ত্তমান, এবং অগণন ভিক্ষুসঙ্ঘ সেখানে বাস করিয়া থাকেন। সেখানে রাজা মহাসেন পরম বৌদ্ধ ও আমার অত্যন্ত অনুগত। তিনি দন্তধাতুর যথোচিত সৎকার করিবেন। কুমার দন্ত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিতগমনে যথোক্তরূপে দন্তধাতু গ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া দক্ষিণ দেশে আগমন করিলেন; এবং মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া বালুকামধ্যে তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর নগরে পুনর্ব্বার গমন করিয়া স্ত্রীকেও গুপ্তবেশে সেই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক গুল্মমধ্যে নিবাস করিয়া দন্তধাতুর পূজা করিতে লাগিলেন।

সহসা আকাশমার্গে যাইতে যাইতে কোনও মুনি সেই স্থানে বালুকা হইতে অবিরল কিরণধারা নির্গত হইতে দেখিয়া অবতরণ পূর্ব্বক দন্তধাতুর বন্দনা করিলেন; এবং সেই দম্পতির নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি

তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা এই দন্তধাতুকে নিরাপদে সিংহলে লইয়া যাও; পথে যদি কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তবে আমাকে স্মরণ করিও। এই বলিয়া মুনি অন্তরীক্ষমার্গে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই নদীবক্ষ হইতে 'পাণ্ডুরাম' নামক নাগপতি উত্থিত হইয়া বালুকা-গর্ভ-নির্গত কিরণমালা দর্শনে তাহা কি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। নাগরাজ সহসা অদৃশ্যদেহ হইয়া স্বস্থানে রত্নময় দন্তধাতু-করণ্ড গ্রাস করিয়া ফণাবিস্তারপূর্ব্বক সেই স্থানে শয়ন করিলেন। এ দিকে দম্পতি জলবিতলে যাইবার সময় দন্তধাতু দেখিতে না পাইয়া শোকে বাষ্পবারি ত্যাগ করিতে করিতে সেই মুনিবরকে স্মরণ করিলেন। সুপক্ষ-তনয় মুনি আগমনপূর্ব্বক সমস্ত অবগত হইলেন, এবং দিব্য নয়নপ্রভাবে নাগরাজকে দর্শন করিয়া নিজে সুবিশাল গরুড়-দেহ ধারণ করিয়া সমুদ্র-গর্ভে তাহার অনুসরণ করিলেন। পাণ্ডুরাম তৎক্ষণাৎ চকিতহৃদয়ে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"সকল লোকের হিতের জন্যই বুদ্ধেরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্যই ধাতুমাত্রেরই পূজা; দন্তধাতু পূজা করিয়া আমিও প্রচুর কল্যাণ লাভ করিব মনে করিয়া, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম।" তাহাকে যখন বলা হইল যে, 'সত্য বোধাই' জনগণের জন্য ইহাকে সিংহলে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন নাগরাজ তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। মুনিও তাহা আনয়ন করিয়া দম্পতিকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা পথিমধ্যে নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ক্রমে 'তাম্রলিপ্তি পট্টনে' (তাম্রলিপ্তি পত্তনে) আগমন করিলেন; এবং সহসা সিংহলগামী বণিগ্‌গণাধিষ্ঠিত এক নৌকা দেখিতে পাইলেন (৪।৪২)। সেই দ্বিজগণ (বণিক্) নাবিককে তাঁহাদের সিংহল-গমনের ইচ্ছা নিবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিলেন। সমুদ্রমধ্যে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া শান্ত হইয়া যায়, এবং নাগগণ বিবিধোপচারে দন্তধাতুর পূজা করেন। দন্তধাতু রাজ-দুহিতার কেশ-মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ইহা গগন-মণ্ডলে উত্থিত হওয়ায় নাগ প্রভৃতি নিখিলদর্শকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া 'সাধু সাধু' শব্দ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই পুনর্ব্বার তাহা গগন হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজ-কন্যার কেশকলাপেই প্রবেশ করিল। নাগগণ

ইহা দর্শন করিয়া সপ্ত দিবস অহর্নিশি উৎসব করিতে লাগিল। এ দিকে দম্পতি সহসা সমুদ্র-মধ্যে নৌকাকে গতিহীন দেখিয়া আবার সেই সুপর্ণতনয় মুনিবরকে স্মরণ করিলেন। তিনিও সমাগত হইয়া বৈনতেয় মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ভুজঙ্গগণ ভয়চকিত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর এই প্রকারে তাঁহারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কা পত্তনে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাসেনের পুত্র 'কিত্তিসিরিমেঘে'র (কীর্ত্তিশ্রীমেঘের) রাজ্যারোহণের নবম বৎসরে রাজদম্পতি সেই পত্তনে অবতরণ করিয়া এক দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। কোনও ব্রাহ্মণবর পথিকযুগলকে দেখিয়া রাত্রিতে মধুর পান-ভোজনে তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া, প্রভাতে অনুরাধপুরের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা দূরতর মার্গ অতিক্রম করিয়া অনুরাধপুরের 'প্রদ্ধার গ্রামে' (উপমালা-সহরতলী) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে ধার্ম্মিক নরপতি মহাসেনের আশায় সেখানে আসিলেন, শুনিতে পাইলেন, তিনি পূর্ব্বেই ব্যাধি-পীড়িত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কিত্তিসিরিমেঘের রত্নত্রয়ে (বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) অনুরাগ জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস লাভ করিলেন। পরে মহাগিরি নামক (অনুরাধপুরের উত্তর দিকে অবস্থিত) বিহারের কোনও ভিক্ষুর সহিত রাজার বন্ধুত্ব আছে জানিতে পারিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দন্তধাতুর বিবরণ নিবেদন করিলেন। সেই ভিক্ষুবর পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং লঙ্কাধিপতির নিকট ঐ সংবাদ বহন করিবার জন্য এক ভিক্ষুকে প্রেরণ করিলেন।

রাজা প্রমোদ-উদ্যানে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; প্রসন্নবদন সেই ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন; এবং সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি নৈমিত্তিকের নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, এক দ্বিজ-দম্পত্তি জিনের দন্তধাতু লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে। এখন তিনি সেই কথার যাথার্থ উপলব্ধি করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত মহাগিরি-বিহারে প্রস্থান করিলেন। সেখানে দন্তধাতুর দর্শনে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া বহু চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। 'ত্রিপিটক জাতক ভাণক' (কথক) তর্কাগমাদিনিপুণ বুদ্ধিমান্ ভিক্ষুগণ

ও রত্নত্রৈকশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—রত্নত্রয়) পৌরবর্গ, সকলেই সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইলেন। মুনিবরের দশন স্বভাবত ধবল ছিল, এক্ষণ তাহা মলিন বোধ হইতেছে কেন?' রাজা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই দন্তধাতু রাজহংসীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া বেগে গগনে উত্থিত হইয়া আবার অবতরণ করিল। তিনি তন্নাসনোপরি মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া, তদুপরি দন্তধাতুকে স্থাপনপূর্ব্বক জাতিপুষ্পনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন; কিন্তু দন্তধাতু সেই সমস্ত পুষ্পরাজি ভেদ করিয়া তাহাদের উপরে উত্থিত হইল; রাজা পুনর্ব্বার বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিলেও, তাহা গুপ্তভাবে না থাকিয়া উপরে উত্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ হইবার পর, নরপতি বিবিধোৎসবে দন্তধাতুর অর্চ্চনা করিলেন, এবং শ্বেতবাজিযুত মনোরম রথে দন্তধাতুকে অনুরাধপুরে আনয়ন করিয়া দেবেন্দ্রমন্দিরোপম নিজ ভবনে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিলেন। রাজা সত্বরেই সেই দন্তধাতুর জন্য মহার্ঘ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং পরম প্রীত হইয়া কুমার দন্ত ও তাঁহার পত্নীকে বিবিধোপচারে সৎকার করিয়া সম্ভ্রান্তজননিবাসোচিত কতকগুলি গ্রাম প্রদান করিলেন।

এ দিকে নাগর-নৈগম-জানপদবর্গ দন্তধাতুর অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া লোকোত্তর বুদ্ধদেবের স্তুতি করিতে করিতে সিংহলেন্দ্রকে নিবেদন করিল,— "সকল লোকের হিতের জন্যই ধর্ম্মেশ্বরের (বুদ্ধের) জন্ম হয়; আমরাও তাঁহার দন্তধাতু পূজা করিতে ইচ্ছা করি।" সিংহলেশ্বর অনুরাধপুরের উপকণ্ঠবর্ত্তী ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া প্রজাবর্গের দন্তধাতু অর্চ্চনার অভিলাষ জানাইলেন। তখন সেই ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে এক স্থবির রাজাকে নিবেদন করিলেন যে, অনুজীবিগণের প্রয়োজন সম্পাদন করা মহাপুরুষগণের স্বভাব। আপনি বসন্তকালে এই দন্তধাতু রাজভবন হইতে বহির্গত করিয়া এই প্রার্থনাকারী জনগণকে দেখাইবেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন কোনও প্রশস্ত স্থানে দন্তধাতুকে স্থাপিত করিলে নিখিল লোক তাঁহাকে দেখিতে পারে, এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইল। প্রত্যেক ভিক্ষুই নিজ নিজ বাসস্থানের কথা উল্লেখ করিল। অবশেষে রাজা মধ্যস্থ হইয়া স্থির করিলেন, দন্তধাতু নিজেই উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইবেন। রাজাজ্ঞায় নগরী বিচিত্র সজ্জায় অলঙ্কৃত হইল; নাগরিকগণ বিবিধ প্রকার উৎসবে আনন্দিত হইয়া উঠিল। লক্ষেশ্বর রাণ-পাণ্ডুর-বাজি-

যুক্ত রথবরে দন্তধাতু স্থাপিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "হে মুনীশ্বর! আপনি বোধিলাভের জন্ত যেরূপ বোধিদ্রুমমূলে গিয়াছিলেন, তীর্থিকগণের মর্দ্দনের জন্ত যেরূপ 'গণ্ডম্ব' বৃক্ষসমীপে গমন করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রচারের জন্ত যেরূপ মৃগদাবে উপগত হইয়াছিলেন, আজিও সেইরূপ আপনার পূজানুরূপ স্থানে গমন করুন।" রথ বহির্গত হইল। চতুর্দ্দিকে উৎসব-স্রোত চলিতে লাগিল। কুলস্ত্রীগণ বাতায়নপথ হইতে কনকাভরণ নিক্ষেপ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 'মহিন্দ' (মহেন্দ্র) মুনি যে স্থান ধর্ম্মকথায় পবিত্র করিয়াছিলেন, রথ নগর প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। লঙ্কেশ্বর সে স্থানে রত্ন-করণ্ড হইতে জিনদন্তধাতু বহির্গত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। নৈগম-নাগরিক-জানপদ-গণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ মগ্ন হইল। সকলেই সেই সময়ে জিনধর্ম্ম সম্বন্ধে স্ব স্ব বিরুদ্ধমত ত্যাগ করিয়া রত্নত্রয় শরণ করিল। লঙ্কেশ্বর নয় লক্ষ ধন ব্যয়ে পূজা করিয়া নগরমধ্যস্থ দন্তভবনকে আরও বর্দ্ধিত করিলেন, এবং প্রত্যহ তাহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহীপতি 'কিত্তিসিরিমেঘ' (কীর্ত্তিশ্রীমেঘ) প্রতিবৎসরই এইরূপ 'অভযুত্তর' * (অভয়োত্তর) বিহারে দন্তধাতু লইয়া গিয়া পূজা করিতেন। তিনি দন্তধাতুর ইতিবৃত্ত লিখাইয়াছিলেন। অনন্তর বুদ্ধদাস প্রভৃতি † বহু বসুধাধিনাথ এই প্রথা অবলম্বন করিয়া দন্তধাতুর সৎকার করেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* মহোগিরি, অভয়গিরি ও ধর্ম্মরুচি—এই তিনটী বিহার লঙ্কায় সুপ্রসিদ্ধ। 'অভযুত্তর' বিহার শব্দে অভয়গিরিকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

† বুদ্ধদাস (ইঁহার অপর নাম বিদ্ধু) বৌদ্ধ ৮৮২ (খ্রী ৩৩৯) অব্দে সিংহলের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ইনি আদেশ করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া ভিক্ষু ও চিকিৎসক রাখিতে হইবে।

রুদ্ধকণ্ঠ।

১

ডেপুটীগিরি পদলাভের সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হইবার তিন দিন পরে নলিনবিহারী পিতার নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ পাইল যে, তাহাকে অবিলম্বে দেশে যাইতে হইবে। রাজকার্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে তাহার এক মাস অবকাশ ছিল। নলিন এই অবসরে ওয়াল্টেয়ারে বেড়াইতে যাইবার আয়োজন করিতেছিল; কিন্তু সহসা পিতার টেলিগ্রাম পাইয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণমনে দেশে যাত্রা করিতে হইল।

বাড়ী পঁহুছিয়াই সে যখন শুনিল, তাহার অজ্ঞাতসারে পিতা তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আর এক সপ্তাহ পরে বিচিত্র যূপকাষ্ঠে তাহাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, তখন নলিন হাড়ে চটিয়া গেল। তার পর যখন সে অবগত হইল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমীদার জ্ঞানশঙ্কর রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সুরমাই তাহার ভাবী জীবনের ধ্রুবতারা, দুস্তর ভবার্ণবের তরণী, তখন দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সে শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী বসু; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র; খোদ লাটসাহেবের মনোনীত নবীন ডেপুটী; ভাবী যুগের আশা ভরসা; তাহার সহিত পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নোলক-পরা একটা অসভ্য জীবের পরিণয়! কি পরিতাপ! কি লজ্জা! কি দুর্দ্দৈব! পৃথিবী এখনও দ্বিধা বিভক্ত হইল না?

বুক ফাটিলেও অনেক সময় মানুষের মুখ ফুটে না। ব্যর্থ ক্রোধের তীব্র জ্বালা নলিনবিহারীকে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ করিলেও সে মুখ ফুটিয়া পিতা বা মাতার নিকট তাহার ক্ষোভের কারণ প্রকাশ করিতে পারিল না। পিতার নগদ দুই লক্ষ টাকার কোম্পানী কাগজের ইন্দ্রজাল তাহার রসনাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিয়াছিল। পিতার স্বভাব সে বিলক্ষণ অবগত ছিল। স্নেহে পিতার হৃদয় কুসুম অপেক্ষাও কোমল; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর হইতে পারেন, সে আশঙ্কা নলিনবিহারীর বিলক্ষণ ছিল। মাতার নিকট সে আরও শুনিল যে, পিতা বাগ্দত্ত রায়মহাশয়ের কন্যার

সহিত তাহার বিবাহ দিতে বহুকাল হইতে প্রতিশ্রুত আছেন। কেবল নলিনের শিক্ষাসমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন। রায় মহাশয়ও বন্ধুর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কন্যাকে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় শরৎ, নগেন ও বিপিন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নলিন তখন বাহিরের ঘরে বৈশাখের বিদ্যুৎভরা মেঘের মত স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। সমস্ত বিশ্বটাকে সে যদি তখনই ইচ্ছামত চূর্ণ করিতে পারিত!

শরৎ সহাস্যে বন্ধুর পাণিপীড়ন করিয়া বলিল, "এ কি কথা শুনি আজি লোকমুখে বন্ধুবর?"

নগেন নলিনের পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "এক সঙ্গে নরপতি ও প্রজাপতির অনুগ্রহ খুব কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে!"

বিপিন এক জন ক্ষুদ্র কবি। সে একখানা কৌচের উপর শুইয়া পড়িয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বলিল, "বিশেষতঃ পঞ্চদশী সুন্দরী ও অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক।"

অন্য সময়ে বন্ধুবর্গের প্রীতিসম্ভাষণে নলিনবিহারীর অন্তঃকরণ উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল; সমস্ত পৃথিবীর উপর সে অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। সে করযোড়ে বলিল, "দোহাই তোমাদের, ও কথা ছাড়িয়া দাও।"

নগেন বলিল, "মন অখণ্ডমণ্ডলাকারের গন্ধ পাইয়াছে, সে কি আর এখন লুচি ছাড়া অন্য কথা ভাবিতে পারে?"

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বিপিন সোৎসাহে বলিল, "আমি একটা কবিতাই লিখে ফেলেছি। 'যুগল মিলন'—শোন শোন।"

নলিন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। বিপিনের হস্ত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বিপিনের অপঠিত কবিতা অগত্যা অকালে মারা পড়িল।

বন্ধুত্রয় নলিনবিহারীর অপূর্ব্ব ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

বিপিন কাগজের ছিন্ন অংশগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "নলিনের সব ছেলেমানুষী। আমার এত যত্নের কবিতাটির একেবারে সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেল! ওটার যে আর কাপি নাই। বিবাহের দিন বেশ কায়দা করিয়া ছাপাইয়া বিলি করিব ভাবিয়াছিলাম।"

নলিন অতি কষ্টে এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল

না। সে বলিল, "তোমাদের কি আর কোনও কথা নাই? বিবাহের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার হাড় জ্বলিতেছে।"

নগেন বলিল, "কনে মনে ধরে নাই বুঝি?"

শরৎ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে একটু বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন দমন করিতে পারিল না; বলিল, "কনে মনে না ধরিবার কোনও কারণ ত দেখা যায় না। রায় মহাশয়ের কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষ্মী। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী নলিনবিহারীর নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।"

শরতের বিদ্রূপে নলিন অত্যন্ত বিরক্ত হইল। উত্তেজিতভাবে সে বলিল, "হইতে পারে, এই কন্যাটি তোমাদের চক্ষে অপ্সরা। কিন্তু সকলের রুচি ত আর সমান নয়? বিশেষতঃ অপরের রুচি লইয়া আমার ঘর সংসার করাও চলিতে পারে না। যে হেমপুষ্পদানে বসরাই গোলাপের স্থান, তথায় ঘেঁটু ফুল সাজাইলে কি মানায়? জুতার ধূলি পরিষ্কারের যে উপযুক্ত নয়, সে হইবে অঙ্কলক্ষ্মী।"

নগেন গম্ভীরভাবে বলিল, "অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতেছি। তা এতই যদি ভাবিয়া থাক, কর্ত্তাকে স্পষ্ট খুলিয়া বলিলেই হয়। এখনও ত সময় আছে। তোমার বাবা ত আর জোর করিয়া বিবাহ দিতে পারেন না?"

"আর দিতে চাহিলেই বা কি, তুমি ত কচিখোকাটী নও। সাফ্ জবাব দাও—'বিবাহ করিব না'!"

শরৎ আবার শ্লেষভরে বলিল, "সেটি হইবার যো নাই ভায়া! দুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাহা হইলে—থাক্ সে কথায় আর কাজ নাই।"

রুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিষ্ফল আক্রোশে নলিন মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিল। মনের মত কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সে রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল, "বাবা বিবাহ দিতেছেন; দিন; কিন্তু ইহার প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবে। এর শাস্তি যদি না দি, তবে আমার নাম নলিনবিহারী নয়।"

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি পুরুষসিংহ, বাপ! জানি জানি, বাঙ্গালীর বীরত্ব অন্তঃপুরের বাহিরে কখনও প্রকাশিত হয় না। মূর্খই হউন, আর উচ্চশিক্ষিতই হউন, সবার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত!"

২

ভবিতব্যতার বিধান অখণ্ডনীয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রজাপতি নলিন ও সুরমার

হস্ত পুষ্প-ডোরে বাঁধিয়া দিলেন। নলিনবিহারী দায়ে পড়িয়া নীরবে এই লৌকিক অত্যাচার সহ্য করিল।

সুরমার সখিগণের অনেকেই ও পুরস্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নলিনবিহারীর গর্ব্বিত উক্তির বিষয় অবগত হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া সখীরা সুরমাকে বিস্তর পরিহাসও করিয়াছিল। সুরমার বকুলফুল মৃণালিনী শরতের স্ত্রী। শরৎ রায় মহাশয়ের নিকট বহুবিধ বিষয়ে নিতান্ত বাধ্য ও কৃতজ্ঞ ছিল। সুরমার ভবিষ্যৎ তাদৃশ উজ্জ্বল নহে ভাবিয়া পত্নীর নিকট নলিনবিহারীর ব্যবহারের কথা সে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছিল। মৃণালিনী সখীর জন্ত কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু পুরুষ জাতি চিরকালই নারীর ইঙ্গিতে পরিচালিত, স্ত্রীর হস্তের ক্রীড়নক। সুতরাং তাহার ভরসা ছিল, ভবিষ্যতে সখীর কটাক্ষ-শরে নলিনবিহারীর অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। সুশিক্ষা পাইলে সুরমা স্বামীকে পদপল্লবছায়ায় অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে। পুরুষ আবার কবে স্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে?

মৃণালিনী সখীকে অনেক বিদ্যা শিখাইল। ভবিষ্যতে স্বামীকে নাকের জলে চোখের জলে ভাসাইবার অনেক উৎকৃষ্ট অব্যর্থ মন্ত্র-প্রয়োগ-বিধি শিখাইয়া দিল। শ্বশুরালয়ে যাইবার পূর্ব্বে সুরমার কানে কানে সে বলিয়াদিল, "দেখিস্ ভাই, মেয়ে মানুষের মান রাখিস্। পায়ে ধরিয়া না সাধিলে কথা কহিবি না। পুরুষ মানুষগুলোর বড় দেমাক্। কিন্তু এই অহঙ্কার চূর্ণ করাই নারীর ব্রত। নলিন বাবুর দর্প চূর্ণ করা চাই, ভুলিস্ না।"

সুরমার বৃদ্ধা পিতামহী নলিনের হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "দেখো দাদা, সুরি আমাদের আঁধার ঘরের মানিক, উহাকে যত্ন করিও। ছেলেমানুষ যদি কোনও দোষ করে ত ক্ষমা করিও।"

উচ্ছ্বসিত স্নেহে বৃদ্ধার বক্ষ অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

নলিনের মেজাজটা আদৌ ভাল ছিল না। তাহার উপর কাহারও উপদেশ সে সহ্য করিতে পারিত না। বৃদ্ধার এই অযাচিত উপদেশ বরদাস্ত করা তাহার পক্ষে বিলক্ষণ কষ্টকর হইল। সে সংক্ষেপে বলিল, "বিবেচনা করিয়াদেখা যাবে।"

উত্তরটা কিছু রূঢ় হইল; কিন্তু নলিনবিহারী তাহা গ্রাহ্য করিল না। প্রবৃত্তিও ছিল না।

নলিন আপনাকে সহস্র বার ধিক্কার দিল। অদৃষ্টকে অভিসম্পাৎ করিল;

কিন্তু বিবাহের দৃঢ় শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার নহে। নলিন তাহা বুঝিল, তাই তাহার সঞ্চিত ক্রোধরাশি নিরপরাধিনী নব বধূর উপর পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল।

মিস্ দত্ত শ্রীমতী অমিয় দেবী প্রভৃতির ন্যায় একটি আলোকপ্রাপ্তা বিদুষী ও পূর্ণ যৌবনা রূপসীকে সে হৃদয়লক্ষ্মীরূপে বরণ করিবে বলিয়া বহু দিন হইতে কামনা করিতেছিল। কিন্তু হায়! সে স্বপ্ন অকালে ভঙ্গ হইয়া গেল! তাহার পরিবর্ত্তে একটা গ্রাম্য বালিকা—তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—আজ পত্নীর আসন গ্রহণ করিয়া বসিল! হায় নিষ্ঠুর অদৃষ্ট! হা ভবিতব্যতা!

আজ পুষ্পবাসর। আলোকোজ্জ্বল অট্টালিকা আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছিল। চারি দিকে হাস্য, পরিহাস, গান, গল্প, তাম্রকূটধূমের মেঘজাল, টিকির ঘন আন্দোলন। বালক বালিকার হর্ষোচ্ছ্বাস, নব্য যুবকদিগের পলিটিক্স ও বক্তৃতা দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতেছিল। পুষ্পগন্ধ-ব্যাকুল রজনী আনন্দময়ী। কেবল নলিনবিহারীর সুখ ছিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পানে ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া নিমন্ত্রিতগণ বিদায় লইলেন। উৎসব-বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে প্রান্ত হইয়া পড়িল। নলিনের পুষ্পশয্যা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। অন্তঃপুর হইতে পুনঃপুনঃ ডাক আসিতেলাগিল। কিন্তু নলিনবিহারী তখন নানা কার্য্যে মহা ব্যস্ত!

ডাকাডাকি ও হাঁকাহাঁকির মাত্রা যখন ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইল, স্বয়ং পিতা আসিয়া বলিলেন "নলিন! বড় শ্রান্ত হইয়াছ; এখন ভিতরে যাও" তখন সে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না।

শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া নলিন দেখিল, তুষার-শুভ্র শয্যার উপর পুষ্পভার, উপাধানে পুষ্পমাল্য, কক্ষমধ্যে ফুলের ঘন সুগন্ধ। আর সেই গন্ধমাল্যচর্চ্চিত শয্যার উপর আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃতা নববধূ!

পৃথিবীর কোনও কেতাবে, কোনও সাহিত্য বা কাব্যে সে এমন বিচিত্র অসামঞ্জস্য ঘটনার বর্ণনা পাঠ করে নাই। কোনও কাব্য এমন নীরস গদ্যময় নহে। পুরাকালে একবার এক ছুঁচা অমূল্য মুক্তাহারের কতকটা এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আলোকময় যুগে এমন ঘটনা কুত্রাপি বোধ হয় সংঘটিত হয় নাই।

অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু বাতায়ন-রন্ধ্র ও রুদ্ধ কপাটের অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। সে সকল দৃষ্টি নলিনকে যেন বৃশ্চিক-বেত্রের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল। নলিন তাড়াতাড়ি আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া একখানি কৌচের উপর শয়ন করিল।

মিলনের শুভ রজনী ব্যবধানের স্মৃতি লইয়া প্রভাত হইল।

৩

উষার পুণ্য-আলোকদীপ্ত শরতের শুভ সুন্দর হাস্য পল্লীর নিভৃত কানন ও কুটীরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মা আসিতেছেন। সারা বৎসরের অবসাদ ও দৈন্য দলিত করিয়া পল্লীজীবন চঞ্চল ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীর নিভৃত মন্দিরেই ষোড়শোপচারে জননীর পূজা হইয়া থাকে।

সুরমা শারদীয় উৎসব উপলক্ষে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। বৃহৎ পুরীর-মধ্যে সেই একমাত্র বধূ। শাশুড়ীর নয়নমণি, শ্বশুরের আনন্দ-নির্ঝরিণী।

পুত্রের কল্যাণকামনায় পিতা এবার বিশেষ ঘটা করিয়া পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। জগজ্জননী আনন্দময়ী মা আসিলেন। গ্রাম নবোৎসাহে মহোৎসবে মাতি[illegible] গ্রাম্য বালকের উৎফুল্ল আনন, পল্লীবধূর আনন্দ-চঞ্চল নেত্র মাতার চতুর্দ্দিকে প্রসন্ন পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে আনন্দকলরব; কিন্তু বসু মহাশয়ের হরিষে বিষাদ ঘটিল। সপ্তমী-পূজার প্রভাতে পত্র আসিল, নলিনবিহারী লিখিয়াছে, রাজকার্য্যবশতঃ পূজা উপলক্ষে তাহার দেশে আসা ঘটিল না।

পিতা মাতা এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। সারা বৎসর পরে একমাত্র সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছিলেন, পোড়া রাজ-কার্য্য তাহাতে বাদ সাধিল! মাতা সংকল্প করিলেন, নলিনকে আর চাকরী করিতে দিবেন না। তাহার কিসের অভাব যে, সে হেয় দাসত্ব করিতে যাইবে?

সুরমা নববধূ ও সংসারপথের তরুণী পান্থ হইলেও সংসার সম্বন্ধে তাহার একটা মোটামুটী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে বুঝিল, রাজকার্য্যের ওজর একটা ছলনা। বিবাহের রজনী হইতেই তাহার অন্তর-আকাশে একখানি অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার কাল মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। স্বামীর এই ব্যবহারে তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইল।

সুরমা ধনবান পিতার আদরের সন্তান। আজন্ম সে আদর ও ভালবাসায় লালিত পালিত। তাহার অতি ক্ষুদ্র ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য পিতা

হইতে বাঁড়ীর কুকুরটি পর্য্যন্ত প্রাণপণ যত্ন করিত। স্বাভাবিক আদরে অভিমানের মাত্রা প্রবল হয়। সুরমাও বিলক্ষণ অভিমানিনী ছিল। নলিনের ব্যবহার প্রথম হইতেই তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। তার পর কর্ম্মস্থল হইতে যখন সে সুরমাকে কোনও পত্র লিখিল না, তখন তাহার অভিমান প্রবল হইল। সে ত আর বালিকা বধূ নহে। যৌবনের জোয়ার তাহার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, ভাবের বন্যায় হৃদয়তট পরিপ্লাবিত। সে স্বামীর আদর যত্নের প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু আজ প্রায় এক বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে স্বামীর সাদরসম্ভাষণ সে শুনে নাই, একখানি পত্রও সে পায় নাই। সে যে নলিনের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী, এই এক বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নলিনবিহারী সুরমাকে তাহা জানিবার অবকাশ দেয় নাই। এতটা তাচ্ছীল্য লজ্জাজনিত নহে, বিরাগ বা অশ্রদ্ধা হইতে জন্মিতে পারে। সুতরাং সুরমার হৃদয়ে আঘাতটা ক্রমশঃ গুরুতররূপেই লাগিয়াছিল।

সুরমা দারুণ অভিমানিনী, কিন্তু বুদ্ধিমতী। স্বামী তাহাকে পত্র লিখিত না, বা উপযুক্ত আদর যত্ন করে নাই, এ [illegible] সুরমা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। পরের কৃপা তাহার কিছুতেই সহ্য হইত না। এ জন্য নিজের মনস্তাপের কোনও কথা সে কখনও পিতা মাতার নিকটেও প্রকাশ করে নাই। স্বামীর ব্যবহারে তাহার হৃদয় বিলক্ষণ আহত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহাস্য আনন, সরস কথা ও সস্নেহ ব্যবহারে তাহার মানসিক গূঢ় যন্ত্রণার কথা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না। পিত্রালয়ে অবস্থান-কালে বকুলফুল, দেখনহাসি, দাঁতের মিশি প্রভৃতি শৈশবসঙ্গিনীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা নলিনবিহারী সম্বন্ধে নানা প্রশ্নজালে সুরমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সুরমা হাসিয়া হাসিয়া যথাযোগ্য উত্তরে তাহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিত। তাহারা নলিনের পত্র দেখিতে চাহিলে সুরমা অম্লানবদনে কোনও অধীত পুস্তকের প্রেমলিপির কিয়দংশ মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া যাইত। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে সে ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের ভাণ করিয়া শেষে বলিত, "কি জানি, এইখানেই ত রেখে-ছিলাম। আচ্ছা খুঁজিয়া দেখিব।" পিত্রালয়ে যে কয় মাস সে ছিল, এইরূপে সখী ও আত্মীয় জনের নিকট সে নিজের দৈন্য গোপন করিত। কিন্তু রাত্রিকালে শয্যার নিভৃত অঙ্কে সে আত্মগোপন করিতে পারিত না।

নলিন তাহাকে পত্র লিখিত না; কিন্তু সে অনেকবার অযাচিতভাবে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিত। গভীর নিশীথে যখন নিকটে কেহ থাকিত না, চারি দিক সুষুপ্তিমগ্ন, সেই সময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া পত্র লিখিতে বসিত। কিন্তু কোনও পত্র সমাপ্ত হইত না। কি বলিয়া সে পত্র লিখিবে? তুমি আমায় ভালবাস না, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি এমন করিয়া আমায় চরণসেবার অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছ; ইত্যাদি প্রকার উপন্যাসে পঠিত নানা কথা তাহার মনে আসিত বটে, কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়া সে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে? স্বামীর সহিত তাহার আজ পর্য্যন্ত একটি প্রেমের কথারও আদান প্রদান হয় নাই; অথচ সে অযাচিতভাবে কি করিয়া এই সকল বড় বড় কথা পত্রে প্রকাশ করিবে? কোনও অপরাধ সে ত করে নাই, তবে ক্ষমা-প্রার্থনাই বা কেন? না, নারী হইয়া নারীজাতির অমর্য্যাদা সে কখনও করিতে পারিবে না।

অভিমান আসিয়া আবার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিত। অসমাপ্ত পত্র অনল-কুণ্ডে স্থান লাভ করিত।

সে আশা করিয়াছিল, স্বামী পূজার বন্ধে নিশ্চয় আসিবেন। তখন একটা বুঝাপড়া হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যখন দেখিল, সে আশাও পূর্ণ হইল না, তখন নিজের উপর, স্বামীর উপর, সমগ্র বিশ্বের উপর তাহার নিদারুণ অভিমান জন্মিল। আর্ত্ত চীৎকার সে হৃদয়ের মধ্যে সবলে চাপিয়া ফেলিল। অন্তরে অগ্নির দাবদাহ, বাহিরে প্রফুল্লতার অভিনয় চলিল।

৪

শীতার্ত্ত প্রকৃতি তুষার-স্বপ্নমগ্না। পৌষের অবকাশটাও নলিনবিহারী বাহিরে কাটাইয়া দিবে, ভাবিয়াছিল; কিন্তু সকল সময় এক কৌশল খাটে না। বিশেষতঃ পিতা পূর্ব্বেই আদেশ করিয়াছেন যে, এবার দেশে আসিতেই হইবে। সমস্ত বিশ্বের উপর চটিয়া গেলেও নলিন পিতার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

সুতরাং এক দিন প্রভাতে নবীন ডেপুটীর তৈজস-পত্রপূর্ণ শকট পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া বসুবাটীর সম্মুখে গিয়া থামিল।

মধ্যাহ্নে শাশুড়ী বলিলেন, "বৌমা! তোমার আজ বড় পরিশ্রম হইয়াছে; যাও, ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম কর।"

সুরমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহের পরে—দীর্ঘ এক বৎসরের

পরে, আজ প্রথম স্বামি-দর্শন, স্বামি-সম্ভাষণের প্রথম অবসর, পরিচয়ের সূচনা।

প্রথমতঃ লজ্জা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল; তার পর সঙ্কোচ, সন্দেহ ও বিভীষিকার ছায়া ধীরে ধীরে অন্তর-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুরমা মৃদুগতিতে সতর্কভাবে স্বামীর গৃহের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে উঁকি মারিয়া দেখিল, কক্ষ-মধ্যে কেহ নাই।

দাসী চপলা উপরে উঠিতেছিল। সে বলিল, "বৌদিদি, দাদা বাবু এইমাত্র বাহিরে গেলেন। বন্ধুরা সব দেখা কর্‌তে এসেছে। মরণ আর কি! পোড়া লোকের আর সময় হয় না। দাদা বাবুকে ডাকিয়া দিব?"

সুরমা তাড়াতাড়ি চপলার হাত ধরিয়া টানিল; বলিল, "না, না, তোর কোথাও যাইতে হইবে না। ঠাকুরাণী তোকে ডাকিতেছেন।"

চপলা সুরমাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে উদ্দেশে বন্ধুদিগকে কোনও বিশেষ স্থানে পাঠাইয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। সুরমা মন্থরগতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামীর দ্রব্যসমূহ কক্ষ-মধ্যে পড়িয়া আছে। একটা বাক্সের গায় চাবি ঝুলিতেছে, ডালা উন্মুক্ত। সুরমা সসঙ্কোচে জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। নলিনের কোট, পেণ্টুলেন, টুপি, ছড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি সে একে একে স্পর্শ করিল। স্বামীকে সে আজ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার ত অবসর পায় নাই! দ্রব্যগুলি স্পর্শ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় কেন?

সুরমা চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ দেখিতেছে না! তখন সে উন্মুক্ত বাক্সটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কাগজ, কলম, নানাবিধ ফটো বাক্সের মধ্যে সজ্জিত। সুরমা এক একটি করিয়া জিনিসগুলি দেখিতে লাগিল। নলিনের ফটোখানি লইয়া অনেকক্ষণ দেখিল। এত দিন সে ভাল করিয়া চোখের দেখাও দেখিতে পায় নাই!

এখানি কি? চমৎকার খাতা ত! সুরমা বাঁধান খাতাখানি তুলিয়া দেখিল, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"দৈনিক লিপি।"

মুগ্ধের ন্যায় সুরমা খাতাখানি খুলিয়া ফেলিল। পড়িতে পড়িতে সে দেখিল, এক স্থানে লেখা রহিয়াছে, "জীবনের সুখ, সাধ, আশা সব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাহার বলে লোকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে, সে শক্তি আমার নাই। স্ত্রী সেই শক্তি; আমার স্ত্রী নাই। যাহার সহিত পিতা বিবাহ দিয়াছেন, তাহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মন যাহাকে চায় না, তাহাকে লইয়া সংসার করিব কিরূপে? বাবা আমার জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন; আমি সেই হতভাগিনী হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। হৃদয়ে তেজ নাই, আনন্দ নাই, কিছু নাই। পাপ চুকিলে বাঁচিতাম * *।"

যুবতীর হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল ততোধিক বেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষে ভাল দেখা যায় না; কিন্তু তথাপি সে পড়িয়া চলিল।

"ভালবাসা হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। অপাত্রে প্রণয় ন্যস্ত করা অসম্ভব। আদর্শের স্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চির অভিসম্পাত মস্তকে বহন করিয়া অবশিষ্ট দিনগুলি কোনও রূপে কাটাইতে হইবে, ইহাই বিধিলিপি দেখিতেছি। এমন অযোগ্য সংঘটন পৃথিবীতে কেন ঘটে? যন্ত্রণায় দিবানিশি জ্বলিতেছি। যাহার সংস্রব বিষাক্ত, তাহাকে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পাছে মিশিতে হয় বলিয়া এবার পূজায় দেশে গেলাম না। কিন্তু এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিব কিরূপে? ভগবান্! যদি তুমি থাক, এই নাগপাশের বন্ধন হইতে আমায় উদ্ধার কর * * *।"

সুখের কল্পনা মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল; আশার ক্ষীণ আলোকরেখা একটা ফুৎকারে নিবিয়া গেল। একটু পূর্ব্বেই সে ভাবিয়াছিল, অদৃষ্টের গতি সে ফিরাইতে পারিবে।

চক্ষু ফাটিয়া সুরমার বুকের রক্ত যেন অশ্রুর আকারে প্রবাহিত হইল। এই সংসার? এই সুখ? ইহার জন্যই মানুষ এত ব্যাকুল?

সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া যুবতী বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইল। কক্ষ ত্যাগ করিবার আর সময় ছিল না।

নলিন দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে প্রথমতঃ অতটা লক্ষ্য করে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি লইতে গিয়া সে দেখিল, কে এক জন বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

নলিন বুঝিল; বিরক্ত হইল। প্রকাশ্যে বলিল, "রাজ্যের লোকের এই ঘর দরকার, একটু নির্জ্জনে থাকিবারও যো নাই; কি মহাপাতক!"

সুরমা আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। দুর্জ্জয় অভিমান

তাহার অন্তরকে নির্বাক করিয়া রাখিল। নিদারুণ বেদনায় [illegible] হৃদয় যেন চূর্ণ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে নলিনবিহারী মাতাকে বলিল, "মামার বাড়ী [illegible] [illegible] আজ রামজীপুরে যাইবে; আমিও সেই সঙ্গে [illegible] দেখিয়া আসিব। ইহার পর আর সুবিধা হইবে না।"

মা বলিলেন, "সে কি! সবে আজ এলি, দু' দিন বিশ্রাম কর, তার পর এক দিন যাস।"

"না মা; কোর্টে সাত দিনের ছুটী; আজ না গেলে আর যাওয়া হইবে না। আমি শীঘ্রই আসিব। বাবাকে বলিয়াছি, তিনি অনুমতি দিয়াছেন।"

মাতা ভাবিলেন, 'তা সত্য কথা। তবে কিছু কষ্ট হইবে। তা আর কি করিব? নলিন অনেক দিন সে দিকে যায় নাই, দাদা খুব দুঃখিত হইতে পারেন।' অগত্যা তিনি সম্মতি দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় গাড়ীতে নলিন মাতুলালয়ে গেল। সুরমা ভাবিল, ইহাও একটা ছলনা। আসল কথা সে বেশ বুঝিয়াছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমানিনী শাশুড়ীর চরণসেবায় মন দিল।

৫

আরাম-কেদারায় বসিয়া নলিনবিহারী সিগার টানিতেছিল। বারাণ্ডার নিম্নে ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস। অপরাহ্নের রবিকিরণ-দীপ্ত লোহিত মেঘমালা আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বাতাস গোলাপ-কুঞ্জের ঘন সুগন্ধ বহন করিয়া বহিতেছিল।

নলিন ভাবিল, সুন্দরী প্রকৃতির উদার অনবদ্য মহিমশ্রী অনুভব করিবার শক্তি তাহার কোথায় গেল? সমস্ত বিশ্ব শুধু শূন্যময়; কার্য্যে সুখ নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই। পৃথিবীর কাহারও কোনও প্রকার অনিষ্ট সে আজ পর্য্যন্ত করে নাই, তবে তাহার অদৃষ্টে এ অভিসম্পাত কেন? শাস্ত্রে বলে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু তাহার অদৃষ্টেই শাস্ত্র-বাক্য এমন মিথ্যা হইয়া গেল! অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত সম্মান, বীণাপাণির আশীর্ব্বাদ সমস্তই তাহার অনুকূল; তবে কেন আদর্শপত্নীলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না? চিরকাল যাহা লাভ করিবার জন্য সে এত কামনা এত সাধনা করিয়াছে, কোন্ অপরাধে সেই আদর্শ আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইল না?

তা 'র পরিবর্ত্তে অশুভ গ্রহের মত একটা গ্রাম্য বালিকা তাহার জীবনাকাশে উদিত হইল!

হায় নলিন! এত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াও তুমি বুঝিলে না যে, আদর্শকে আজ পর্য্যন্ত কেহ লাভ করিতে পারে নাই। আবহমানকাল হইতে লোকে আদর্শের আশায় ছুটিতেছে; কিন্তু আদর্শ কোথায়? আদর্শ প্রেম, আদর্শ ভালবাসা, বা যাহা কিছু আমরা আদর্শ বলি, বস্তুতঃ তাহা আদর্শের ছায়া-মাত্র; প্রকৃত আদর্শ নহে। বিশ্ব-সুন্দরই একমাত্র আদর্শ; অন্য সব তাঁহার ছায়া।

কিন্তু নলিন তাহা বুঝে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে শিক্ষা হয় না। বিদ্যার জাহাজ হইলেও পৃথিবীর সাড়ে পনের আনা লোক তাহা বুঝে না। নিজের সম্বন্ধে মানুষ এমনই অন্ধ।

কক্ষে কক্ষে আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নলিন তখনও নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া জীবনকে ধিক্কার দিতেছিল।

"হুজুর! তার আয়া।"

ভৃত্য লোহিত বর্ণের একখানি লেফাফা প্রভুর সম্মুখে ধরিল।

সহসা অনিশ্চিত আশঙ্কায় নলিনবিহারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তার পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাশীধাম হইতে জননী সংবাদ পাঠাইয়াছেন, পিতা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত, অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে পিতার পত্রে সে অবগত হইয়াছিল যে, তাঁহারা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে কাশী যাইতেছেন। কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর মথুরা যাইবেন।

অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদে নলিন অত্যন্ত অস্থির হইল। তৎক্ষণাৎ ছুটীর দরখাস্ত করিয়া রাত্রির গাড়ীতে রওনা হইবার আয়োজন করিল। না জানি অদৃষ্টে কি আছে! কি কুক্ষণেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তদবধি নলিনের সকল বিষয়েই মন্দ ঘটিতেছে!

যথাসময়ে নলিন কাশী পঁহুছিল। বাসায় পঁহুছিয়া দেখিল, পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ। রক্ষার আশা নাই। নলিন ধীরে ধীরে রোগ-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামে মহাকালই জয়লাভ করিল। রাত্রিশেষে মণি-কর্ণিকার ঘাটে পিতার অন্তিম-শয্যা রচিত হইল। দাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া

গৃহে ফিরিতে বেলা হইল। বাসায় পঁহুছিয়া নলিন দেখিল, মাতারও ভেদ ও বমন আরম্ভ হইয়াছে। নলিন শঙ্কিতহৃদয়ে মাতার মস্তক ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বসিল; দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল।

ডাক্তার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আসিলেও নিস্তার নাই। এ জাতীয় কলেরা হইলে হাজার করা এক জনকে রক্ষা করাও অসম্ভব।"

তাহার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও স্নেহময়ী মাতার রক্ষা অসম্ভব? হা ভগবান! কোন্ পাপে এ নিদারুণ শাস্তি! এক সঙ্গে পিতা মাতা—সংসারে একমাত্র শান্তির স্থান চিরবিস্মৃতির এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে?

অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকে, সান্ধ্যমুহূর্ত্তে জননীও চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সৎকারশেষে শোকমুহ্যমান নলিন মুঙ্গেরে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল।

শোকের প্রথম আঘাত একটু মন্দীভূত হইলে, নলিন আত্মীয় স্বজনকে পত্র দ্বারা এই শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বশুর মহাশয়কেও সে সংক্ষেপে সংবাদ পাঠাইল। ওয়ালটেয়ার হইতে দশ দিন পরে শ্বশুরমহাশয়ের নিকট হইতে উত্তর আসিল। বৈবাহিক ও বৈবাহিকার অকাল মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সপরিবারে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছেন। সুরমার দারুণ পীড়া। বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না। ডাক্তারের পরামর্শে ওয়ালটেয়ারে আসিয়া একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

নলিনবিহারী ভাবিল, পিতা মাতা গিয়াছেন, ইহারও যাওয়া উচিত! এখন যদি হতভাগিনীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হাড় জুড়ায়। এই অলক্ষ্মীর সংস্রবে আসিয়াই ত তাহার সুখের নন্দনকানন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শ্বশুরের উপরেও নলিনের ক্রোধ হইল। ওয়ালটেয়ারে সুরমাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল। তিনি জমীদার বলিয়া যথেচ্ছ কার্য্য করিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এই অহঙ্কারের উপযুক্ত প্রতিশোধ এক দিন দিতে হইবে; এখন থাক।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইল। সকলেই আসিলেন; কেবল শ্বশুর শাশুড়ী সুরমার পীড়ার জন্য আসিতে পারিলেন না। নলিন উল্টা

বুঝিল। সে ভাবিল, রায়মহাশয় জমীদার, তাই এই অবজ্ঞা। নহিলে এক দিনের জন্য আসিতে পারিতেন না?

সুরমা তখন ওয়ালটেয়ারে রোগশয্যায় পড়িয়া জীবন মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। নিয়তির গতি কি সূক্ষ্ম!

•

নলিনবিহারী জীবনটাকে ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিল। পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের পর ছয় মাস অতিবাহিত হইয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামীর একখানিও পত্র পায় নাই। প্রতি সপ্তাহে মাতা দুইখানি করিয়া পত্র লিখিতেন, পিতা প্রত্যহ সংবাদ লইতেন। মাতার স্বর্গারোহণের এক ছত্র সান্ত্বনার ভাষা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আত্মীয় বন্ধুগণ পত্র লিখিত বটে, কিন্তু সে ত শোকার্ত্তের প্রতি করুণা-প্রদর্শনের নিদর্শন। অনন্তস্নেহশালিনী জননীর অকৃত্রিম স্নেহ তাহাতে কোথায়?

চাকরী আর ভাল লাগে না। নিঃসঙ্গ জীবনের তীব্র তাপ তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিতে লাগিল। গার্হস্থ্য-জীবনের যাহা প্রধান অবলম্বন, অদৃষ্ট-গুণে তাহাই নলিনকে ঘোরতর প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া নলিনবিহারী এক বৎসরের ছুটী লইল। পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুবন্দোবস্তের আবশ্যক।

নলিন পল্লীর নিভৃত ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু পল্লীর সে শ্রী, সে সম্পদ, সে আনন্দ আর নাই। দুই তিন বৎসরের মধ্যে কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের অধিকাংশই কর্ম্মসূত্রে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কেহ বা চিরবিদায় লইয়াছে।

বৃহৎ পুরী প্রায় জনশূন্য। কয়েক জন দাসদাসী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। অন্তঃপুরে গেলে মাতার স্মৃতি নলিনকে কাঁদাইয়া দিত। সুতরাং সে বাহিরের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পুরাতন বন্ধুদিগের অভাব নলিন তীব্রতর ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু সহচরের অভাব অনেক দিন থাকে না। কিছু দিনের মধ্যে কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা, পরান্নপ্রত্যাশী নূতন স্তাবক জুটিল। মনের মত না হইলেও তাহাদের তোষামোদ নলিনের মন্দ লাগিত না। মানুষ একা থাকিতে পারে না; তাহার সঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন।

নলিনবিহারীর বয়স্যবৃন্দ তাহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য

পরামর্শ দিতে লাগিল। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাহার বৈঠকখানা গৃহে দুই বেলা সমবেত হইয়া তাম্রকূটরাশি ধ্বংস করিতে লাগিলেন। নলিন নিজেই পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিল। এবার নিজে দেখিয়া পত্নী নির্ব্বাচন করিবে। নিঃসঙ্গ জীবন বহন করা সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ যাহারা তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবার মূল কারণ, তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে না পারিলে তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই।

পাত্রীর সন্ধানে নানা দিকে লোক ছুটিল। নলিনও স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তিন মাস চেষ্টার পর, একটি অবসরপ্রাপ্ত সব-জজের দ্বিতীয়া কন্যাকে নলিন মনোনীত করিল। পাত্রীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সুগায়িকা; শিল্প বিদ্যায় বিশারদ বলিয়া না কি এই অল্প বয়সেই সে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল! নলিন ভাবিল, এইবার বোধ হয়, আদর্শের কতকটা পাওয়া গেল। বিবাহের সমস্ত কথা স্থির হইল।

দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময়ে, নলিন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিল না। শুধু রায় মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইল। তিনি সস্ত্রীক তখনও ওয়ালটেয়ারে।

নলিনবিহারী কল্পনাবলে সুরমা ও রায় মহাশয়ের মানসিক কষ্টের পরিমাণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল। কেমন শাস্তি!

নব বৈশাখের শুভ দিনে সদলবলে বেষ্টিত হইয়া নলিন বিবাহ করিতে গেল। তাহার গাড়ী কটক অতিক্রম করিবার অত্যল্পকাল পরে একখানি পাল্কী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

৭

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নববিবাহিতা পত্নীর সহিত উৎফুল্লহৃদয়ে নলিন গৃহে প্রবেশ করিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনই সময়ে আর একটি অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকার সহিত সে এইরূপে এই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে দিন যে উৎসবের ঘটা, আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছিল, আজ তাহার কোনও চিহ্ন নাই। ঘন ঘন শঙ্খনাদ, হুলুধ্বনি ও জননী ও পুরমহিলাবর্গের হর্ষোচ্ছ্বাস সমস্ত অট্টালিকাকে সে দিন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজ নলিনবিহারী স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া আসিয়াছে; এমন দিনে জননী কোথায়?

দুই চারিটি রমণী বর-বধূ বরণ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পল্লীর কতিপয় রমণীও নববধূ দেখিবার আশায় প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল।

রত্নমণ্ডিতা, বিচিত্রচেলাম্বরা কে ঐ সুন্দরী বরণডালা হস্তে সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মানা ? উজ্জ্বল আলোকরশ্মি তাহার অনাবৃত মুখের উপর নৃত্য করিতেছিল। দীর্ঘকালের পীড়াজনিত ম্লানরেখা এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই ; কিন্তু তবু আননে আনন্দের দীপ্তি ! নলিন চাহিয়া দেখ, মুখখানি কি সুন্দর নহে ? পবিত্র স্নেহ দীপ্তিতে অনুরঞ্জিত নহে ?

নলিন সবিস্ময়ে রমণীকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। সত্যই ত, এ যে সুরমা ! সুরমা ! উপেক্ষিতা অনাদৃতা জমীদারনন্দিনী আজ এ সময়ে অনাহূত হইয়া এখানে কেন ? শুভ সুন্দর মুহূর্ত্তে নব জীবনের পুণ্যক্ষণে এ অশুভ গ্রহ আবার দেখা দিল কি জন্য ? সহসা মনে নয় ! আবার বরণডালা মাথায় করিয়া সপত্নীকে বরণ করিতে আসিয়াছে !

আঘাতটা রমণীর হৃদয়ে কেমন লাগিয়াছে, দেখিবার জন্য নলিন আবার তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তিন বৎসরের মধ্যে সে একবারও তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাই। আজ প্রতিশোধের দিন শর-বিদ্ধ মৃগের মৃত্যুযন্ত্রণা সে দেখিবে না ?

কিন্তু কই, মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার গভীর রেখা মুখমণ্ডলে দেখা যাইতেছে না কেন ? আননে মধুরহাস্য রেখা, নয়নে স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি ! বরণকালে হস্ত একবারও কম্পিত হইতেছে না ? মুখের কোনও রেখাও কুঞ্চিত হইল না ? এতটুকু বিষাদের ছায়া, অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ এক বিন্দু অতৃপ্তির চিহ্ন নয়নকোণে নাই কি ? নলিন আবার চাহিল, ভাল করিয়া সুরমার নয়নে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। সহসা সুরমার বিশাল নেত্রোৎপলযুগল নলিনবিহারীর দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। নলিনের হৃদয় অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই তাহাদের প্রথম দৃষ্টিবিনিময়।

তখন নলিনবিহারীর ও নববধূর চারি পার্শ্বে ঘন ঘন শঙ্খ বাজিতেছিল।

বরণ শেষ হইবামাত্র নলিন আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে পলায়ন করিল। সে তখন নির্জ্জনতা চায়—অন্ধকারের কোলে লুকাইয়া নলিন কি ভাবিতে চাহিতেছিল ?

* * * * *

আবার পুনর্ব্বাসরের অভিনয়। প্রোগ্রাম অনুসারে এবারের উৎসবটা কিছু ঘটার সহিত সম্পন্ন হইবার কথা। কিন্তু নলিনবিহারী সকালে উঠিয়াই আদেশ করিল, আহারাদির ব্যবস্থা যেমন স্থির হইয়াছে, তাহাই হইবে ;

কিন্তু উৎসববাদ্য বন্ধ থাক। পারিষদবর্গ এই নূতন আদেশে কিছু বিস্মিত হইল।

অপরাহ্ণ যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল; নলিনবিহারী ততই চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আকস্মিক চাঞ্চল্যের কোনও কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। কাব্য গ্রন্থ ও উপন্যাস পাঠে সে মনটাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমেই হৃদয়ে স্ফূর্তি অনুভব করিতে পারিল না। আনন্দের দিনে অকারণে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে কেন? অন্তরতম প্রদেশে কাহার অস্পষ্ট বাণী যেন ধ্বনিত হইতেছিল। এ কি উৎপাত!

গৃহের প্রাচীরগুলি যেন ক্রমশঃ নিকটে সরিয়া আসিতে লাগিল। নলিন রুদ্ধ-কক্ষে অবস্থান করিতে পারিল না। ভ্রমণ-যষ্টিটা হাতে লইয়া সে পল্লী-প্রান্তরের অভিমুখে চলিল। নির্জ্জনতায় যদি মনটা কিছু উৎফুল্ল হয়।

তৃণশ্যামল ক্ষেত্রে পঁহুছিয়া নলিন দেখিল, জনকোলাহল ইহা অপেক্ষা ভাল। বিরাট নীরবতা অতি ভয়ঙ্কর। চতুর্দ্দিকে যেন কাহার অশরিরী বাণী ধ্বনিত হইতেছে! না, আর এ স্থলে থাকা নয়, ভাবিয়া নলিন পুনরায় গৃহাভিমুখ হইল।

মাঠের পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে কৃষক-দম্পতি সারা দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের সরল সহজ প্রেমালাপ নলিনবিহারীর কর্ণে গেল। কই, তাহাদের জীবনযাত্রায় ত কোনও বিঘ্ন নাই!

নলিন দ্রুতপদে গৃহের অভিমুখে ছুটিল। বাড়ী পঁহুছিয়াই সে দেখিল, তাহার নিষেধ সত্ত্বেও অট্টালিকা পুষ্পমাল্যে চর্চ্চিত ও আলোকদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে; সানাই পঞ্চমে তান ধরিয়াছে।

নলিন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?"

বৃদ্ধ ভৃত্য নরহরি সসম্ভ্রমে বলিল, "বড়বধূ ঠাকুরাণীর আদেশ। আমরা আপনার নিষেধের কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার ঘাড়ে সব চাপাইও।"

বড়বধূ ঠাকুরাণীর আদেশ! সে কি? নলিন কোনও উত্তর করিল না। দ্রুতপদে সে অন্তঃপুরসংলগ্ন বৃহৎ পুষ্পকাননে প্রবেশ করিল।

নক্ষত্রখচিত, দীপ্ত নীলিমামণ্ডলেও কি রাগিণী বাজিতেছে?—হাস্য না অশ্রু, আনন্দ না বিষ?

অবসন্নদেহে নলিন একটা গোলাপকুঞ্জের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে উপবেশন

করিল। সে কি নলিন! তোমার সাধের পুষ্পশয্যা যে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, নবপরিণীতা পত্নী তোমার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছে! এ সময়ে এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও। তোমার চক্ষুঃশূল, অদৃষ্টাকাশের অশুভ গ্রহটি কি নিদারুণ যন্ত্রণায় পুড়িয়া মরিতেছে, তাহাও একবার দেখিবে না? দেখিয়া আইস, এতক্ষণ হয় ত সুরমা বুক ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে!

নলিন বিবেকবাণী তথাপি শ্রবণ করিল না। দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল।

সুরমা ও সুশীলার তুলনা করিতেছ? ছিঃ ছিঃ! আবার তুলনা! নিটোল-যৌবন পুষ্পিতা সুন্দরী কি বালিকার তুল্য! সুন্দরী যুবতীর মধুর হাস্য কি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার হাস্যের সমকক্ষ! জমীদারনন্দিনী, সবজজের কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য? আরে ছিঃ!

কি অপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ? তা তুমিই জান। কিন্তু এতকাল পরে আবার সে সব কথার আলোচনা কেন? নীরবে কুসুম-শয়নে শয়ন কর; পুরাতন কথায় প্রয়োজন কি? চাঁদিনী রজনী নিষ্ফলে কাটাইতেছ কেন? প্রতিশোধের মাত্রা কম পড়িয়া যাইতেছে যে!

নলিনবিহারী উঠিল না। কাষ্ঠাসনের উপর শয়ন করিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, নিমন্ত্রিত সকলেই আসিয়াছেন।

তথাপি নলিন উঠিল না। বলিয়া দিল যে, তাহার শরীর বড় অসুস্থ; কেহ যেন এখন তাহাকে বিরক্ত না করে। নিমন্ত্রিতদিগের আহারাদির ব্যবস্থার কোনও ত্রুটী না হয়।

নলিন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অন্তঃপুরে এত আলোক জ্বালিবার কি প্রয়োজন? সানাই তখন মল্লারে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে ডাক পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। নলিন সংক্ষেপে বলিল, "আমায় এখন বিরক্ত করিস্ না।" দাসী চলিয়া গেল।

নিমন্ত্রিতগণ আপ্যায়িত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। নলিনবিহারীকে দেখিতে না পাইয়া সকলে কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিল! কিন্তু প্রভুভক্ত ভৃত্য, বাবুর অসুখ করিয়াছে বলায়, সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনা হইল না।

চন্দ্র মাথার উপর আসিয়া হাসিতে লাগিল। শ্রান্তপল্লী তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অন্তঃপুরে আলোকমালা তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

কাহার মৃদু হস্তস্পর্শে সহসা নলিনবিহারী চমকিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এক রমণীমূর্ত্তি। জ্যোৎস্নাধারা তাহার মল্লিকা-পুষ্পতুল্য শুভ্র বসনের উপর তরঙ্গায়িত হইতেছিল; অনাবৃত আননে, ঈষৎ-কম্পিত বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছিল। নলিন মুগ্ধের ন্যায় নির্নিমেষে এই নারীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তরঙ্গায়িত মেঘরাশির মধ্য হইতে এই সুন্দরী কি আজ ধরাতলে নামিয়া আসিল? কুসুমপুঞ্জ সৌরভামোদিত কাননতলে, আলোকোজ্জ্বল নিশীথে এমন মূর্ত্তি নলিন ত কখনও দেখে নাই! হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে যৌবনের স্বপ্নালোকে যে আদর্শের সে কল্পনা করিত, ইহা কি তাহারই ছায়ারূপিণী? নলিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকার নহে—নারীমূর্ত্তি সুরমার।

এত সুন্দর? তবে এতদিন কেন সে অন্ধের ন্যায় এই সৌন্দর্য্য-সম্পদকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে? কেন? কেন?

হায় নলিন! দর্পে, অহঙ্কারে মানুষ যে সূর্য্যের দীপ্ত কিরণেও অন্ধকারের ছায়া অনুভব করিয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় কি তোমাকে সে শিক্ষা দেয় নাই?

চারুহাসিনী সুন্দরী তখন অতি মৃদু অতি কোমলকণ্ঠে বলিল, "অনেক রাত হয়েছে, ছেলেমানুষকে একলা ফেলে রাখা কি উচিত? ভিতরে এস!"

কি সহানুভূতিস্নিগ্ধ আবেদন! কণ্ঠস্বরে এতটুকু তিরস্কারের বা শ্লেষের তাহাও প্রচ্ছন্ন নাই! যে স্বামী পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহার জীবনের সকল সুখ সকল শান্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহারই প্রতি এত স্নেহব্যবহার!

নলিন পূর্ব্বে কখনও সুরমার বাক্য শ্রবণ করে নাই। আজ তাহাদের এই প্রথম সম্ভাষণ!

নলিনবিহারীর সর্ব্বশরীরে একটা তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইল। স্রোতোবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। সবলে সুরমার করযুগল ধারণপূর্ব্বক বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

"সুরমা! সুরমা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই, তাই কত অত্যাচার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা—"

অশ্রুবাষ্পভারে নলিনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সুরমা ধীরে ধীরে স্বামীর আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাচীনভারতের চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে সম্প্রতি Modern Review পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, যবনাধিকৃত ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে চিত্রবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। উত্তর-ভারতে দিল্লী ও লাক্ষ্ণৌ নগরের চিত্রকরগণ, এবং কাঙ্গড়া প্রদেশের আলেখ্য লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের চিত্রসমূহে চিত্রকলার চরমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শক্তি, যথাযথ বর্ণবিন্যাস, তুলিকা-চালনার সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল গুণ শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের লক্ষণ, তৎসমুদায়ই এই সকল শিল্পীর চিত্রশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ঐতিহাসিক চিত্রসমূহ লাহোর সহরের কৌতুকাগারে বিশেষ যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতার চিত্রবিদ্যালয়ে সাধারণ চিত্রগুলির সুন্দর সংগ্রহ আছে। জয়পুরের মহারাজের রাজপ্রাসাদেও উক্ত চিত্রাবলীর উৎকৃষ্ট সমাবেশ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজাগণ ও সাধু মহাত্মাগণের চিত্রই অধিক। অতি প্রাচীন রাজাদিগের চিত্র কতকটা কাল্পনিক ও বংশানুগত কাহিনীমূলক। কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিগণের আলেখ্য যথাযথ প্রকৃত প্রতিকৃতি।

দিল্লীর চিত্রকরগণ হিন্দুগণের নিয়ম-সংবদ্ধ চিত্রপদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের চিত্রবিদ্যা পারস্যদেশ-সম্ভূত। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা ভারতবর্ষে থাকিবার সময় সুন্দর সুন্দর চিত্র-সজ্জিত অনেক পারস্য ভাষার গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাঠান মোগল সকল রাজগণই চিত্রের অনুরাগী ছিলেন। অনেক মোগল বাদশাহ উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিতে জানিতেন। সকলেই জানেন, জাহাঙ্গীরের বাদশাহ নূরজাহান অদ্বিতীয়া চিত্রকরী ছিলেন। আকবর বলিয়াছিলেন,— 'এমন অনেক লোক আছে, যাহারা চিত্রকলাকে ঘৃণা করে। এই সকল লোককে আমি ঘৃণা করি। আমার মনে হয়, চিত্রকরগণের ঈশ্বরকে মনে অনুধাবন করিবার এক বিশেষ সুযোগ আছে। চিত্রকর যখন আপনার চিত্রিত মানব বা জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বাবয়ব যথাযথ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে জীবিতবৎ করিয়া তাহাতে জীবনসঞ্চার করিতে পারে না, তখন সেই একমাত্র জীবনদাতা ঈশ্বরকে তাহার মনে পড়ে, এবং এইরূপে তাহার জ্ঞানের উন্নতি হয়।' দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা আকবর বাদশাহের এই কথা শুধু দিল্লীর চিত্রকরগণের নয়—সমস্ত জগতের চিত্রকরগণের কলা গৌরবের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীর হস্তিদন্তের উপর অঙ্কিত চিত্রাবলীও অতি সুন্দর ও ভারতীয় চিত্রকলার এক বিচিত্র বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত।

কাঙ্গড়া প্রদেশের চিত্রকরগণের চিত্র দিল্লীর চিত্রকরগণেরও অপেক্ষা বিষয়ে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। লাহোরের কৌতুকাগারে যে সকল ছবি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উট সারি সারি—ইহার চিত্র, এবং ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া কার্য্যে রত এক দল স্বর্ণকারের চিত্র অতি বিস্ময়কর। একখানি চিত্রে রাধিকা ঘরের ভিতর রন্ধন করিতেছেন, আর কৃষ্ণ ঠাকুর জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন। আর একখানি চিত্রে তুষারাবৃত হিমালয়, তদঙ্কে পুষ্পিত কানন, তৎপার্শ্বে পার্ব্বতী ও গণেশ সঙ্গে দণ্ডায়মান—মৃড় চন্দ্রচূড় জটাতরঙ্গিতজাহ্নবীবারি। হিন্দু দেব দেবী সম্বন্ধে নানা প্রকার চিত্র ব্যতীত স্বভাব-চিত্রও অনেক আছে। কতকগুলি পুষ্পের এমন সুন্দর ও প্রকৃতিসঙ্গত ছবি আছে যে, সেগুলি দেখিলে পাশ্চাত্য কলাবিৎ রস্কিন্ (Ruskin)-এর পত্রপুষ্পালেখ্যের কথা মনে পড়ে।

কাঙ্গড়া অঞ্চলের চিত্র হিন্দু-আদর্শানুযায়ী। হিন্দু প্রথায় সুন্দর সুন্দর চিত্র দাক্ষিণাত্য বিভাগে মন্দিরাদির গাত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রণালীর চিত্র সিংহল দ্বীপে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ মঠাদিতে সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের আর একটি চিত্রের বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ অজন্তা গুহার গিরিগাত্রে ও সিংহলের সিগিরি গুহার চিত্র অতীব বিস্ময়কর। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর এই চিত্রগুলি ভারতীয় চিত্রবিদ্যার অদ্ভুত শক্তি ও পরিণতির জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

চিত্রবিদ্যার ন্যায় ভাস্করকার্য্যও প্রাচীন ভারতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ভারহুত, গন্ধার, গান্ধার, সারনাথ সিংহল, যবদ্বীপ ও শ্যাম দেশের প্রস্তর-মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার প্রস্তরের কার্য্য ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব-সাক্ষ্য দান করিতেছে। বঙ্গের অনেকেই বোধ হয়, বারাণসীর সন্নিহিত সারনাথ নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষের অতীব বিস্ময়কর প্রস্তর-মূর্ত্তিসমূহ ও প্রস্তরের কারুকার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সারনাথের সেই বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি, সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর-ছত্র—ও মসৃণ গাত্র, স্ফুলৎ-চক্ষু, মার্জ্জিত-কেশর, সেই পঞ্চসিংহ যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি ভারতের ভাস্কর্য্যের কথা কখনও ভুলিবেন না।

দ্রাবিড় দেশের প্রস্তরশিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। দ্রাবিড়ের ভাস্কর্য্য একাধারে শক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। দাক্ষিণাত্যের ধাতু-মূর্ত্তি সকলও অতি সুন্দর। মান্দ্রাজের কৌতুকাগারে রক্ষিত নৃত্যশীল নটরাজ শিবের মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত কারুকার্য্যের চরম আদর্শ। সিংহলের মৃন্ময় মূর্ত্তি সকল, ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠপুত্তলি উড়িষ্যার ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন হস্তিদন্তনির্ম্মিত-দেবমূর্ত্তি-নেপাল, প্রদেশের অষ্টধাতুর মূর্ত্তি—এ সকলই অতীব সুন্দর ও বিস্ময়কর। এ সব যে হিন্দুর কীর্ত্তি, তাহা আজকাল আর যেন ভাবিতে পারা যায় না। হিন্দুর এই সব প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলে সত্যই মনে হয়,—'এই হিন্দু কি সেই হিন্দু !'

১৮শ ভাগ। আশ্বিন ; ১৩১৪। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি. এ., শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি. এ., শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ. ও সম্পাদক।

সূচী।

কলিকাতা,
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ;
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

২য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
১২। বিষবৃক্ষ	১৷৹	১৭। ইন্দিরা	১৷৹
১৩। আনন্দমঠ	১৷৹	১৮। কৃষ্ণচরিত্র	৩৲
১৪। কপালকুণ্ডলা	১৵৹	১৯। লোকরহস্য	১৹
১৫। চন্দ্রশেখর	১৷৵	২০। বিবিধ প্রবন্ধ	২৲
১৬। রাজসিংহ	২৸৵	২১। পদ্য-পদ্য	৸৹

সর্ব্বসাকল্যে মোট ১০ খানি পুস্তক ১৭৲ টাকা মূল্যের। এক্ষণে পৃথক লইলে কেবল ৩৲ তিন টাকা মাত্র মূল্যে পাইতেছেন। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ সহ সাড়ে তিন টাকা মাত্র; কাপড়ের বাঁধান ৩৷৹ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৹ আনা।

৩য় ভাগের পুস্তক—

পুস্তকের নাম	মূল্য	পুস্তকের নাম	মূল্য
২২। শ্রীমদ্ভগবৎগীতা (সমগ্র বঙ্কিমের ব্যাখ্যা)	২৲	২৫। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	১৲
২৩। সাম্য	।০	২৬। বিবিধ বিষয়	৷৹
২৪। বিজ্ঞানরহস্য	৷৹		

এই পাঁচখানি পুস্তকের মূল্য ৪৷৹ টাকা, ইহা কেবল ৸৹ আনায় বিক্রয় করিতেছি। ডাকমাশুল ৶৹ আনা; বাঁধান ১৲ টাকা।

দেখুন!

এক্ষণে উক্ত তিন ভাগে সম্পূর্ণ সমগ্র উৎকৃষ্ট সংস্করণ ভাল কাগজে সুন্দর ছাপা সমগ্র তিন ভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেবল ৫৲ টাকায় দিব; রাজসংস্করণ ৬৲ টাকা। পৃথক পৃথক গ্রন্থাবলীর মূল্য উপরে লিখিত হইল। একত্র সমগ্র তিন ভাগ গ্রন্থাবলী না লইলে এতাধিক সুলভে পাইবেন না। তিন ভাগের মাশুলাদি ১৲ এক টাকা। মোট ৬৲ ছয় টাকা দিলেই ঘরে বসিয়া এই রত্নভাণ্ডার পাইবেন।

সত্বর না লইলে এ সুযোগে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী কার্য্যালয়;—

১১৬।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশীয় কলে প্রস্তুত !

দেশীয় লোকের হস্তে !! দেশীয় অর্থে !!!

স্বদেশীয় বস্ত্র

বিক্রয়ের বিরাট আয়োজন।

বোম্বাই, আমাদাবাদ, নাগপুর, পঞ্জাব প্রভৃতি
ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে
কলে ও হাতের তাঁতে প্রস্তুত
ভদ্রলোকের ব্যবহার-উপযোগী সকল প্রকার বস্ত্র
আমরা আমদানী করিয়াছি।
যাঁহাদের স্বদেশের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা আছে,
যাঁহাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদে,
তাঁহারা দেশীয় বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করুন!
কলে প্রস্তুত দেশী কাপড়
বিলাতী কাপড় অপেক্ষা দরে সস্তা,
বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী,
বিলাতী কাপড় অপেক্ষা সুন্দর সুন্দর পাড়,
বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অল্প মাড়।

ধুতি ও শাটী, লংক্লথ, টুইল, জীন, ধোয়া ও কোরা, নয়ানসুক, মলমল, পঞ্জী, দোসুতি, মাটা, তোয়ালে, রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, ছিট, ওয়াশিংচেক, ক্যাম্বিচেক, টিকিন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে মূল্যতালিকা ও নমুনা পাইবেন। মফঃস্বলে এজেণ্ট ও পাইকারগণের সহিত বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র।

কুঞ্জবিহারী সেন কোং

১২১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট ; বড়বাজার ; কলিকাতা

ত্রৈকালীন, পালাজ্বর, সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। ইহা জ্বরে ও বিজ্বরে সেবনীয়।

জনপ্রবাদ যে, কুইনাইন ভিন্ন জ্বরের ঔষধ নাই; কিন্তু আমাদের কবিরাজমণ্ডলী বহু পরীক্ষার পর বিনা কুইনাইনে জ্বরের এই অদ্বিতীয় মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা শরীরের সকল প্রকার জ্বর ঠিক কুইনাইনের ন্যায় বন্ধ করে, অথচ কুইনাইন সেবন জন্য যে সকল অপকার হয়, তাহার সম্ভাবনা থাকে না, এবং শরীরের জ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষ নষ্ট করে। অন্য ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই ঔষধটি পরীক্ষা করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

মূল্য বড় কৌটা ৪২ বটী ॥৵০; ছোট কৌটা ২১ বটী ।৵০; ডাঃ ।০।

ঊষাকুসুম তৈল।

মস্তিষ্ক ও কেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।

এই পরম সুগন্ধি কেশ-তৈল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নির্দ্দোষ প্রণালমতে প্রস্তুত। ইহা ব্যবহারে কেশক্ষয়, কেশের অকালপক্বতা, টাক, মস্তক-ঘূর্ণন, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন চঞ্চল করা, অতি মাদক সেবন জন্য বা দীর্ঘকাল প্রমেহাদি হেতু মস্তিকের পীড়া ও বায়ু-জনিত শিরোরোগ অতি সত্বর নিবারিত হয়।

আমাদের ঊষাকুসুম তৈল কি কি বিষয়ে অদ্বিতীয়?

১। মন-বিমোহনকারী, বহুক্ষণস্থায়ী সুগন্ধে—

২। কেশ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার আরোগ্যে—

৩। মস্তিষ্ক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার উপশমে—

৪। শ্রমান্তে শরীর ও মনের অবসাদ-দূরীকরণে—

৫। মন প্রফুল্ল ও চিন্তাশূন্য রাখিতে—

৬। কেশপাশের সংবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ভূতিতে—

৭। কেশের বিবর্ণতা, অকালপক্বতা ও টাক নিবারণে—

৮। অনিদ্রাদি বায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া নাশে।

যেরূপ প্রবল মস্তিকপীড়াই হউক না কেন, আমাদের "ঊষাকুসুম তৈল" সামান্য একটু কপালে মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপশম হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার-সমিতি

৬৯ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঠাই-বিক্রেয়।

—:*:—

[জাপানী গল্প।]

"বারটা যে বাজে, আর ঝাঁপতাড়া ফেলিবার
দেরী কেন ?" কহে বুড়া বুড়ীরে ডাকিয়া ;
"এত রাতে কার ছেলে জেগে আছে ঘুম ফেলে
পিতা মাতা 'এমি' (১) তার কিনিবে আসিয়া ?"
দোকান করিল বন্ধ বুড়ী মন্দগতি ;
বুড়া বুড়ী পল্লীপথে 'এমিয়া' (২) দম্পতী।

'জেঞ্জিরো' বুড়ার নাম, 'কুসা' তার নারী।
বরফে আচ্ছন্ন বসুমতী, ঠাণ্ডা ভারি।
'হিবাচি'র (৩) স্ফুলিঙ্গ জলিয়া শেষ ছাই,
হাড়ে হাড়ে ঠেকিতেছে, শীত কি বালাই !
বুড়া ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ে, পুনঃ মাথা তুলে
ঘুমন্ত, লোহার শিকে সে ছাই জাগায় ;—
জ্যোতির্ম্ময় বদন সুচিন্তা-মহিমায়।
কত না ঘুমের ঘোরে কয় হিজিবিজি,
বুড়ী বলে, "ঢোল, বোকোনাকো মিছিমিছি।"

প্রসন্ন জেঞ্জিরো কায করিত দোকানে ;—
ছেলেরা বাঁচিয়া থাক, স্বর্ণপাত্রে অন্ন থাক,
তার ত রাজার হাল তাদের কল্যাণে।

---

(১) শিশুভোজ্য মিষ্টান্ন।

(২) 'এমি'-বিক্রেতা।

(৩) শীতনিবারণার্থ গৃহে [illegible] আ[illegible]ধার

মনে পড়ে, গেছে দিন,—ক্ষেত্র-কর্ষণে ক্ষীণ,
বেদম 'রিক্সা'র (৪) দণ্ড কাঁধে ছোটাছুটী ;—
তাও—এত ছুটে, হেঁটে, মুখে রক্ত তুলে খেটে,—
ক'টি পেট ভরাইতে মাথা কুটাকুটী !

ছেলেরা জোয়ান আজ, যে যার করিছে কাজ—
শ্রম-জীবী, সরল, প্রণম্যে ভক্তিমান ;
বুক্তি আঁটি ক'টি ভাই বুড়া বাপ মায়ে তাই
ক'রে দেছে ছোট খাট 'এমি'র দোকান।
এ বয়সে বুড়াবুড়ী ব'সে ব'সে থাক ;—
খাটুনি যুবার পালা, যুবাদেরই থাক !

বুড়া বলে "কই গো! দোকান বন্ধ হ'ল ?"
বুড়ী বলে, "তোমার যা' কায— তুমি ঢোল।"
দোকান পশ্চাতে ঘর,—ভোজন শয়ন
তথায় সম্পন্ন করে এমিয়া দু' জন ;—
বুড়ী সেই ঘরে গিয়ে বিছানা মাদুর নিয়ে
শয্যা-বিরচনে ব্যস্ত ;—বুড়া মরা তাতে
হিবাচীর, ব্যস্ত স্বপ্ন-রাজত্বে বেড়া'তে।
দ্বিপ্রহর নিশা, ধরা সুষুপ্ত, বিষম
তাহাতে তুষারপাত, বায়ুর বিক্রম।

কুসা কহে "ভাল বুড়া ঢুলে ঢুলে গেল।
শয্যা-ছেড়ে চাও! দেখ, দোকানে কে এল।"
সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধ উঠি' চমকিয়া,
দু' হাতে নয়ন দুটি ঘষিল কষিয়া।
"কে আসিল এত রাতে, এ শীতে এ ঝঞ্ঝাবাতে ?"
ভাবিল জেকিয়ো; শীঘ্র খুলিল আগড়,—
বাহিরে কি অন্ধকার, কি দুরন্ত ঝড় !
দেখে পথে শীর্ণা এক নারী দাঁড়াইয়া,—

(৪) নর-বাহিত দ্বি-চক্র যান।

আঁধারে আকৃতি তার নহে বড় স্পষ্টাকার—
মুখে, চোখে, চুলে, বস্ত্রে, বরফ পড়িয়া
ক'রেছে শ্বেতাঙ্গী তায় ;—রমণী ছায়ার প্রায়
(হেঁটে নয়, ভেসে যেন,) পশিল দোকানে ,
কাতরদৃষ্টিতে চাহি' জেঞ্জিরোর পানে
অতি ক্ষীণকণ্ঠে কয়, "হে এমিয়া মহাশয় !
ক্ষমা কর মোরে, আসিয়াছি অসময়ে ;—"
জেঞ্জিরো না ভেবে পায় উত্তরিবে কি কথায়,
সম্ভ্রমে নামায়ে শির—'হ-স্-র্-র্-স'-য়ে
"কি শীত বরফ !—" ইতি কহে পরিচয়ে।

"এসেছি কিনিতে এমি", তরুণী প্রকাশে ;—
এই বলি দেখাইল পাত্রে পূর্ব্বপাশে
বিচিত্র এমির ঠোঙ্গা এক,—সে এমির,
(মাসেকের শিশু যবে মিয়া-মেইজীর (৫)
মন্দিরে প্রেরিত হয়) উৎসর্গ,—নচেৎ নয় ;—
সাদরে জেঞ্জিরো দিল সে এমি নারীরে ;
নারী বস্ত্র হ'তে লয়ে দিল তার বিনিময়ে
কাদামাখা কাল 'রিণ' (৬) একটি, ও ধীরে
করিল প্রস্থান ; বৃদ্ধ বাঁধি' তবে ঝাঁপ,
দোকানের অন্দরে প্রবেশি,' ছাড়ে হাঁপ।

কুসা বলে, "কি ব্যাপার ! কে ও এত রাতে ?"
জেঞ্জিরো উত্তরে, "নারী, এমির বরাতে।"
"নূতন কি আছে তা'তে—তবে বড় বেশী রাতে",—
ভাবে বুড়ী ; ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে ডোবে ;
বৃদ্ধ ব'সে ভাবে,—অত চিন্তায় কে শোবে ?—
মানুষী, না অমানুষী, ছায়া না কি মায়া ?
ব'সে গেল বৃদ্ধ-মনে সে নারীর কায়া !

(৫) জাপানের মা-ষষ্ঠী।

(৬) সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য জাপানী তাম্রমুদ্রা।

পর দিন,—সারাদিন বৃদ্ধ অন্যমনা ;
তা' দেখি' জিজ্ঞাসে বৃদ্ধা পতি-পরায়ণা,—
"ব্যাপার কি ?—কেন গো ! অলস তুমি আজ ?"
উত্তর,—"কি জানি, মনে লাগেনাকো কায।"
শিশুরা এমির তরে দোকানে আসিলে পরে
মনে মনে জেফ্রিয়ো ব্যাজার বড় হয় ;—
শিশুদের দুঃখ তায়, অপার বিস্ময়।
তাদের এমিয়া বুড়া বড় যে রসিক,
হাসির খেলার সাথী বন্ধুর অধিক।

রাত্রিতে দোকান বন্ধ হ'লে, ফুসা যবে
শয্যা টানি' পাড়ে,—বৃদ্ধ সভয়ে নীরবে
লেপটা দু'পাট করি', সতা কাঁপে থরথরি'
মধ্যে তার ;—ফুসা ত প'ড়েই নিদ্রা যায় ;—
বৃদ্ধ ভাবে, 'ডর ভয় নাহি কি ফুসায় ?'
ক্রমে নিশা দ্বিপ্রহর, সেই শন্‌শন্‌ ঝড়,
দু' হাত সজোরে বৃদ্ধ টানিল হৃদয়ে—
কাল এসেছিল নারী এমনি সময়ে !
ভাবিতে ভাবিতে—শব্দ বাহিরে,—এমিয়া স্তব্ধ,
সমস্ত প্রাণটা তুলে কানে যেন রাখে ;
চারি দিকে চুপচাপ—কে যেন টানিল ঝাঁপ,
"হে এমিয়া মহাশয় !" ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকে ;—
সেই বটে ! দেখে বৃদ্ধ আগড়ের ফাঁকে।
বৃদ্ধ নাহি দিল সাড়া,—রহিল পড়িয়া
শয্যায়,—কাতর নারী করুণা করিয়া
ফের ডাকে,—"একবার ওঠ কৃপাবান !
দ্বার খোল ;"—ক্ষীণ কণ্ঠে করুণার বান !

হোক ভয়, যা'ক্ প্রাণ,—ও কাতর স্বর
উপেক্ষার নয় ;—বৃদ্ধ খুলিল আগড়।

"বড় কষ্ট আপনারে দিতেছি এমিয়া !"
নতমুখে কহে নারী,—দোকানে এমিয়া সারি—
পূর্ব্ব রাত্রে যে এমি লইয়াছিল, তাই
লইয়া, একটি রিণ দিয়া, বলে,—"যাই"।
হেঁটে নয়, ভেসে যেন ছায়াময়ী চলে
হাওয়ার ; জেঙ্কিরো ভাবে, 'কি পাপের ফলে
মলিন রমণী, অত শীর্ণ ; ও সময়
কোথা হ'তে আসে ?' মনে গণিল সংশয়
জেঙ্কিরো আবার ;—টানি' চালার আগড়খানি
করিল শয়ন ; মন নানা ভাবনায়
কাতর ;—এমিয়া অবশেষে নিদ্রা যায়।

এইরূপে পাঁচ দিন নিত্য নিত্য আসে
প্রমদা এমির আশে এমিয়ার পাশে।
নিত্য নিত্য নিশায় অবশ্য।—সে বেচারা
জেঙ্কিরো তো হতজ্ঞান, শেষ অবসন্ন প্রাণ,—
ভুলে গেল কাজ কর্ম্ম, ব্যবসার ধারা।
আর যারা এমি বেচে তাদের ভল্লাটে,
শিশুরা সেথায় যায়—বুড়া না তাকায় তারি,
একে ভিন্ন মন তার নাহি অন্য পাটে।
গরীব জেঙ্কিরো ;—ভাব, আশীর ওপার,—
চিন্তায় সে দাঁড়াল কিম্ভূত-কিমাকার !

ষষ্ঠ দিনে প্রভাতে, অদ্ভুত অঙ্গীকার
করিল সে ;—নিশায় আসিলে খরিদ্দার,
এ বৃদ্ধ বয়সে ভাগ্যে যা' তার থাকুক থাক্‌গে,
তাহার অনুসরণ করিবে সে স্থির ;
হোক ঝড় জল,—হোক অভেদ্য তিমির !
কুসা তো ও নয় সারা,—"বুড়া পাগলের পারা
কি বলে গো ! প্রেতিনীর সঙ্গ লোকে লয় ?
যমপুরী প্রিয় নহে কাহারও নিশ্চয় !"

সে নারী যে প্রেতবংশ ক'রেছে উজ্জ্বল,—
ফুসা তার সন্দেহ করেনি এক পল!

জেঞ্জিরো জাপানী, তার প্রতিজ্ঞা জীবন;
যাইবে সে একবার করিয়াছে পণ,—
আর কে হঠায় তার? ফুসা ত আছাড় খায়,
সারা দিন 'মড়া-কান্না' করিল সম্পন্ন;—
জেঞ্জিরো পাথর, মুখে কথা নাই অন্ন।
রাতে রামা উপজিল—যথা লয়, এমি নিল—;
দিল রিণ, অন্য দিন হ'তেও কাতর,—
চ'লে গেল; বুড়া গেল পশ্চাতে সত্বর।
'হেঁটে না, হাওয়ায় যেন ভেসে চলে নারী,
(বলিয়াছি কোন স্থানে) তার সঙ্গে পারি
আমি বুড়া ছুটিতে?' ভাবে ও তবু ছোটে;—
নারীও উধাও চলে আপনার কোটে।

দীর্ঘ দেবালয় শত মন্দির শোভন,
তাও হ'ল অতিক্রান্ত;—পরে বিভীষণ
সমাধি-উদ্যান,—নিশা দ্বিপ্রহরে কভু
সে উদ্যান, প্রমোদ-উদ্যান নহে; তবু
তাহাতে প্রবেশ করে বুড়া; অগ্রে নারী।—
ফেরে নারী বৃদ্ধ পানে; মুখে তার ভারি
ঔদাস্য। ফিরিয়া বৃদ্ধ পানে চায়,—যায়;—
'ফিরো না এতটা এসে' চক্ষে যেন গায়।

আর দুই চারি পদ;—দীর্ঘ বৃক্ষতলে
আছিল কবর এক; নারী তথা চলে।
উঠিছে ধুনার ধোঁয়া—সুরভি বাতাস
বহে সে সমাধি চ'ড়ে,—তাহারে প্রকাশ
রেখেছে স্তিমিত অগ্নিস্তূপ; তথা গিয়া
আসে হেরে বৃদ্ধ—নারী গেল মিলাইয়া।

তবে ত প্রকৃত,—আর সন্দেহ কোথায় ?
প্রকৃতই প্রেতিনী ত এম্নি নিয়া যায় !
ভয়ে যে কাঁপিল বৃদ্ধ, তা কি বড় কথা ?
সমীরণ হিমানী-সম্পাতে কাঁপে যথা।
কোন রকমে ত বৃদ্ধ ফিরিল আলয়—
কাটাইল রাত সে ভূতের কথা ক'য়ে।
আশ্বাসিয়া জেজিরোরে তুসা শেষে ভাষে,
দু' জনে যাইবে কাল পুরোহিত পাশে।

প্রাতঃকালে পরদিন ল'য়ে সে ছয়টি রিণ
চলিল ভজনালয়ে এমিয়া দম্পতি ;—
সে তারিখে বড় ভোজ, সে ভোজ না ঘটে রোজ'
সমুদ্র-তরঙ্গ মত জনতার গতি।
দেখিল, বিষয় ব্যস্ত যাজক সবাই—
গরীব তাদের পানে এ দিনে এমন স্থানে
কে চাহিবে ? হেন কালে বুঝি বিধাতাই
প্রাচীন যাজকরূপে এক, তাহাদের
নিকটে আসিয়া ভাষে, "বল গো কিসের
কারণে, সবার মাঝে (উৎসবের বাঁশী বাজে)
তোমরা একাকী দু'টি ?" "প্রভু !" বৃদ্ধ কয়,
"আছে গুরু কথা।" "এস আমার আলয়।"

নিকটেই অবস্থিত যাজকের বাটী,—
তরু লতা ফুলে মনোরম, পরিপাটী।
তথা উপজিয়া সব কহিয়া ব্যাপার,
প্রেতিনী-প্রদত্ত সেই রিণ ক'টি তার
সমর্পণ যাজকের চরণে করিয়া,
সম্ভ্রমে করিল নতি দম্পতি এমিয়া।

সমস্ত শুনিয়া পুরোহিত বহুক্ষণ
ললাটে করিল স্বীয় কর-সঞ্চালন।

"দেখাইতে পার তুমি কোথা সে কবর ?"
জিজ্ঞাসে ; জেজিয়ো করে সোৎসাহে উত্তর,
"অবধান কর পুণ্যবান ! তরুবর
সমাধি-উদ্যানে উচ্চ, তলদেশে তার
কবর সে ;—নেত্র প্রভু বিশ্বাসী আমার।"
শুনি' তা' যাজক কয়, "চল সে কবরালয়।"
বুড়াবুড়ী করে আজ্ঞা তখনই পালন।—
কবর নূতন কাটা, মাটী সব কাটা কাটা,
মৃত্তি'-নিমজ্জিত কাষ্ঠে মৃতের বর্ণন।

"কিকুর কবর এ যে !"—কবর দেখিয়া
বৃদ্ধ পুরোহিত কহে বিস্ময়ে ডুবিয়া।—
"কিকুর কবর এ যে,—চোকিচীর নারী—
ছিল শতগুণবতী, হৃদয় স্নেহের অতি,
কহিতে তাহার কথা না কেঁদে না পারি।
সে দারিদ্র্য-দাবদগ্ধা হরিণী সরলা—
ধরণীর পাপতাপ, ধরণীর মলা,
বর্জ্জন করিয়া গেছে ; আজ [illegible] দিন
হয়নি ; আসিছে তারে [illegible]
ভগবৎ-চরণে সংবাদ [illegible] তার ;—
আসন্ন-প্রসবা ছিল,—এ কবর তার।
অজাত সন্তান গর্ভে, অভাগী জননী
সপ্তাহ হইল—সার করেছে ধরণী।
স্থির কোন দৈবী বার্ত্তা করিয়া বহন
নিশি দিশি তোমা পাশে করেছে গমন।

রোমাঞ্চিতকলেবর, শুনি' সে বিস্ময়কর
কাহিনী, বুড়া ও বুড়ী স্তম্ভিত দু' জন ;
যাজক মন্দিরে যায়,—সে সমগ্র জনতায়
উদ্দেশিয়া কহিল অদ্ভুত বিবরণ।

প্রাবৃটে বন্যার প্রায় সে জনমণ্ডলী
কিকুর কবরে ধায় ত্রস্ত, কুতূহলী।
তার মাঝে এক জন হয় অগ্রসর
চোকিচী (কিকুর ভর্ত্তা) সমীপে সত্বর।
চোকিচী অবাক হ'য়ে চোখভরা অশ্রু ল'য়ে
বাতুলের মত তথা ছুটি' উপস্থিত ;—
বাষ্প-বিজড়িত-কণ্ঠে কহিল বিনীত,—
"বরেণ্য আচার্য্যবৃন্দ! হে প্রসন্নমতি
সমাগত সুহৃজ্জন! কর আমা প্রতি
আদেশ, আমার প্রিয়তমা দয়িতার
উদ্ঘাটিত করিতে কবর ; সুবিচার
তা' হলে করিতে সবে পারিব সম্ভব,
কিকুর প্রেতাত্মা ক্ষেন, অনাথ-বান্ধব
দেবোপম দয়ার, এ এমিয়া-প্রকাশে
বায়? কি করিতে ব্যক্ত অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে?"
আচার্য্য উত্তরে,—"নাহি বাস মনে ভয়,
অভীষ্ট পালন কর ; আমি অসংশয়
মঙ্গল মাগিয়া ... অসুখী অশান্তার,
প্রার্থনা করিব পদে বিশ্ব-নিয়ন্তার।"

কথান্তে আরম্ভ তবে কবর খনন।
সমবেত কণ্ঠে মেঘ-মন্দ্র-বিনিন্দন,
পুরোহিত-সম্প্রদায় শাস্ত্র মথি' স্তোত্র গায়,—
জনগণ জোড়পাণি ; পবিত্র সুন্দর
শোকের সে ... মর্ম্মদ্রবকর!
ল'য়ে অস্ত্র চোকিচী ... ভেদ করে
অবিশ্রাম বহু শ্রমে, কতক্ষণ পরে
কাষ্ঠাধার (পরিত্যক্ত পবিত্র আত্মার
রক্ত-মাংস-আধার ভঙ্গুর দেহ তার
যাহাতে রক্ষিত,—তাহা) হইলে বাহির—

পুন উপস্থিত সবে ভিক্ষা চৌকিটীর
খুলিতে সে কাষ্ঠপাত্র ;—'তথাস্তু' তাহার
সকলের। খোলে ডালা—ও কি ও হোথায় !

স্তব্ধ, হৃত-চেতন অথবা, আচার্য্য কি
উপস্থিত মানবমণ্ডলী সে ; নিরখি'
কাষ্ঠাধারমধ্যে দৃশ্য কল্পনা-অতীত !
বিধির খেয়াল-খেলা, নেশায় নির্ম্মিত !
দেখে সব—অর্দ্ধ-উপবিষ্ট ও শয়ান
মাতৃ-শবকোলে, শিশু উৎফুল্ল-নয়ান
চুষিছে কোমল এখি, লালে বুক ভাসে,
জনতার পানে চায়, ত্রাস নাহি বাসে !
সর্ব্বাঙ্গে গলিতপ্রায় রমণীর শব ;
দেখি' মুগ্ধ, মুখে কারও নাহি সরে রব।
বিহ্বল চৌকিটী শিশু কোলে তুলে লয়,
শোকে ও আনন্দে ভ্রান্ত, পাগল বা হয় !

বদ্ধস্বর বাষ্পপ্রবর ভাসমান-
নয়ন-কমল বৃদ্ধ বিমুগ্ধ-পরাণ
কহিলেন, "দেখ দয়াময় বিধাতার
লীলা-ক্ষেত্র-মাধুর্য্য চিন্তিয়া একবার !
দেখ মাতৃ-মমতার অপরূপ লীলা—
পূত স্নিগ্ধ স্বর্গালভা-স্নেহ-সুসলিলা !
জননীর প্রাণ—সুতে জননীর স্নেহ
যম না কাড়িতে পারে,—যম কাড়ে দেহ।
চক্ষের উপরে দেখ জননীর শব
সন্তান-লালনে রত ! কর অনুভব,
যদি শক্তি থাকে—মাতৃ-স্নেহ-পরাক্রম
সে শক্তির পাশে শক্তি কার ? ছার যম !

"রাক্ষসীতে ছিঁড়ে খাবে বৈতরণী পারে—
তাহার উৎকোচ ক'টি দিণ, ভুবিবারে

সে সবারে, [illegible] সম্বল
রিণ ছ'টি, (১) [illegible] হয় নিলাম কেবল
এমিয়ারে দিয়া দয়াময়ী, এমি জানি
পোষিয়াছে আত্মজ ও নবাগত প্রাণী।"
রিণ ক'টি সযতনে শবেন্দ্র কয় 'ধরে
রাখি', পুরোহিত নেত্র মোছে দুই করে।
"পুনশ্চ মহাত্মা এই" কহে পুনর্ব্বার—
জেজিরোর পানে চাহি,—"এই এমিয়ার
অনুগ্রহে চোকিচী ও পুত্র-রত্ন লভে—
নিশি-দ্বিপ্রহরে প্রেত-মূরতিরে কবে
কে কোথা খুলিয়া দেয় দ্বার? মহাপ্রাণ
অসংশয় এমিয়া জেজিরো বর্ত্তমান!"

নটে গাছ মুড়া'ল আমার, কথা শেষ;—
সে অবধি জেজিরোর কায কর্ম্ম বেশ
উন্নতির উচ্চ পথে অগ্রসর; আসে
দেশ দেশান্তর হ'তে জেজিরোর পাশে
লোক জন;—এমি কেনে, গল্প শোনে আর,—
সন্তানে স্বর্গের স্নেহ জননী মৃতার!

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(১) স্বর্গের দ্বারে রাক্ষস রাক্ষসী প্রহরী থাকে। তাহাদের উৎকোচ দিবার সম্বল-স্বরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় জাপানে মৃতের হস্তে ছয়টি 'রিণ' দিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

বুদ্ধের মাতুলবংশ।

মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি বুদ্ধচরিতাখ্যায়ক গ্রন্থে তাঁহার মাতামহ-কুলের উৎপত্তি বিষয়ক নিম্নলিখিত কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। শাকেতাধিপতি মহারাজ সুজাত বা সঞ্জাতের নির্ব্বাসিত পুত্রপঞ্চক ও তৎসহচর অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ শাক্যাভিধানে অভিহিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃ বিভূতি লাভ করিতে লাগিলেন।

প্রথম কপিলবস্তুরাজ ওপুরের পৌত্রের রাজ্যকালে, প্রিয়া নাম্নী কোনও শাক্যদুহিতা দুশ্চিকিৎস্য গলৎকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে, চিকিৎসকগণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের উপশম হইল না। বরং ব্রণ সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পূতিগন্ধে আত্মীয়গণেরও জুগুপ্সা উৎপাদন করিতে লাগিল। অগত্যা সাধারণের ঘৃণার্হা কুমারীর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কোনও পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া আসাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া হিমালয়ের উৎসঙ্গবর্ত্তী একটি কন্দর মনোনীত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রী, পানীয় জল ও বসন-শয্যাদি সজ্জিত করিয়া কন্যাটিকে সেই গুহায় রাখিয়া দিলেন; এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণভয়ে গুহাদ্বার বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া বালুকায় গুহামুখ আরও প্রচ্ছন্ন করিয়া ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদা এক স্বেচ্ছাবিহারী ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র সেই স্থানে উপনীত হইয়া মনুষ্যগন্ধে উন্মত্ত ও মাংসলোলুপ হইয়া পুনঃপুনঃ পদবিক্ষেপ দ্বারা বালুকা অপসারণ করিতে লাগিল। এই সময়ে কোল (কাহারও মতে রাম) নামক রাজর্ষি ফলাহরণার্থ সেই স্থানের সন্নিহিত হইলে, শার্দ্দূল মুনিবরের তপোবলসম্ভূত তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চিরাভিলষিত নরমাংসাহার-লালসা বিসর্জ্জন দিয়া তথা হইতে অপসৃত হইল। বিজন বনমধ্যে পর্ব্বতকন্দর এইরূপ সযত্নে সংরুদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাপসপ্রবর বালুকা উৎসারণ পূর্ব্বক কাষ্ঠপ্রাকার অপসারিত করিয়া গুহামধ্যে অনুপমলাবণ্যবতী কিশোরী সন্দর্শনে সম্মোহিত হইলেন। অবরুদ্ধ স্থানে বাসনিবন্ধন শাক্যকুমারীর গলিত শরীরে ক্রমে ব্রণের উপশম হইয়াছিল; তিনি অসামান্য রূপপ্রভায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। কুমারীর আত্ম-

কাহিনী শ্রবণে রুদ্ধ বায়ুর এতাদৃশী কুণ্ঠাপশমনী শক্তির [illegible] অবগত হইয়া, এবং তত্তোধিক কন্যার আভিজাত্যোচিত গুণগ্রামে বিস্মিত ও সেই সুকক্রিয়ার প্রতি নিতান্ত প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তপস্বী তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! কি মহদুদ্দেশ্যে যে বিগতযৌবন তপশ্চরণশীল রাজর্ষির হৃদয়ে প্রেমবীজ উৎপাদন করিয়া দিলেন, অন্ধ মানব তখন তাহা কি করিয়া বুঝিবে? ক্রমে সেই পত্নীর গর্ভে তাপসপ্রবরের আট বারে ষোলটি সন্তান জন্মিল। পুত্রগণ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শাক্য-দুহিতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে স্বীয় পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা শাক্যসভায় উপস্থিত হইলে, সেই ঋষিকুমারগণের শাক্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া সভাসদ্‌গণ তাহাদিগের পরিচয় জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মাতামহের নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় জনক জননীর বিস্ময়োদ্দীপক কাহিনী সভাসমক্ষে বিবৃত করিলে, সকলে যারপরনাই বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। শাক্যকুমারীর পিতা তখনও জীবিত ছিলেন, এবং পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া সেই সভায় সমাসীন থাকিয়া, মহাত্মা কোল তাঁহার জামাতৃরূপে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া, নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজর্ষি কোল তাঁহাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি বারাণসীর রাজা ছিলেন, এবং পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপশ্চরণার্থ হিমালয়কন্দরে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

মুনিবালকগণ সাদরে পরিগৃহীত হইয়া, মাতামহ ও মাতুলগণ কর্ত্তৃক বৃত্তিস্বরূপ এক একখানি গ্রাম ও কৃষিযোগ্য ভূমি প্রাপ্ত হন। অতঃপর শাক্যগণ স্নেহাচরণে ও মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া কুমারগণকে পিতৃমাতৃ-সকাশে পুনঃপ্রেরণ করেন। কোল নামক ঋষির বংশধর বলিয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের পরবর্ত্তিগণ কোলীয় নামে অভিহিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে নাম, তদনুসারে স্ব স্ব গ্রামের নামকরণ করিলেন। কুমারগণের অন্যতম করভদ্র 'করভদ্রনিগম' নামক গ্রামের অধিকারী হইলেন। কালক্রমে কোলীয় বংশের শাসনপ্রণালী যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। মাধ্যমিক শাসন বিভাগ এক দল রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। ইহারা পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণের সমতা (uniform) প্রযুক্ত এক নূতন আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে অত্যাচারী ও অর্থগৃধ্নু বলিয়া

আত্মজনেরও [illegible] হইত। জনৈক কোলীয় মানব কপিলবস্তু নগরের অদূরে দেবদহ (দৈবদহো) নামক নগর সংস্থাপন করেন, এবং কালবশে অঞ্জন বা সুভূতি নামক জনৈক শাক্য তাহার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই অঞ্জন জনপদ-প্রাবহিক কোলীয় বংশের এক যৌহিনীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে তাঁহার সাতটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা মায়া ও কনিষ্ঠা প্রজাবতীকে কপিলবস্তুরাজ সিংহহনুর জ্যেষ্ঠপুত্র শুদ্ধোদন ও তাঁহার অপর পুত্রগণ অবশিষ্ট কন্যাগুলিকে বিবাহ করেন। এই মায়াদেবীই সর্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধের জননী ও মহাপ্রজাবতী পরমস্নেহময়ী পালয়িত্রীরূপে সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ যাবৎ সমানভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। (১) এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে জগতের ইতিহাসে ভারতের স্থান যে কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছে, তাহা ভারতবাসী বুঝুক আর নাই বুঝুক, এসিয়া খণ্ডের যে সমস্ত জাতি জাতীয় জীবনে উদ্বোধিত হইতেছে, তাহারা বুঝে, এবং সেই জন্যই ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থায় তাহারাও যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

(১) ভূপতিবিজ্ঞানবিদ্ ৺ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঁহাদিগের বংশবল্লী এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দেবদহরাজ
- অঞ্জন (× যশোধারা)
  - সুপ্রবুদ্ধ (× অমৃতা বা অমিতা)
    - দেবদত্ত
    - যশোধরা বা গোপা × সিদ্ধার্থ
      - রাহুল।
  - দণ্ডপাণি
  - মায়া
  - * * * * *
  - প্রজাবতী
- কাঞ্চন (× সিংহহনু)
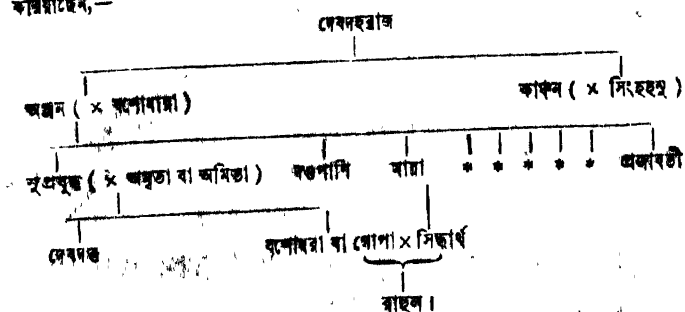
বিহগের দেশ-ভ্রমণ।

কোনও কোনও পাখী বার মাসই এক দেশে থাকে; আর কোনও কোনও পাখী এক ঋতুতে থাকে, অন্য ঋতুতে থাকে না। ইহারা যথাসময়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়। আমাদের চিরপরিচিত কোকিল ইহার এক দৃষ্টান্তস্থল। কোকিল বসন্ত ঋতুতে এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ খঞ্জন, চড়াই ইত্যাদি পাখী আপন আপন সময়মত দেশান্তর হইতে এ দেশে আসে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পক্ষিগণের ব্যবহার এইরূপ। কোনও পাখী দেশ-ভ্রমণ করে, কেহ বা করে না।

কিন্তু এই দেশভ্রমণ ব্যাপারটা কেবল পাখীরই স্বভাব নহে। মাছেরাও যথাসময়ে দলে দলে নদী সাঁতরাইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। কখনও বা ভাটির দিকে, কখন বা উজানের দিকে যায়। পশুর মধ্যে হস্তী প্রভৃতিও যথাকালে এক স্থান হইতে দলে দলে অন্য স্থানে যায়। কেবল যে নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবগণই দেশভ্রমণ করে, তাহা নহে; মানুষও অসভ্যাবস্থায় দলে দলে দলে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে। এক স্থানে থাকে না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, দেশভ্রমণ কাণ্ডটা অনেক জীবের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু পক্ষিগণের দেশভ্রমণে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা আদিকাল হইতে যে যে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সে সেই পথেই বংশানুক্রমে ভ্রমণ করে। যে জলের ঊর্দ্ধ দিয়া যায়, সে চিরদিনই ঐ পথে যায়। যে স্থলের উপর দিয়া যায়, সে চিরদিনই তদ্রূপ করে। ইহাদিগের এই স্বভাব জানা থাকিলে ভ্রমণপথ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ স্থান পূর্ব্বে জলময় ছিল, কোথায় বা স্থল ছিল। কোকিলের স্বভাব স্থলপথের ঊর্দ্ধ দিয়া ভ্রমণ। যদি কখনও কোকিলকে জলরাশির ঊর্দ্ধ দিয়া যাইতে দেখা যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে স্থল ছিল, এখন জল হইয়াছে। তাই কোকিল চির-স্বভাবশতঃ ঐ পথেই যাইতেছে। ইহা হইতে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক সময় জানা যায়।

আর পক্ষিগণের দেশভ্রমণের যেমন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, তেমনই নির্দ্দিষ্ট দিকও আছে। উহারা প্রায়ই উত্তর হইতে দক্ষিণে, অথবা দক্ষিণ হইতে

উত্তরে যায়। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের পক্ষিগণ দক্ষিণ দিকে, এবং দক্ষিণার্দ্ধের পক্ষিগণ উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। ইহাও একরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। যদিও এ নিয়মের ব্যভিচার কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়, তথাপি মোটের উপর এ কথা সত্য।

দেশভ্রমণ যখন অনেক জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহার কারণও সাধারণ হইবে। এই কারণ কি? অনেকেই মনে করেন যে, আহার-অন্বেষণই ইহার কারণ। যখন এক স্থানে আহারের অসদ্ভাব ঘটে, তখন অন্য স্থানে যায়। পক্ষিগণও আহারের নিমিত্তই দেশভ্রমণ করে। এই মত সত্য হইলেও, আমার বোধ হয় যে, ইহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। ডিম্বপ্রসবও ইহার অন্যতর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। চড়াই শ্রেণীর মধ্যেও আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহারা গ্রীষ্মকালে ও বর্ষার প্রারম্ভে এই দেশে থাকে। একটি চড়াই আমার বসিবার ঘরে ছাদের নীচে তীরের উপর বাসা করিত। সে প্রতি বৎসরই এক স্থানে বাসা করিত। আর বাসা করিয়া অল্প দিন পরে ডিম পাড়িত। মৎস্যগণ দলে দলে ভ্রমণ করে, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ঐরূপ করে। উহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যেখানে সুবিধা বোধ করে, তীরের মধ্যে, অথবা তীরের উপর, জলের মধ্যে, কি নদীর তলায়, যে স্থানে সুবিধা পায়, সেই স্থানেই ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বপ্রসব যেন ভ্রমণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই এ সকল ক্ষেত্রে অনুমান হয়। যাহা হউক, আহার-অন্বেষণ ও প্রসব, এতদুভয়কেই দেশভ্রমণের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

আহারের অভাব হইলে সভ্য মানুষও দেশ হইতে দেশান্তরে যায়, কেবল মরা মানুষই যায় না। ভ্রমণকাল উপস্থিত হইলে পক্ষিগণ এত উত্তেজিত হয় যে, উহাদিগকে কোনও প্রকারেই নিবৃত্ত করা যায় না। সে সময়ে যদি বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা বাহির হইয়া যাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। পিঞ্জরপার্শ্বে মাথা ঠুকিতে থাকে, এবং বারংবার এইরূপ করিতে করিতে মরিয়া যায়; তথাপি বহির্গত হইবার চেষ্টা ত্যাগ করে না। এ বৃত্তি এতই প্রবল। কিন্তু ইহাকে বৃত্তি বলাও সঙ্গত হয় হয় না; কারণ, বৃদ্ধ পক্ষিগণ ছানাগুলিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ক্রমশঃ ভ্রমণ শিক্ষা দেয়। ইহারা প্রত্যেক পুরুষ অপর পুরুষকে ভ্রমণ শিক্ষা দিয়া থাকে। সুতরাং

ইহাকে বৃত্তি বলাও ঠিক হয় না। যাহা হউক, দেশভ্রমণ ব্যাপারটি প্রায় বংশানুক্রমিক বৃত্তির মতই হইয়া গিয়াছে। নতুবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে যাওয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া ও বহু দিন পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসা, এ সকল কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে নিউজিলাণ্ড, এত দূরের পথ মনে রাখা ও যাওয়া আসা কিরূপে সম্ভব হয়? আহার-অন্বেষণ বা ডিম্ব-প্রসব, যাহাই কারণ হউক, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু দূরের পথ, বহু দিন পরে কিরূপে ইহারা যাওয়া আসা করে, তাহা বুঝা সহজ নহে। এ নিমিত্ত ইহাকে বৃত্তির ন্যায় বলিতেছি। ইহার কারণ এ পর্য্যন্ত বুঝা যায় নাই। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

কোথায় যাইবে, কোন্ পথে যাইবে, কোথায় ফিরিয়া আসিবে, এ সকল পক্ষিগণ কিরূপে স্মরণ রাখে? যাহাদিগের স্মৃতিশক্তি এত প্রবল, তাহাদিগের মস্তিষ্ক অত অনুন্নত কেন? এ সকল কথার আলোচনা আবশ্যক। অন্যত্র এ পর্য্যন্ত ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। এ দেশে কেহ চেষ্টা করিবেন কি? এক জনের চেষ্টায় এ সকল কার্য্য হওয়া কঠিন। অনেকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এ কার্য্য এতদ্দেশীয়গণের অসাধ্য নহে। আমরা পূর্ব্বে প্রেমিক ছিলাম; এখন রাজনীতিক হইয়াছি। জ্ঞানপিপাসু কখনও হইব কি? প্রশ্নের উত্তরপ্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীশশধর রায়।

বঙ্গবধূর প্রতি।

তুমি ছিলে আদি যুগে সম্পদের পূর্ণ মহিমায়
লক্ষ্মীরূপে অমরার সিংহাসনে। পূজিত তোমায়
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ শত পূজা-উপচারে,
তোমার কটাক্ষপাতে বিকাশি' উঠিত ভারে ভারে
নন্দনের পত্র পুষ্প—যেত বহি' প্রবাহ সুধার,—
তিলেক হারা'লে তোমা' সর্ব্ব স্বর্গ হইত আঁধার,

শিবে বিজিত মা ভিক্ষা তুমি যদি হইতে বিমুখ।—
তব অভ্যুদয়ে সেথা দৈন্য-লেশ-শূন্য যত সুখ
তোমারে বহিত নিত্য চন্দ্র-দীপ্ত-সিন্ধু-বক্ষ সম ;
নারীর নারীত্ব তাই বিধাতার সৃষ্টি নিরুপম।

বঙ্গবধূ অয়ি ! মর্ত্ত্যে তুমিই সে দেবতা প্রাচীন
লজ্জা-বিমণ্ডিত রম্য তনুখানি ধ'রেছ নবীন।
অদৃশ্য তোমার হস্ত চিরাভ্যস্ত সেবাপরায়ণ
সচেষ্ট সবার শ্রান্তি করিবারে সস্নেহে মোচন।
কর্ম্মরত বিশ্ব যবে চেয়ে থাকে উদাস-নয়ান,
অন্তঃপুর হ'তে লক্ষ্মী ! তুমি কর সযত্নে আহ্বান।
চন্দ্রিকা মেঘান্তরালে হাসে যবে গগনের বুকে,
অর্দ্ধস্ফুট স্নিগ্ধ আলো চরাচর পিয়ে তার সুখে,
তেমনি পতির বক্ষে অন্তঃপুরে বিরাজিছ তুমি,
স্নেহসুধাধারা তব তৃপ্ত করে সারা বিশ্বভূমি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মণিমালা।

—০—

১

সে বৎসর যখন ভীষণমূর্ত্তি প্লেগদৈত্য এক হস্তে মৃত্যু ও অপর হস্তে কোয়ারাণ্টাইন-ভীতি লইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিল, এবং সন্ত্রস্ত নগরবাসী প্রাণ ও মান লইয়া সুদূর পল্লীর উদ্দেশে ব্যস্তভাবে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় হেমন্তকুমার তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া দীর্ঘকালের কলিকাতা-বাস ত্যাগ করিয়া কমলদহের পল্লীবাসভবনে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্ষুদ্র গ্রাম জমীদার বাবুর আগমনে সরগরম হইয়া উঠিল। জমীদার বাবু কখনও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হইতেন না বলিয়া বৃদ্ধ নায়েব ভজহরি জমীদারী কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুযোগ করিত; এক্ষণে তাহার তরুণ প্রভুকে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহার হৃদয় হর্ষে

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পল্লীগ্রামের নিরীহ বালকের দল যখন দেখিল যে, তাহাদের জমীদার বাবু তাহাদেরই মত হস্তপদবিশিষ্ট মানব, কেবল তাঁহার নয়নযুগলের সম্মুখে একজোড়া "কাচের পরদা" মাত্র অতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান, তখন তাহাদের অস্থির হৃদয় কতকটা শান্তভাব ধারণ করিল। এইরূপে জমীদার বাবুর গ্রামে শুভাগমন ব্যাপারটি যে সকল কৌতুহল আগ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই হেমন্তকুমার এমন একটি কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিল যে, সাধারণে, বাহিরে না হউক, অন্তরের মধ্যে কিছুতেই তাহার সুশিক্ষা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির অনুমোদন করিতে পারিল না।

কমলদহে আসিবার কিছু দিন পরে হেমন্তকুমারের পত্নী সুকুমারী একদিন স্বামীকে কহিল, "এমন জায়গা ছেড়ে কলকেতা যেতে আমার একটুও ইচ্ছা করে না; কেমন খোলা নির্জ্জন জায়গা—গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি নেই, কোনও অশান্তি নেই।" হেমন্ত কহিল, "তোমার একখানা কাব্য লেখা দরকার হয়ে পড়েছে সুকু।" সুকুমারী কহিল, "না, সত্যি, ঠাট্টা নয়; আমি এখানেই থাকবো। কলকেতা যেতে হয়, তুমি যেও।"

হেমন্ত কহিল, "কি রকম হ'ল কথাটা?"

সুকুমারী। "তা নয় ত কি? তুমি ত তোমার সঙ্গীতসমাজ, বন্ধুবান্ধব, এ সব ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না;—এ অজগর বিজন বন, ঝিঁঝিঁ ডাকৃছে, শিয়াল ডাকৃছে!"

হেমন্তকুমার সুকুমারীর কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল, "মরি মরি, —এমন না হ'লে আর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী তুমি। ক'লকাতায় প্লেগ, পাওনাদার, ধূলো, চিম্‌নীর ধোঁয়ার মধ্যে না পাঠিয়ে আমাকে কেন দ্বীপান্তরে পাঠাও না।"

সুকুমারী মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, কথাটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?"

"নিষ্ঠুর নারী—আমি পাড়াগাঁ, সহরগাঁ, অত শত বুঝি না। তোমার মুখখানি দেখতে পেলে সব জায়গাই আমার পক্ষে সমান" বলিয়া হেমন্ত সাদরে পত্নীর কোমল অধরে চুম্বন করিল। সেই দিনই স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কমলদহে স্থায়িভাবে বাস করিতে হইলে বাটীর যেরূপ সংস্কার আবশ্যক, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল।

ইহার দুই তিন দিনের মধ্যেই বাড়ী বিবাহের কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। জীর্ণ আসবাবের সংস্কার হইতে লাগিল। খড়খড়ি ঝিলমিলিতে রঙ পড়িল। লোহিত মৎস্য রক্ষার জন্য সুদৃশ্য ফোয়ারা রচনা, গেটের পথে কাঁকর ফেলা, এবং গাড়ী বারান্দার থামগুলির অন্তরালে নানাবিধ রঙীন বিলাতী ফুলের গাছ বসান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার ও সজ্জার ধুম পড়িয়া গেল।

২

হেমন্তকুমারের সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতে তাহাদের একখানি ক্ষুদ্র বাগান্ ছিল। তাহার পশ্চাতে জনৈক দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণ বাটীর পার্শ্বে তাহাদের আর একখানি যে বৃহৎ বাগান ছিল, এক দিন তথা হইতে ফিরিয়া হেমন্ত সুকুমারীকে কহিল, "একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে সুকু!" "কি?" "এই খিড়কীর ছোট বাগানখানার সঙ্গে ওদিককার বড় বাগানখানা মিশিয়ে দেওয়া যাক্। চারি ধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে মধ্যে বেশ একটা মাঝারি রকমের দীঘী কাটানো যাবে;—একখানা জলিবোট আনাব, আর দীঘীর মধ্যে পাথর দিয়ে একটা ছোট পাহাড় করব, কি বল?"

আঁচলের খুঁট দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সুকুমারী কহিল, "বেশ ত। কিন্তু মাঝের ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটা তা হ'লে কোথায় যাবে?"

"কেন, ওটা কিনে ফেলবো যে!"

"আর ওরা যদি না দেয়?"

"না, দেবে না! টাকা পাবে,—দেবে না কেন?" "তা হ'লে বেশ হ'বে কিন্তু!" উদ্যানের পরিসরবৃদ্ধির প্রস্তাবটি উভয়ের অনুমোদিত হইলে, হেমন্তকুমার ভজহরিকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। এ প্রস্তাব ভজহরির নিতান্ত সঙ্গত মনে হইল। তখন একদিন জমীদারবাটীতে সেই জীর্ণবাটীর অধিকারীর তলব হইল।

হেমন্তের প্রতিবেশী মহেন্দ্রনাথ মিত্র কমলদহের উপকণ্ঠে পাটের কলে কাজ করিত। বেতন মাসে ত্রিশটি টাকা। সংসারে স্ত্রী ও সপ্তমবর্ষীয়া একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সুতরাং ঐ অল্প আয়ে বিনাড়ম্বরে ও বিনা-ক্লেশে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। মহেন্দ্রনাথের একটি গুরুতর দোষ ছিল যে, সে কাহারও সহিত মিশিতে পারিত না। লৌকিকতার সে বড় একটা ধার ধারিত না, এবং গৃহের বাহিরে সমাজের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। কেমন একটা এলোমেলো

খাপছাড়া প্রকৃতি তাহার হৃদয়কে এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল
যে, সে তাহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ পাটের কলে অতিবাহিত করিয়া,
অবশিষ্ট সময় গৃহমধ্যে, পত্নী ও কন্যার সহিত লীলাচ্ছলে অতিবাহিত করিত।
ইহাতে পত্নীর চক্ষে সে কোনও কুৎসিত নিশাচরপক্ষীর সহিত উপমিত
হইলেও, দুঃখিত হইত না। কূর্ম্মনামক জীবটি যেমন বাহিরে আপনার মাথাটা
ক্ষণকালের জন্য নাড়িয়া চাড়িয়া নিতান্ত সহজ পরিতৃপ্তির সহিত পৃষ্ঠস্থ কঠিন
আবরণের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তেমনই মহেন্দ্রনাথ বাহিরে কর্ম্মস্থলে
কিয়ৎক্ষণের জন্য মস্তক নাড়িয়া আপনার গৃহাবরণের মধ্যে আসিয়া পরিপূর্ণ
শান্তি অনুভব করিত। পাড়ার লোকে এই নিঃসম্পর্ক ও নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটির
প্রতি যেটুকু স্নেহ বা সহানুভূতি দেখাইত, সেটুকু শুধু তাহার স্বর্গীয় পিতার
পরোপকারপ্রসূত; নচেৎ মহেন্দ্র কখনও পল্লীকে এমন অবসর দান করে
নাই, যাহাতে পল্লীর সহিত তাহার হৃদয়ের সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বর্দ্ধিত
হইতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ যখন সশঙ্কহৃদয়ে জমীদারের নবসজ্জিত ড্রয়িংরুমে ভজহরির
সহিত পদার্পণ করিল, তখন হেমন্তকুমার হার্ম্মোনিয়ামে একটা গৎ বাজা-
ইতেছিল। ভজহরি কহিল, "মহেন্দ্র বাবু এসেছেন।"
বেহাগের অন্তরাটা অসমাপ্ত রাখিয়া হেমন্তকুমার কহিল, "বসুন, আপনার
সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"
বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র কহিল, "আমার সঙ্গে বিশেষ কথা?—বলুন।"
তখন হেমন্তকুমার উদ্যানবর্দ্ধনকল্পে মহেন্দ্রনাথের জীর্ণবাটীটি ন্যায্যাধিক মূল্যে
ক্রয় করিতে চাহেন, এইরূপ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিলেন, এবং বাড়ীখানি
কতগুলি মুদ্রার বিনিময়ে মহেন্দ্রনাথ হস্তান্তরিত করিতে পারেন, তাহা
জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেও ভুলিলেন না। বিস্মিতভাবে
মহেন্দ্র কহিল, "কত টাকা চাই? কেন, আমি ত বাড়ী বিক্রী কর্‌ব না।"
হেমন্ত কহিল, "আপনার ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী পাচ্ছেন, তবু বেচ্‌বেন না?"
মহেন্দ্র করযোড়ে কহিল, "আমাকে মাপ কর্‌বেন—ও বাড়ী আমি ছাড়্‌তে
পার্‌বো না।" ভজহরি কহিল, "এমন পাগলও ত দেখিনি মশায়, বাবু কিন্‌তে
চাচ্ছেন,—ঐ ছুটো বাগান এক করে ফেলা হবে, মধ্যে আপনার বাড়ীটা
থাক্‌বে,—তা হচ্ছে না; এই সাদা কথাটা বুঝতে পাচ্ছেন না মহেন্দ্র বাবু?"
মহেন্দ্র কহিল, "ক্ষমা করুন মশায়—আমি বেশ বুঝেছি—আপনাদের একখানা

বাগানের জন্তে আমাকে ছিটছাড়া করবেন।” হেমন্ত কহিল, “আচ্ছা, দেখুন, অন্যত্র আপনি ওর চেয়ে ঢের ভাল জমী পাবেন ; আমার লোক জায়গা খুঁজে দেবে। ওটার জন্তে একটা মোট্‌া রকম টাকা নিন্।” মহেন্দ্রনাথ হেমন্তের মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, “আমি এত লক্ষ্মীছাড়া হইনি যে, সামান্ত কটা টাকার লোভে পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা ত্যাগ করব! আপনারা জমীর খাজনা বাড়িয়ে দিন, তা আমার সহ্য হবে ; কিন্তু ও বাড়ী আমার প্রাণ,—টাকার লোভ দেখিয়ে ওটুকু আমার কেড়ে নেবেন না।” হেমন্তকুমার এই ‘পাড়াগেঁয়ে’ লোকটার ‘প্রেজুডিস্’ ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া ভজহরিকে কহিল, “লোকটা কি একগুঁয়ে! কিন্তু জায়গাটা আমার চাই-ই! এত টাকা দোবো, তবু দেবে না?” ভজহরি কহিল, “জমীটা ওদের মৌরসী করে দেওয়া হয়েছে—তাই এত জোর! তা খোকাবাবু, অত ভালমানুষী করলে ত চল্‌বে না। ওকে ভয় দেখাতে হবে। জমীটা বাগান দু’খানার মাঝে প’ড়ে ভারী অসুবিধা হয়েছে। স্বর্গীয় কর্ত্তা ওটা কিন্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি।” হেমন্ত বিরক্তভাবে কহিল, “বল্‌লুম ঢের ভাল জায়গা আছে ;—পছন্দ করে’ বাড়ী তৈরি কর। তা শুন্‌বে না।” ভজহরি কহিল, “নির্ব্বোধ আর কাকে বলে? ঐ ত ভাঙ্গা-বাড়ী,—ওর দাম কি? তবু যে কটা টাকা পাস্ বাপু তোরই ত লাভ।”

হেমন্ত। কিন্তু ও জমীটা না হ’লেই নয়। যখন এখানে বাস করছি, তখন মানুষের মত একটু ভাল করে ত থাক্‌তে হবে। বাগানটা না হ’লে বাড়ীখানা একটুও মানাচ্ছে না।

ভজহরি মৃদুকণ্ঠে কহিল, “একটা উপায় আছে ; কিন্তু—”

“কি?”

একান্ত না রাজী হয় ত বাকীখাজনার দাবী দিয়া নালিশ করে দেওয়া যাক্ ; ভাল উকীলের জোরে শেষে ডিক্রি করে নেবে।” হেমন্ত প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না না, খাজনা বাকী কিছু নেই ত। সেটা ভারী অত্যাচার হবে যে!” হাত নাড়িয়া ভজহরি কহিল, “অত্যাচার হবে কেন? তার পর আপনি না হয় ওদের বাড়ীর দামের জন্ত কিছু টাকা ধরে দেবেন। তা হ’লেই চুকে যাবে। স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে এই রকম করে’ কত একগুঁয়ে প্রজাকে জমী থেকে তুলে দিয়েছি। এ রকম না কর্‌লে কি জমীদারদের চলে?”

সেই দিন রাত্রে হেমন্ত ভজহরির কথা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই যেন কাজটা তাহার নিকট রূঢ়তা ও নির্দ্দয়তা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহেন্দ্রনাথ শুনিল, যদি সে ভাল কথায় বাড়ী ছাড়িয়া না দেয় ত তাহার নামে বাকীখাজনার নালিশ রুজু হইবে। বেচারী স্তম্ভিতভাবে গৃহে আসিয়া পত্নী মনোরমাকে সমস্ত কহিল। মনোরমা দন্ত দ্বারা রসনা চাপিয়া কহিল, "ছি! ছি! তা কখনও হতে পারে! সত্য কি এমন কলি হয়েছে!"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "ওরা যে বড়লোক মনু! ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি আমি এখানে টেঁক্‌তে পারব?"

মনোরমা কহিল, "সে কথা ঠিক্। তা কাজ নাই এ সব গোলমালে; বাড়ীখানা বরং ছেড়েই দাও না। দেখ দিকিন, ক'দিন ভেবে ভেবে তোমার রং যেন কালী মেড়ে গেছে; সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবলই ত ভাব্‌ছ।"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "তা হবে না মনু। বাড়ী আমি ছাড়্‌তে পার্‌ব না। বড়লোকের সখের জন্যে আজ বাড়ী ছাড়্‌ব, তার পর কাল যদি মাথাটা ছাড়্‌তে বলে?"

"তোমার এক কথা!"

মহেন্দ্রনাথ। না মনু, তুমি আমাকে ভরসা দাও। তুমি বাড়ী ছাড়্‌বার পরামর্শ দিও না। বল কি? ওরা মিছামিছি নালিশ করে বাড়ী কেড়ে নেবে?"

"হ্যাঁ, অমনি নিলেই হ'ল! মগের মুলুক কি না! ধর্ম্ম কি একেবারেই নেই!"

"তা ত বুঝি; কিন্তু ধর্ম্ম ত এ সব সইছেন।" মহেন্দ্রের চক্ষু হইতে সত্যই দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। "ওকি কাঁদ্‌ছ নাকি! না, কেঁদ না" বলিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া মহেন্দ্রের অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে তাহা সংবরণ করিবার জন্য জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

বৃদ্ধ সুদক্ষ কর্ম্মচারীর সাহায্যে যাহা হইয়া থাকে, এ স্থলেও ঠিক সেইরূপ হইল। নির্দ্দোষী মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাকীখাজনার দাবী দিয়া জেলা-কোর্টে নালিশ রুজু হইল, এবং উকীল মোক্তারের হস্তচালনা ও বক্তৃতার মহিমায় জমীদার পক্ষ অনায়াসে মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইল। অবসন্ন-

হৃদয় মহেন্দ্রনাথ হেমন্তকুমারের নিকট করযোড়ে এক মাসের অবকাশ ভিক্ষা চাহিল। হেমন্তকুমার মহেন্দ্রনাথের অশ্রুময় আবেদন অগ্রাহ্য করিল না।

সে রাত্রে মহেন্দ্রনাথ মনোরমার নিকট কিছুতেই আপনার অন্তর্বেদনা লুকাইতে পারিল না, এবং মনোরমাও এমন একটি কথা খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দ্বারা স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করে। দুঃখে শোকে তাহার হৃদয়ও আজ একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নারীহৃদয়ের সরল দৃঢ়বিশ্বাসের উপর আজ যে নির্দ্দয় আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধনগুলি ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে! আজিকার ঘটনা তাহার নিকট যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে? সাক্ষা একেবারে মিথ্যা, তাহা সত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও কি করিয়া যে সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে পারে, এ কথাটি মনোরমা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

৬

যে সময়টুকুর মধ্যে হেমন্তকুমার, ভজহরি প্রভৃতি মিলিয়া মহেন্দ্রনাথের দুর্দ্দশার কারণ হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়টুকুতে বিধাতাপুরুষ তাঁহার আর একটি গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষিপ্রহস্ত প্রয়োগ করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে হেমন্তকুমারের ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা বীণা উদ্যানে দু' একটি' প্রজাপতির পশ্চাতে ঘুরিবার সময় মহেন্দ্রনাথের বাটীর ভাঙ্গা জানালার সম্মুখে একটি ফুটফুটে মেয়েকে পুতুল খেলিতে দেখিয়াই ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি বীণাকে দেখিয়া বিচলিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ভাই?" "আমি বীণা।" "তোমরা বুঝি ঐ বড় বাড়ীতে থাক?" "হাঁ।" "ঐটে ধরছিলুম—বুঝি তোমাদের বাগান?" "হাঁ।" "তুমি বাগানে কি করছিলে?" "প্রজাপতি ধরছিলুম; তার পর তোমাকে দেখতে পেলুম।" ক্রমে আরও নিকটে আসিয়া বীণা কহিল, "তুমি ও কি খেলছো ভাই? আমাকে নিয়ে খেলবে?" "খেলবো; তুমি ভাই আমাদের বাড়ী আসবে?" চারি ধারে চাহিয়া মৃদুস্বরে বীণা কহিল, "না ভাই, গেলে যদি মা জানতে পারে, তা হ'লে যদি বকে? তার চেয়ে তুমি এই বাগানে এস না কেন!" "তোমার মা যদি বকে?" "মা জানতে পারবে না; মা ত এ ধারে আসে না।" "আচ্ছা, খেলবো ভাই, আমাকে ফুল দেবে?" "দোবো;—

তোমাকে কি বলে ডাকবো?" "আমার নাম শুভা। বাবা মা আমাকে ভাই টুনু বলে ডাকে!" "আচ্ছা ভাই টুনু, রোজ বিকেলে আমরা এখানে এক সঙ্গে খেলা করবো। দুপুর বেলা আসতে পারবো না।" শুভা কহিল, "কিন্তু ভাই, তোমরা বড়মানুষ,—আমার সঙ্গে খেলতে এলে তোমার মা যদি বকে!" "না ভাই, মাকে বলব কেন? মা কিছু জানতে পারবে না।"

সেই দিন এই বালিকা দুইটি বিজনে পরস্পর হৃদয়-বিনিময় করিল। মনোরমা জানিল; শুভাকে কহিল, "ওদের বাড়ীতে যেও না যেন; ওরা বড়মানুষ; যেতে নেই।" শুভা মাতার কথা রক্ষা করিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও সে কখনও বীণাদের বাড়ী যাইতে চাহিত না।

বীণাও সাহস করিত না। বীণা দুই একবার গোপনে শুভার মার হাতে খাবার খাইয়া গিয়াছে। আর শুভার আদর কত! কিন্তু শুভাদের বাড়ী যাইতে তাহার বড় একটা সাহস হইত না, কি জানি যদি মা জানিতে পারে। তাহা হইলে সে বাগানেও আসিতে পাইবে না,—শুভার সঙ্গে খেলিতেও পাইবে না।

এইরূপে যখন দুইটি পরিবারের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর সম্পর্ক ঘনীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে এই বালিকা দুইটি সমস্ত দ্বেষ হিংসা হইতে পৃথক থাকিয়া পরস্পরকে অতিরিক্তভাবে ভালবাসিয়া ফেলিতেছিল! হায়! এ জগতে শুভ্র শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের অকৃত্রিম অনুরাগ কত অন্ধ, কত গভীর।

৪

[illegible] করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এক মাসের জন্য যে সময়টুকু ভিক্ষা মাগিয়া লইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইতে দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে। চলিয়া যাইবে বলিয়া তাহার সহিত বীণার ছেলের বিবাহ দিবার জন্য শুভা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল।

অবশেষে যে দিন দ্বিপ্রহরে হেমন্ত ও সুকুমারী সুসংস্কৃত গৃহপ্রাচীরে ভাল ভাল ছবি খাটাইতে ব্যস্ত ছিল, বীণা সেই অবসরে একটি আঙ্গুরের বাক্স লইয়া মহেন্দ্রের জীর্ণ জানালার ধারে আসিয়া ডাকিল, "টুনু!" টুনু বাগানে আসিল। বীণা কহিল, "এই দেখ ভাই, গায়ে হলুদ এনেছি!" বলিয়া আঙ্গুরের বাক্স খুলিয়া 'জরীর কাপড়', 'ওড়না', 'পুঁথির মালা' প্রভৃতি বাহির করিল। শুভা কহিল, 'আমি ভাই! মাকে বলেছিলুম।

মা বেশ পুঁথির গহনা তৈরি করতে পারে; থান পাঁচ ছয় পুঁথির গয়না আমি দেব। আর জরীর কাপড় কোথায় পাব বোন! মা ত ভাই জরির কাপড় পরে না।" বলিয়া একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া পুঁথির গহনা বাহির করিল। বীণা কহিল, "বাঃ! দিব্যি ত! এত দিচ্ছ—আবার কি দেবে ভাই! তা এগুলি এখন নিয়ে যাই; ভাল করে দেখিগে;—আমি পড়তে পড়তে পালিয়ে এসেছি, এখনি যদি খোঁজ পড়ে! সন্ধ্যার সময় আসব এখন! তুমিও ভাই! তোমার মাকে 'তত্ত্ব' দেখাওগে।" বীণা চলিয়া গেল।

ছবি-খাটানো শেষ হইয়াছিল। হেমন্ত বাড়ী ছিল না। বীণা ত্রস্তভাবে উপরে উঠিতেই বারাণ্ডায় একেবারে সুকুমারীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল!—অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়া তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে কাগজের মোড়ক যেমনই খড়্ খড়্ শব্দ করিল, অমনই সুকুমারীর তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে কালবিলম্ব ঘটিল না! সুকুমারী কহিল, "কি রে!" সর্ব্বনাশ! বীণার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল! সুকুমারী কহিল, "ও কি ও? পেটের কাপড়ে লুকোচ্ছিস্?" "না না" বলিয়া করুণদৃষ্টিতে সভয়ে বীণা মাতার প্রতি চাহিল। মাতা কহিল, "দেখি!" বীণা তখন গোপনে রাখা সঙ্গত মনে করিল না!

সুকুমারী কহিল, "এ সব কোত্থেকে পেলি?" ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে বীণা কহিল, "উঃ!" সুকুমারী কহিল, "বল্; না হলে এখনি সব ফেলে দেব।" বীণার মনে বড় আঘাত লাগিল। যাহাই হউক, আত্মদোষ-ক্ষালনের জন্য সে কহিল, "ওদের বাড়ীর মেয়ে যে দিলে!" সুকুমারী কহিলেন, "কাদের বাড়ীর মেয়ে!" "ঐ যে—ঐ বাগানের পাশে ভাঙ্গা বাড়ী যাদের!" "তার সঙ্গে তোর দেখা হ'ল কি করে'?" "বাগানে গেছলুম।" "বটে, এই সব করে' বেড়াচ্ছ এখানে!—ওদের মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব হ'ল কি করে'?" বীণা কম্পিতস্বরে কহিল, "ও যে ভাব করলে!" "বটে? ও ভাব করলে লাফিয়ে এসে—না? দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে দিচ্ছি।" বীণা ব্যস্তভাবে কহিল,—"না মা, বাবাকে বলো না; বাবা মারবে তা হ'লে!—টুনু খুব ভাল মেয়ে মা, সে আমাকে খুব ভালবাসে।" বীণার বড় কষ্ট হইতেছিল। শুভার মা তাহাকে এত ভালবাসে, আর তাহার মা শুভাকে একটুও ভালবাসিবে না? সুকুমারী কহিল, "এ সব কথা বলিস নি কেন আমাকে?" "যদি তুমি বকো!

টুনুর মা বলে—আমরা বড়মানুষ, তারা গরীব মানুষ; মিশতে নেই; কিন্তু টুনু বড়মানুষের চেয়েও ভালো মা; কলকেতার স্কুলের লোকেও মেয়ে আমাকে এত ভালবাসত না।” ক্রমে পুতুলের বিবাহপ্রসঙ্গ বীণা মাতার গোচর করিল। সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা দেখি, কি গহনা দিয়েছে তোর বৌকে?” বীণা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি মাতার সম্মুখে কাগজের মোড়া খুলিয়া পুঁথির গহনা বাহির করিতে বসিল। সুকুমারী কহিল, “তুই কি দিলি?” মুখখানা গম্ভীর করিয়া বীণা কহিল, “আমি আর কি দোব? সেই জরীর কাপড় ছেঁড়াটুকু দিয়েছি, আর ওড়না দিয়েছি।” “আচ্ছা, তুইও ভালো জিনিস দিস;—এখন দুপুরবেলা এই রোদে ছুটোছুটি করে না; বই নিয়ে আর একটু পড় দেখি!” বীণা ছুটিয়া কক্ষান্তরে পুস্তক আনিতে গেল। সুকুমারী যে কাগজের মোড়কে শুভার প্রদত্ত পুঁথির গহনা জড়িত ছিল, সেটা তুলিয়া পড়িতে লাগিল। সেটা একখানি পত্রের ছিন্নাংশ। পত্রখানি স্ত্রীলোকের লেখা। যতটুকু পাঠ করা যায়, এইরূপ :—

“হলুম। কি আর করবে বল—সবই অদৃষ্ট! না হলে সুকুমারী এমন করে, কে জানত! যখন স্কুলে পড়তে, তখন তার সঙ্গে ‘মণিমালা’ পাতিয়েছিলে না? দু’ জনে কত ভাব ছিল। আজই না হয় কপালে দুঃখ—তোমার স্বামী গরীব, আর সুকুমারীর অদৃষ্টগুণে জমীদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! ভাই! ছেলেবেলাকার ভালবাসা কি এমনি করে ভোলা যায়? বড়মানুষের স্ত্রী হয়ে সুকুমারী আজ ‘মণিমালা’ বলে তোমায় না-চিন্‌তে পারে, কিন্তু তাই বলে এমনি করে কি পেছনে লেগে ভিটেছাড়া করতে হয়! আহা! বেচারী মহেন্দ্রবাবু; তাঁর বোধ হয় খুবই প্রাণে লেগেছে—তা আর লাগ্‌বে না ভাই! নিঃঝঞ্ঝাটে মানুষ! সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এ রকম করে লাগাটা কি ভাল! যাই হোক্, উনি বল্‌লেন, তুমি না হয় দুদিন এখানে বেড়িয়ে যাও—তবু মনটা একটু যদি শোধরায়! আমরা ত ভাই জমীদার মানুষ নই, আর আমার সঙ্গে কখনও ত মণিমালা পাতাও নি—তার পরে বরং—”

অবশিষ্ট অংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পত্রাংশটুকু পাঠ করিয়া সুকুমারীর সুন্দর কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে একটা পুরাতন দৃশ্য সমস্ত সজীবতা ও মধুরতা লইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই স্কুলগৃহ, সেই বাল্যসখীগণের ক্রীড়াকৌতুক, মনোরমার সহিত ‘মণিমালা’ পাতানো—সেই একদিন সুকুমারীর নূতন সোনার ইয়ারিং হারাইয়া গিয়াছিল—মনোরম

[illegible]

লোক হবে। তুমি [illegible] বড় [illegible] না। মহেন্দ্রবাবু তোমাকে সাহায্য করেন যদি, [illegible] হবে, কি বল!—হাঁ, আর দেখ, মিস্ত্রীদের এ বাড়ীর [illegible] এক রকম হয়েছে—তা মহেন্দ্রবাবুর ও বাড়ীখানা মেরামতের [illegible] পড়েছে। তাদের ডাকিয়ে পাঠাও; দু এক দিনের মধ্যে তারা ও বাড়ীর কাজ আরম্ভ করে দিক্!" তাহার পর মহেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপাততঃ আপনি কোথায় থাক্বেন, সেটা হয় ত খুব সামান্য মনে করেছেন, না মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু সামান্য কিছু নেই। এই বাড়ীতেই এক সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। সঙ্গী অভাবে আমাদের বড়ই কষ্ট হচ্ছিল; সে কষ্ট থেকে আপনারাই উদ্ধার করতে পারেন।"

অপ্রত্যাশিত সুখে মহেন্দ্রনাথের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত।*

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার সহিত বুদ্ধদেবের লীলাভূমির পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রকাশে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তিন শত বৎসরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি। ফলতঃ, চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সর্ব্বথা আলোচনার যোগ্য। অদ্যাবধি ন্যূনাধিক ৪৫ জন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* 1. Travels of Budhist Pilgrims—S. Beal.
2. Budhist Records of Western World—S. Beal.
3. Ancient India—R. C. Dutt.
4. Ancient Geography of India—A. Cannigham.
5. উৎসাহ, তৃতীয় খণ্ড।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফাহিয়ান চীন দেশের শান্সী নামক প্রদেশে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কুঙ্গ। তদীয় পিতা শৈশবেই তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধমঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং সেই সময়ে ফাহিয়ান নাম ও 'সি' উপাধি গ্রহণ করেন। 'সি' শব্দের অর্থ শাক্যপুত্র।

ফাহিয়ান একরূপ আজন্ম সন্ন্যাসী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও বুদ্ধদেবের জন্মভূমি-দর্শনাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠ ও পবিত্র বৌদ্ধতীর্থসমূহ দর্শন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন।

ফাহিয়ানের সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার সহযাত্রী হইবার সঙ্কল্প করেন। ফাহিয়ান তাঁহাদের সমভি-ব্যাহারে খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রী দল চীন সাম্রাজ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম মরুপথে অগ্রসর হন, এবং সপ্তদশ দিবস লোকালয়শূন্য পথে অতিবাহিত করিয়া, সেন-সেন (আধুনিক লিওনাম) নামক দেশে আগমন করেন। এক মাস কাল বিশ্রামান্তে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ সেন-সেন দেশ পরিত্যাগ করেন, এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া টেঙ্গিস হ্রদের নিকটবর্ত্তী উকি (কার সহর) নামক দেশে উপনীত হন। তার পর তাঁহারা উকিদেশ হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, এবং দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এক মাস পাঁচ দিবসে সেটান নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ বিশ্রামার্থ তিন মাসের অধিক অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহারা পঞ্চ-বিংশতি দিবস পর্য্যটন করিয়া ইয়ারকন্দে উপস্থিত হন। ইয়ারকন্দে এক পক্ষ বিশ্রাম করিয়া যাত্রী দল সুঙ্গলিঙ্গ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যটনের পর কিয়েশা দেশে উপনীত হন। এই স্থান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। তৎকালে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থানের কিয়দংশ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগে বহু হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল

[illegible]

জনপদের [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] (৪), পুরুষপুর (৫) এবং [illegible] [illegible] প্রাপ্তি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের নাম অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে।

স্বদেশ-পরিত্যাগের ন্যূনাধিক সাত মাস পরে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই সাত মাস কাল তাঁহাদিগকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জনশূন্য মরুস্থল, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বতমালা ও বেগবতী পার্ব্বত্য নদী পদে পদে তাঁহাদের পথরোধ করিত। অপরিচিত দেশের অপরিচিত অধিবাসীর ব্যবহারে অনেক সময় তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিত; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বাধা বিঘ্নে অবিচলিত থাকিয়া, কখনও সাধুচরিত্র লোকের আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া, কখনও কটুকষায় বন্য ফলমূলে উদরপূর্ত্তি করিয়া, কখনও নিরম্বু উপবাস করিয়া, জ্ঞান ও পুণ্যলাভার্থ ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এসিয়ার পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় সমগ্র মধ্য-এসিয়ায় অর্থাৎ চীনের পশ্চিম সীমা হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। আমাদের যাত্রী দল এই ভূভাগে বহু সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জনপদ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। এই সকল জনপদ হইতেই তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় সভ্যতার আভাস প্রাপ্ত হন। তদ্দেশবাসীরা আচার ব্যবহারে বৈদিক জাতির সদৃশ, এবং ধর্ম্মবিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ফলতঃ, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র মধ্য-এসিয়া জ্ঞানধর্ম্মে, শিল্প বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এসিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে সিন্ধুনদের

---

(১) [illegible] পশ্চিমদিকস্থিত দারিয়াল-নদীধৌত উপত্যকা ভূমি।

(২) [illegible] সোয়াত প্রদেশ।

(৩) বর্ত্তমান কান্দাহার।

(৪) সিন্ধুনদ হইতে তিন দিনের পথ, এবং কান্দাহার হইতে সাত দিনের পথ দূরে তক্ষশিলা রাজ্য অবস্থিত ছিল।

(৫) বর্ত্তমান পেশওয়ার।

(৬) বর্ত্তমান জালালাবাদ জেলা।

তীরে আগমন করিলে, ফাহিয়ানের সহযাত্রিগণ বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি একাকী সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া বহুপথ পর্য্যটনপূর্ব্বক যমুনার তীরবর্ত্তী চিরখ্যাত মথুরা নগরে আগমন করেন।

ফাহিয়ান ভারতবর্ষের বহু নগর ও বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধশাস্ত্র, বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির কথায় পূর্ণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সমস্ত পাঠ করিয়া সে সময়ের ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণের জন্য এখানে ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তের সারসঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

মথুরা ;—মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী যমুনা নদীর দুই তীরেই সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এইরূপ সঙ্ঘারামের সংখ্যা বিংশতি। তাহাতে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করেন। বৌদ্ধ বিধানের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। মথুরার নিকটবর্ত্তী মরুভূমির পশ্চিমসীমান্তে পশ্চিম-ভারত। এই দেশের রাজন্যকুল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। শ্রমণদিগকে দান করিবার সময় তাঁহারা রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজবৃন্দের আত্মীয় স্বজন ও মন্ত্রিগণই অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। অন্নদান শেষ হইলে, তাঁহারা প্রধান শ্রমণের সম্মুখে গালিচা পাতিয়া উপবেশন করেন। তাঁহারা কখনও শ্রমণগণের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন না। রাজগণ কর্ত্তৃক ভিক্ষাদানের নিয়মাবলী বুদ্ধদেবের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। মথুরার দক্ষিণদেশে মধ্যদেশ। মধ্যদেশ বার মাস উষ্ণপ্রধান ; এখানে বরফ বা তুষার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা স্বচ্ছল ; তাঁহাদিগকে লোকসংখ্যানুযায়ী কর, ভূমিকর দিতে হয় না ; কেবল যাহারা রাজভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে লাভের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। গমনাগমন সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাধীনতা আছে। কোনও অপরাধীকেই শারীরিক শাস্তি ভোগ করিতে হয় না ; রাজন্যবৃন্দ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অল্পাধিক অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এমন কি, কেহ পুনঃপুনঃ রাজদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। রাজরক্ষীরা নির্দ্দিষ্টহারে বেতন পাইয়া থাকে। এই দেশে প্রাণিহত্যা নাই ; লোকসমূহ মদ্য, মাংস, অথবা পেঁয়াজ রশুন ব্যবহার করে না। কেবল চণ্ডালেরা এই

সকল দ্রব্যে অজ্ঞাত। চণ্ডালদের অন্য নাম 'বধলোক'; তাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে। যদি তাহারা কখনও নগরে বা বাজারে প্রবেশ করে, তবে সঙ্গে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া যায়; এই হেতু জনসাধারণ তাহাদিগকে দেখিয়াই চণ্ডাল বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এই দেশের লোকে হাঁস অথবা মুরগী পালন করে না; তাহাদের মধ্যে গরুর ব্যবসায়ও প্রচলিত নাই। হাট বাজারে কশাইখানা ও মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল চণ্ডালেরা মৃগয়া-লিপ্ত হয়, এবং মাংস বিক্রয় করে। আদানপ্রদানকালে কড়ি ব্যবহৃত হয়। এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার-নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজা তজ্জন্য তাম্রলিপি দান করিয়া থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গ নিরুপদ্রবে ঐ সমস্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিহারসমূহে প্রত্যেক শ্রমণের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে; এই সকল স্থানে তাঁহারা লোকহিত, শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানে নিরত থাকেন।

কণোজ ;—এই নগর (১) গঙ্গার তীরে অবস্থিত। কণোজে দুইটিমাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। সেখানে হীনযান-মতাবলম্বী শ্রমণগণ বাস করেন। কণোজের অনতিদূরে পশ্চিম দিকে একটি স্থানে বুদ্ধদেবের শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবৃন্দের হিতকল্পে মানব-জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদীয় শিষ্যগণ এই ঘটনার স্মরণচিহ্নস্বরূপ কণোজে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রাবস্তী ;—শ্রাবস্তী (২) কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই চিরখ্যাত

---

(১) প্রাচীন ভারতের ভূগোল নামক গ্রন্থের রচয়িতা কনিংহাম লিখিয়াছেন, ঘাগরা নদীর তীরবর্ত্তী গোরাবাদ হইতে তাপ্তী ও যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী এটোয়া হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কণোজ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কণোজ রাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল কণোজ। হিউএনসাঙ্ লিখিয়াছেন যে, কণোজ দৈর্ঘ্যে ৩½ মাইল ও প্রস্থে ¾ মাইল ছিল।

(২) শ্রাবস্তী অযোধ্যার অন্তর্গত রাপ্তি নদীর তীরস্থিত বলরামপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পুরাকালে শ্রাবস্তী যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত।

নগরীর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নগরে লোকসংখ্যা নগণ্য ; [illegible] দুই শত পরিবারমাত্র বাস করিতেছে। এই নগরীতে একদা প্রসেনজিৎ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ঐ সকল কীর্ত্তিমন্দির দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র ও বিদ্যুৎপাত আরম্ভ হয় ; এই কারণে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। শ্রাবস্তী নগরী হইতে অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে সুদত্ত একটি সপ্ততল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিহারের পার্শ্বে নির্ম্মলসলিল তড়াগসমূহ, চিরহরিত তরু-পূর্ণ বনরাজি ও বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পুষ্পশোভিত উদ্যানমালা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার নাম জেতবন। এই স্থানে মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের রাজন্যবৃন্দ এই জেতবনে ধর্ম্মার্থ দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই দান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। সমস্ত রাত্রি জেতবন উজ্জ্বল দীপমালায় আলোকিত থাকিত। একবার একটি মূষিক প্রজ্বলিত শলিতা মুখে করিয়া চন্দ্রাতপের উপর নিক্ষেপ করে ; তাহার ফলে সপ্ততল বিহার ভস্মীভূত হয়। এই বিহারের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত আদিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) এই জন্য জেতবনের ধ্বংস-সংবাদে সমগ্র দেশে বিষাদের ঘন ছায়া পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু ৪।৫ দিন পরে জেতবনের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আদিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বত্র বিপুল আনন্দধ্বনি উঠে। অচিরে দ্বিতল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কপিলবস্তু ;—এই নগরে (২) রাজা বা প্রজা, কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া

---

(১) বৌদ্ধ ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা বুদ্ধদেব জেতবন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব প্রত্যাগত হইলে, ঐ দারুমূর্ত্তি সচল হইয়া অন্যত্র গমন করিতে উদ্যত হয়। তখন বুদ্ধদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এখানে স্থির থাক ; উত্তরকালে শিষ্যগণ তোমার আদর্শে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।

(২) উত্তর অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চণ্ডতাল নামক নদীর তীরে নগর নামক স্থানে কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল,—কনিংহাম এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

যায় না। সুতরাং নগর মধ্যে বৃহৎ রাজবাটীর ন্যায় প্রাচীরবেষ্টিত [illegible] কেবল এক জন শ্রমণ বাস করিতেছেন; [illegible] পাওয়া যায়। মহারাজ শুদ্ধোদনের ভগ্ন প্রাসাদের [illegible] বিলম্বিত আছে। এই চিত্রে বুদ্ধদেবের মাতার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব মাতার উদরে প্রবেশ করিতেছেন! কপিলবস্তু নগরে বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনার স্মরণচিহ্নস্বরূপ স্তূপসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সমস্তই জনমানবশূন্য। সমগ্র নগর পরিত্যক্ত পুরীর ন্যায় মনে হয়। পথে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কপিলবস্তু-বাসীরা সিংহ ও শ্বেত হস্তীর ভয়ে কদাচিৎ গৃহের বাহির হয়।

কুশীনগর;—এই স্থানে (১) হিরণ্যবতী নদীর তীরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। এখানে বুদ্ধদেবের অন্তিম কালের নানা ঘটনার চিহ্ন-স্বরূপ স্তূপসমূহ বিদ্যমান আছে। কপিলবস্তুর ন্যায় কুশীনগরের জনসংখ্যাও অত্যল্প। এখানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা শ্রমণ-সম্প্রদায়ের সহিত সংসৃষ্ট।

বৈশালী;—বৈশালীর (২) উত্তর ভাগে মহাবন নামক বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধদেব এই বিহারে অবস্থিতি করিতেন। অম্বপালি নামক এক জন বারনারী বৈশালীতে বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন; তিনি আপনার নির্ব্বাণ-কাল আসন্ন জানিতে পারিয়া বৈশালী নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বৈশালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, ঐ স্থানে আমার পার্থিব জীবনের বিশেষ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন

---

(১) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাশিয়া নামক স্থানে কুশীনগর অবস্থিত ছিল।

(২) বৈশালী লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল। ইহারা খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়া হইতে হিমালয়ের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং মিথিলায় এক পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কানিংহাম বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী বেসাড় নামক স্থান প্রাচীন বৈশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশালী বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

করিয়াছিলা। লিচ্ছবিরা বুদ্ধদেবের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া বুদ্ধদেবের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রবল অনুরাগবশতঃ বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিতে থাকেন। বুদ্ধদেব হঠাৎ একটি নদীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দেন, এবং তাঁহাদের ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন। প্রাগুক্ত ঘটনা দুইটির সাক্ষিস্বরূপ তত্তৎস্থলে সুগঠিত স্তূপ বিদ্যমান। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির এক শত বৎসর পরে বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু বিনয়পিটকের নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কেহ তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিতেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারেই আমাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইতেছে। এই জন্য শত শত অর্হৎ ও ভিক্ষু বৈশালীতে সমবেত হইয়া বিনয়পিটকের সূত্র সকল নির্দ্ধারিত করেন।

পাটলিপুত্র ;—পাটলীপুত্র মহারাজ অশোকের রাজধানী ছিল। পাটলিপুত্র মগধের প্রধান নগর। অশোকের আদেশক্রমে অধিদেবতাগণ প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়া পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহার প্রাচীর, তোরণ, মর্ম্মরমূর্ত্তি, কিছুই মানবহস্তনির্ম্মিত নহে। অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মহারাজ অশোকের স্তূপের পার্শ্বেই মহাযান সম্প্রদায়ের একটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; এই সঙ্ঘারাম সুদৃশ্য ও মনোরম। পাটলিপুত্রে হীনযান সম্প্রদায়ের বিহারও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুই বিহারে ছয় সাত শত শ্রমণ বাস করেন; তাঁহাদের আচার ব্যবহার শীলতাপূর্ণ ও সুব্যবস্থিত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সৌগতগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন; জ্ঞানান্বেষী শ্রমণ ও ছাত্রগণ অত্রত্য বিহারে শিক্ষার্থীর বেশে উপনীত হন। মধ্যভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা মগধের নগরসমূহই বৃহৎ। জনসাধারণ ধনী ও উন্নতিশীল; তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বাদী। প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মঞ্জুশ্রী এই নগরের মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে বাস করিতেছেন; শ্রমণ ও ভিক্ষুমাত্রই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। প্রতিবৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবমূর্ত্তির অভিযান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নগরবাসীরা বংশদণ্ড দ্বারা চতুশ্চক্র পঞ্চতল

রথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত করে। তাহার পর তাহারা নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফটিক আভরণে ভূষিত করিয়া, রথের অভ্যন্তরে কারুকার্য্যখচিত চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং রথের চারি কোণে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উপবিষ্টভাবে স্থাপিত করে। অন্যূন বিশখানি রথ এই প্রণালীতে নির্ম্মিত ও নানা ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে। অভিযানের দিন বিপুল জনসমাগম হয়; শ্রমণ ও গৃহস্থ,—সকলেই উৎসবে যোগদান করে। নানা প্রকার ক্রীড়া ও সংগীত দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ অর্পণ করিবার নিয়ম আছে। ব্রহ্মচারিগণ নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য আগমন করেন। অতঃপর রথসমূহ একে একে নগরমধ্যে আনীত হয়। নগরবাসীরা সমস্ত রাত্রি স্ব স্ব গৃহ দীপমালায় উজ্জ্বল রাখে, এবং ক্রীড়া কৌতুক, গানবাদ্য ও ধর্ম্মকার্য্যে নিশিযাপন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও গৃহস্থগণ পাটলিপুত্র নগরের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এই সকল চিকিৎসালয়ে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোকসমূহ আশ্রয়লাভ করে। তাহারা এখানে বিনাব্যয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ সবিশেষ মনোযোগসহকারে তাহাদের ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া আবশ্যকমত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া আপনাদের সুবিধামত যথাস্থানে প্রস্থান করে।

রাজগৃহ;—রাজগৃহ দুই ভাগে বিভক্ত,—নূতন ও পুরাতন। মহারাজ অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বর্ত্তমান সময়ে দুইটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে পুরাতন রাজগৃহ। মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাঁচটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত পুরাতন রাজগৃহকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক কাহিনী পুরাতন রাজগৃহের সহিত সংস্পৃষ্ট। তৎসমুদয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপ এখানে বহু স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সমস্ত ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে; সমস্ত রাজগৃহ জনমানবশূন্য। রাজগৃহের আড়াই মাইল দূরে গৃধ্রকূট পর্ব্বত। তদুপরি বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন থাকিতেন।

গয়া ;—গয়ার অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত নগর লোকপরিত্যক্ত মরুস্থলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গয়া হইতে দক্ষিণ দিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। এই স্থানে বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর কাল সমাধিমগ্ন ছিলেন। ইহার এক মাইল দূরে (নৈরঞ্জন) নদীতটে তিনি (সুজাতা নাম্নী) রমণীর প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করেন। এই নদীতট হইতে কিঞ্চিদূন এক মাইল দূরে এক সুবিশাল বটবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ ঐ পায়সান্ন ভোজন করেন, এবং তাহার পর সমাধিস্থ হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। মধ্য-ভারতবর্ষের শীতোষ্ণতা এরূপ সমতাপন্ন যে, তত্রত্য বৃক্ষ প্রভৃতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। এই কারণে ঐ বোধিদ্রুম অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মঠনির্ম্মাণপূর্ব্বক বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল মঠ ও মূর্ত্তি এখনও পরিদৃষ্ট হয়। বোধিদ্রুমের নিকট তিনটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ; তথায় শ্রমণগণ বাস করেন। ইঁহারা বৌদ্ধসঙ্ঘ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেম, যে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ; এই মহাতীর্থ-চতুষ্টয়ের বৌদ্ধমন্দির প্রথমাবধি এক সঙ্গে জড়িত হইয়াছে।

বারাণসী ;—কাশীপ্রদেশ ও বারাণসী নগরী গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। বারাণসীর কিঞ্চিদধিক তিন মাইল দূরে মৃগদাব নামক উদ্যান। এই স্থানে বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। মৃগদাব উদ্যানে দুইটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে ; তথায় শ্রমণগণ বাস করিতেছেন। মৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সম্পর্কীয় তিনটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌশাম্বী ;—মৃগদাবের ত্রয়োদশ যোজন দূরে কৌশাম্বী নগরী। (১) এই স্থানে একটি প্রখ্যাত বিহার বিদ্যমান ছিল ; তথায় বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাহার ভগ্নস্তূপমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

চম্পা।—চম্পা একটি বৃহৎ রাজ্য ; (২) ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বুদ্ধদেব কিয়দ্দিবস এই রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

---

(১) কৌশাম্বী যমুনা নদীর তীরে, এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী।

(২) বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা লইয়া প্রাচীন চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল। ইহার রাজধানীর নামও চম্পা ছিল। বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরঘাটা প্রাচীন চম্পা নগরী।

তাম্রলিপ্তি।—তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই রাজ্যে চতুর্বিংশতি-সংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল।

তাম্রলিপ্তিতেই ফাহিয়ানের ভারতভ্রমণ শেষ হইয়াছিল। বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শন ও বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠ তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। ফাহিয়ান পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগৃহীত বিনয়পিটক গ্রন্থখানি এক সময়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে অধীত হইত। বিনয়পিটক ব্যতীত অন্যান্য বহু শাস্ত্র তিনি পাটলিপুত্র নগর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও তাহাদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। চিত্র-অঙ্কনের জন্য তিনি তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর বাস করেন।

অতঃপর ফাহিয়ান বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম-আস্যে অগ্রসর হইয়া শীতকালের অনুকূল বায়ুমুখে দুই সপ্তাহ দিবারাত্রি পোতপরিচালন-পূর্ব্বক সিংহল দ্বীপে উপনীত হন।

ফাহিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে সিংহল লোকশূন্য ছিল। কিন্তু বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে সিংহলে সুবৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর বৌদ্ধগণ আগমন করিয়া সিংহলবাসীদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিংহল প্রকৃতির রমণীয় লীলাস্থল, বৌদ্ধকীর্ত্তিপূর্ণ। কিন্তু ফাহিয়ান এখানে আসিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই ব্যাকুল অবস্থায় তিনি একদা একটি বৌদ্ধমন্দিরে একখানি চৈনিক পাখা দেখিয়া জন্মভূমির জন্য দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হয়।

যাহা হউক, ফাহিয়ান সিংহলে দুই বৎসর যাপন করিয়া ও বিনয়-পিটক প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, বাণিজ্যপোতে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে দুই শত আরোহী ছিল। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উঠে; প্রবল বাত্যায় জাহাজের এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বহু পণ্যদ্রব্য সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ফাহিয়ানও আপনার জলপাত্র প্রভৃতি ফেলিয়া দেন। বণিকগণ তাঁহার গ্রন্থ ও চিত্রসমূহ জলে ফেলিয়া দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। একাদশ দিবস পরে

ঝটিকা থামিয়া যায়, এবং যাত্রিগণ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পঁহুছিয়া জাহাজের ভগ্নস্থান সংস্কার করেন। অতঃপর তাঁহারা পুনর্ব্বার সমুদ্রপথে পোত-পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। এই সমুদ্র জলদস্যুপূর্ণ ছিল। তাহারা হঠাৎ জাহাজের উপর পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এই অকূল সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার কোনও উপায় ছিল না; কেবল চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয়পূর্ব্বক পোত পরিচালিত হইত। যাহা হউক, প্রকৃতি প্রশান্ত হইল; নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করিয়া প্রকৃত পথে পোত পরিচালন করিল; এবং ৯০ দিন পরে যবদ্বীপের বন্দরে উপস্থিত হইল। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ ও অপধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল।

ফাহিয়ান এই স্থানে পাঁচ মাস যাপন করিয়া অন্য একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে লোক-সংখ্যা দুই শত ছিল। তাহারা ৫০ দিনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিল। এক মাস কাল জাহাজ পরিচালনের পর প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। তখন কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন, "এই শ্রমণ (ফাহিয়ান) আমাদের সঙ্গী বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; ইহাকে কোনও দ্বীপে অবতরণ করিবার জন্য বাধ্য করি; এক জন মনুষ্যের জন্য সকলের মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে।" কিন্তু ফাহিয়ানের জনৈক হিতৈষী সবিশেষ সাহস-সহকারে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন;—ফাহিয়ান নির্জ্জন দ্বীপে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। শীঘ্রই ঝটিকা থামিয়া গেল, এবং ৮২ দিবস পরে বাণিজ্যপোত চীন দেশের উপকূলে উপনীত হইল।

আমরা বিস্তারিতরূপে ফাহিয়ানের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ বর্ণনা করিলাম। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যগত সমুদ্রপথের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা এই বিবরণ পাঠে উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে দুই শত বা তাহারও অধিক লোকপূর্ণ ভারতীয় বাণিজ্যপোত বিপৎসঙ্কুল সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত; এই সকল পোতের নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমাত্র সহায় করিয়া অসীম সাহসসহকারে সমুদ্রপথে অগ্রসর হইত; বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও চীনদেশে গমন করিতেন; যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই সকল বিবরণ-পাঠে আমাদের হৃদয়ে গৌরব বুদ্ধির উদয় স্বাভাবিক।

অনেকের নিকট "এই পুরাকাহিনী স্বপ্নকাহিনীর ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতিভাত" হইতে পারে।

নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফাহিয়ান স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই মহান্ ব্রতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে বুদ্ধভদ্র নামক এক জন ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চীন দেশে বাস করিতেন। তিনি ফাহিয়ানকে অনুবাদ কার্য্যে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চিরজীবন সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

কাশ্মীর-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি Modren Review নামক মাসিকপত্রে অধ্যাপক নেল্‌সন্ ফ্রেজার 'কাশ্মীর-ভ্রমণ' ইতিশীর্ষক এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আমরা সংক্ষেপে তাহার সারসঙ্কলন করিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই 'জমকালো' রকমের একটা কিছু আশা করিয়া পরে পাছে হতাশ হইয়া পড়ি, সেই জন্য কাশ্মীর-ভ্রমণের পূর্ব্বে কাশ্মীর সম্বন্ধে কখনও আমি বিশেষ কোনও ধারণা করি নাই। তাই একদিন বর্ষণমুখর তমোময় প্রভাতে 'বারমুলা'য় উপস্থিত হইয়া যখন কতিপয় পঙ্কিল জলা, শাখাহীন তরু ও চতুষ্পার্শ্বে বিষম কুয়াসা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখনও সহসা এই শ্যামশৈলশোভিত দেশটির প্রতি কোনও প্রকার অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। কিন্তু বারমুলা পরিত্যাগ করিবার কিছু ক্ষণ পরেই সমগ্র কাশ্মীর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, সুখের বিষয়, দেশটির স্নিগ্ধগম্ভীর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে তাহার সমর্থন করিয়াছিল, এবং যত দিন আমি এ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, ততদিন ইহার প্রতিকূল কোনও প্রমাণ পাওয়া দূরে থাকুক, প্রতিদিনই নব নব চিত্র দর্শনে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। সমুদায় দৃশ্যপটটি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—ইহার উপত্যকা, গিরিমালা ও রজতশুভ্র তুষাররাশি। উপত্যকাটি প্রকৃতই সুন্দর,—দূরপ্রসারিত, শ্যামল শষ্পাবৃত ও মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-তরুসমাচ্ছন্ন; কোথায়ও বা স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণী অলসভাবে বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও বা মনোহর আরণ্যকুসুম পুঞ্জীকৃত হইয়া বিজন প্রান্তরের সৌন্দর্য্যরাশি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তরুগুলির মধ্যে 'চেনার' নামক এক জাতীয় বৃক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। উন্নত 'বকম' বৃক্ষ ও

শ্রীনগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রায় আট ক্রোশ ধরিয়া যে 'পপলার' তরুবীথি দেখিয়াছিলাম তাহাও ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। অধিক কি, বিশাল ছায়া ও গাম্ভীর্য্যে চেনার বৃক্ষের সমকক্ষ বৃক্ষ জগতে আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। যথোচিত রস ও উত্তাপ পাইলে এক একটি তরু এমনই বিরাট আকার ধারণ করে যে, দশ জন লোকও তাহার কাণ্ডটি বেষ্টন করিয়া ধরিতে পারে না। ইহার পত্রবহুল মস্তক ভেদ করিয়া মধ্যাহ্নেও সূর্য্যরশ্মি বনভূমিতে পতিত হয় না। ইহার প্রশান্ত ছায়ায় বহুসংখ্যক সৈনিক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। বৃক্ষগুলি বহু পুরাতন; কথিত আছে, মহামোগল আকবর শাহের সময় এই সকল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল।

লোলাব উপত্যকা।

কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ তাদৃশ উন্নত নহে; কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে সেগুলি তুষারে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তবে স্থানে স্থানে যে উন্নত গিরি একেবারেই নাই, তাহাও নহে। লোলাব আরণ্য উপত্যকা; ইহার সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই নয়নানন্দকর। তুষারধবল মহাগিরি হিমাচলের অভ্রভেদী বিরাট বপু দূরে দিগন্তগাত্রে সমাসীন; চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলশ্রেণী ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। কোথাও বা সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দেখিতে পাইবে, কোথাও বা আকাশে মনোহর শ্যামল সমতল ভূমি চোখে পড়িবে। দূরে পর্ব্বতপ্রান্তে বিশাল দেবদারু তাহার উন্নত শীর্ষ শূন্যে উন্নত করিয়া গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান; যুগ যুগান্ত হইতে সেই স্তব্ধ বনানী মধ্যে মানবের কুঠারাঘাত পতিত হয় নাই; বিরাট তরুদল সেখানে আবহমান কাল ব্যাপিয়া ধ্বংস ও পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা বিশ্বে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সে দৃশ্য কি মহান্—কি মর্ম্মস্পর্শী। কাহার সাধ্য কি, তাহার বর্ণনা করে!

জোজিলা গিরিসঙ্কট।

কাশ্মীরের মনোহর গিরিসঙ্কটগুলির মধ্যে জোজিলা গিরিসঙ্কট উল্লেখযোগ্য। অমরনাথ কিংবা গুরুগুবুনু হ্রদ-দর্শন আমার অদৃষ্টে এ যাত্রা না ঘটিলেও, এই গিরিসঙ্কট দেখিবার জন্য এক দিন রাত্রি তিনটার সময় অগ্রসর হইলাম। তখন ইহা তুষারাবৃত ছিল। পর্ব্বতপ্রান্তস্থ পথটি তখন মুক্ত না থাকায় আমরা সোজাসুজি যাইতে লাগিলাম।

আমাদের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত পাহাড় উঠিয়াছে এবং নিম্নে আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী চলিয়াছে। বৃষ্টিপাতের একপ্রকার অবসান হইয়াছিল, এবং এত প্রত্যূষে পুঞ্জীভূত তুষারপাতেরও কোনও সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং আমরা একরূপ নিরাপদে ও নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ন-কালে সূর্য্যোত্তাপে যখন পর্ব্বতশিরে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, তখনই এইরূপ তুষারপাত হইয়া থাকে। সে সময় এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ সাতিশয় বিপজ্জনক। আমাদের সম্মুখভাগে একটি স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া পাঁচ জন হতভাগ্য কুলী জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিল; দেখিলাম, একটি বৃহৎ কাষ্ঠদণ্ড স্থানটিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, নির্ভয়ে চারি দিকের গম্ভীর শ্যামল শৈল-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ

করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে শ্বেত, নীল, পীত, নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ ফুল ফুটিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং স্রোতস্বিনীর উভয় তীর সুশোভিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বক্সশাদা ও কায়েজেট প্রভৃতি বিকশিত হইয়াছিল। কি মিত্রোদায় নীরব সৌন্দর্য্য! বাস্তবিকই কাশ্মীরের উপত্যকা অধিত্যকার সে বিজন শোভার তুলনা নাই! সে মনমোহন প্রাণারাম দৃশ্যের মধ্যে প্রকৃতির সে মুনিমনোমোহিনী শোভায় কি যে এক গূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা বলিতে পারি না। কাশ্মীরে যে সকল সুদৃশ্য স্থান আছে, তন্মধ্যে উপত্যকার দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্রবণগুলি বাস্তবিকই বিস্মৃত হইবার নহে। ইহাদের মধ্যে ভাবনায়োর নির্ঝরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ঝোলাম নদের উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিখ্যাত।

নির্ঝরটি এখনও সজীব রহিয়াছে সত্য; হয় ত চিরদিনই সে এইরূপ কলধ্বনি তুলিয়া আপনার সজীবতা ঘোষণা করিবে। কিন্তু হায়! সে বিলাস-বৈভবপুরী, সে বিচিত্র সৌধ আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রস্তরগুলি একে একে খসিয়া পড়িয়া ক্রমে অপহৃত হইয়াছে। কে আর সেগুলিকে রক্ষা করিয়া তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়া হতভাগ্য মোগলের কীর্ত্তি রক্ষা করিবে? হায়! ভারতের প্রাচীন গৌরবের সর্ব্বত্রই এক দশা। তোরণগুলির মধ্যে এক দল ব্রাহ্মণ একটিকে অধিকার করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে জাহাঙ্গীর শিহরিয়া উঠিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা অসহনীয় হইলেও, ব্রাহ্মণগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন বিশেষ উৎসাহের সহিত আপনাদের দেবপূজা নির্ব্বাহ করিতেছে।

'একবল' নামক স্থানে যে সকল নির্ঝর ও উদ্যান আছে, তাহার সংখ্যা আরও অধিক। এখানে জলধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসাকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া কৃত্রিম প্রণালীর মধ্যে পতিত হইতেছে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভ্রমণকারীর চক্ষে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব ছিল না। সেই বিশাল 'চেনার' তরুদল আপনাদের উন্নত-শির শূন্যে তুলিয়া গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান; কুঞ্জে কুঞ্জে সেই পুরাতন প্রসূনই বিকশিত; আর সেই পুরাতন বুল্‌বুল্‌ পক্ষীই উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে মাঝে মাঝে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিতেছে। যাহা হউক, তুষার-ধবল শৈলমালা, উন্নতশীর্ষ দেবদারু, কলপ্রবাহঝঙ্কারিত নির্ঝরিণী—প্রকৃতির এই বিশ্ববিমোহন মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এই পুরাতন উদ্যানে দাঁড়াইলে হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

'বলান' নামক স্থানের প্রস্রবণই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও স্বচ্ছ। যে স্থলে ইহার জল সঞ্চিত হইতেছে, সেখানে বহুসংখ্যক মৎস্য বিচরণ করিতেছে। এই সকল মৎস্য পবিত্র বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মৎস্য মহাশয়েরা প্রতিদিন প্রায় দুই মণ করিয়া চাউল উদরস্থ করিয়া থাকেন। দর্শকগণ উপস্থিত হইয়া জলোপরি 'চাপাটি' (মৎস্যের এক প্রকার খাদ্য) ফেলিয়া দিয়া থাকে। মৎস্যগণ তাহা লইয়া মহা কলহ করিতে আরম্ভ করে, এবং পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মাঝে মাঝে লম্ফ করিতে করিতে খাদ্য অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হয়। দৃশ্যটি বেশ আমোদজনক। বলানের একমাত্র চেনার বৃক্ষই এ অঞ্চলে সর্ব্বোন্নত।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে, দেশের মধ্যে তাহার সকলেরই কোনও কোনও লুপ্তপ্রায় চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির অধিকাংশ প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহারা কাশ্মীর ইতিহাসের প্রথম কাহিনীর সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি রামপুরের 'ঝেলম রোডে'র পার্শ্বে অবস্থিত, এবং মার্ত্তণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে 'ইসলামবাদ' হইতে অনায়াসেই উপস্থিত হওয়া যায়। সুতরাং এগুলি পরিদর্শন করিতে ভ্রমণকারীকে বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ভারতের এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ,— ভারতের ইতিহাসহীন যুগের নীরব কাহিনী সকলেরই দর্শনীয়। এই মন্দিরগুলি বহু পুরাতন; ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের গঠনপ্রণালীতেও বিশেষত্ব আছে। যে সকল ভ্রমণকারী বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ চালুক্য বা দ্রাবিড় জাতির স্থপতিশিল্প দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ইহা মনুষ্যরচিত বলিয়া বোধ হইবে না। ইহাদের বক্ররেখাঙ্কিত শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভগুলি দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকদিগের স্থপতিশিল্পের ক্ষীণস্মৃতি মনে উদিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা সর্ব্বাংশেই ভারতের নিজস্ব, একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মন্দিরগুলি বেশ সাদাসিদে ধরণের—তেমনতর কারুকার্য্য কোথাও নাই; তবে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই 'হিন্দু রকমের'। ইহাদের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে মন্দির অপেক্ষা অট্টালিকার অংশই অধিকতর সুস্পষ্ট।

মার্ত্তণ্ডের মন্দিরটিই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুর অন্য কোনও মন্দিরই আকৃতিতে ইহার সমকক্ষ নহে। ইহার চতুষ্পার্শ্বের সৌন্দর্য্য বড়ই তৃপ্তিকর। সম্মুখে দূরপ্রসারিত শ্যামল সমতল ক্ষেত্র, পশ্চাতে উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালা, আর উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলশ্রেণী। এই স্নিগ্ধ মধুর দৃশ্য মন্দিরের কঠোর গাম্ভীর্য্যের সহিত বাস্তবিকই সুন্দররূপে মিশিয়া গিয়াছে।

এখানকার অন্যান্য ধ্বংসাবশেষগুলিও এইরূপ। তবে আর কোনটি মার্ত্তণ্ডের মত 'গুরুগম্ভীর' নহে। 'ওয়াঙ্গাত্ত' ও 'পেকে'র মন্দিরগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা সকলেই কোনও না কোনও কারণে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হায় ধ্বংসের অনতিক্রম্য প্রভাবে সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আজ আর দেবদ্বেষী মুসলমান এই সকল মন্দির ভগ্ন করিবার জন্য আসে না সত্য, কিন্তু রৌদ্র বৃষ্টি তুষার নীহারে তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাই আজ এই পুরাতন কীর্ত্তিগুলি—কাশ্মীরের সেই পুরাতন উন্নতি ও সমৃদ্ধির অভ্রান্ত সাক্ষী—একে একে বিনষ্ট হইতেছে; তবে এত অযত্ন উপেক্ষায় আজিও যে এগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বর্ত্তমান কাশ্মীর।

কাশ্মীরের পল্লীগুলি খুব সুন্দর। পল্লীর বাহিরে তৃণাচ্ছন্ন সমাধিভূমি। একস্থ বা চেনারে পরিবেষ্টিত কোনও সাধু সন্ন্যাসীর [illegible]মন্দির। মধ্যে তরুচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামবাসী কৃষকগণ শান্তভাবে নির্দ্দোষ জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় পল্লীর

মত এগুলিও অতি সুন্দর, অতি শান্তিময়—প্রকৃতির একখানি বিচিত্র আলেখ্যের মত। পল্লীবাসীরা সকলেই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের পরিধানে বৃহৎ আস্তিনযুক্ত এক প্রকার ঢিলা পোষাক, অনেকটা 'আলখেল্লার'ই অনুরূপ বলিয়া বোধ হইল। শীত অধিক পড়িলে কাশ্মীরিগণ পরিচ্ছদের নিম্নে এক একটি 'কাংরা' লইয়া বহির্গত হয়। 'কাংরা' পদার্থের পরিচয় শুনিলে বোধ হয় অনেকেই বিস্মিত হইবেন। একটি হাঁড়িতে কিছু আগুন করিয়া একটা কাষ্ঠের পাত্রে বসাইলেই 'কাংরা' প্রস্তুত হইল। আমার বোধ হয়, ইহাতে তাহারা পাকস্থলীতে বেশ একটু আরাম অনুভব করে; নতুবা শীতকালে এই হিতৈষী বন্ধু কর্ত্তৃক হতভাগ্যদের উদরদেশ উত্তমরূপে দগ্ধ হইয়া গেলেও তাহারা উহার এত আদর করিবে কেন? "মজনুনের বক্ষে 'লয়লা' যেরূপ, 'কাংরা'ও কাশ্মীরবাসীর নিকট সেইরূপ আদরের"—প্রচলিত এই প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়, দেশবাসীরা ইহাকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকে। সে যাহা হউক, শীতের দিনে এইরূপ কাংরা-ধারী 'দামোদর' কোনও কাশ্মীরীকে দেখিলে বাস্তবিকই আমোদ হয়।

কাংরা ব্যতীত তুষার হইতে পদদ্বয় রক্ষা করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার তৃণনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পাদুকাগুলি শুষ্ক বিচালি বা খড়ে নির্ম্মিত; ইহাতে বিলক্ষণ নির্ম্মাণকৌশল আছে; মূল্যও অতি অল্প; পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরবাসী পুরুষ সাধারণতঃ উন্নত ও দীর্ঘকায়। মহিলাগণের আকৃতি সম্বন্ধে আমার কোনও মন্তব্য-প্রকাশ সঙ্গত নহে; কারণ, তাহাদের পশ্চাৎভাগের পরিচ্ছদ ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; আমাকে আসিতে দেখিলেই তাহারা দূরে পলাইয়া যাইত। তবে দুই এক জনের আকৃতি যাহা দেখিয়াছি, সত্য বলিতে কি, তাহা আমার চক্ষে আদৌ ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই; তাহারা অতিশয় অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, কাশ্মীরের স্ত্রীজাতি অতিশয় সুন্দরী বলিয়া লোকের ধারণা কেন? হয় ত শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে ধনিগৃহে কোনও সুন্দরী মহিলা থাকিতে পারেন, কিন্তু ভ্রমণকারীর পক্ষে তাহা অনুমান সাপেক্ষ।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশ্মীরেও পল্লীজীবন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোনও কোনও পল্লীর অবস্থা এত দূর শোচনীয় যে, দর্শন করিলে নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এক দিন জোজিলা গিরিসঙ্কটের নিকট 'বানটিস্তান' নামক একখানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সমবেত দেখিয়াছিলাম। সংসারে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য প্রাণী আর কখনও আমি দেখি নাই। অনাহারে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, চক্ষু কোটরগত; শরীর আনত; পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ধূলিময় মলিন বস্ত্র। হতভাগ্যগণকে দেখিয়া মনুষ্য বলিয়া চিনিবে, কাহার সাধ্য? দশ রতিমাত্র পয়সা হইলে তুষার হইতে চক্ষু রক্ষা করিবার উপায় হয়; কিন্তু হায়! ইহাদের তাহারও সম্বল নাই। সকলেই নেত্ররোগে কষ্ট পাইতেছে। এক প্রকার অপরিচ্ছন্ন অপুষ্টিকর খাদ্যে ইহারা আপনাদের উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। এই দরিদ্র অধিবাসিবৃন্দের সহিত 'বজলু' নামক অন্য একখানি গ্রামের কি বিষম পার্থক্য! উর্ব্বর

কর্ষণোপযোগিনী ভূমি, তৃণাচ্ছন্ন গো-চারণস্থান, প্রচুর মৎস্যপূর্ণ স্বচ্ছতোয় নদী ও দীর্ঘিকা, কিছুরই ইহাদের অভাব নাই। ইহাদের গোশালা গাভীমেষপূর্ণ; গৃহ ধনধান্যে সুশোভিত, এবং তরু পুষ্প ফলভারে অবনত। এখানে প্লাবনের উপদ্রব নাই; ভূমিকম্পের তেমনতর প্রভাব নাই, এবং বিসূচিকা রোগের বিশেষ কোনও প্রকোপ নাই। কিন্তু হায়! প্রকৃতির এত প্রাচুর্য্যের অধিকারী হইয়াও গ্রামবাসিগণ পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে; হতভাগ্যেরা একেবারে নিরক্ষর মূর্খ।

শ্রীনগর সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

কাশ্মীরের পল্লীগুলির অবস্থা স্থানভেদে এইরূপ। রাজধানী শ্রীনগরের অবস্থা এইবার একবার পরিদর্শন করা যাক্। শ্রীনগর 'ঝেলাম' নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত জনাকীর্ণ বৃহৎ সহর। লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্দ নহে। মধ্য দিয়া ঝেলম নদীটি কলগানের উচ্ছ্বাস তুলিয়া ধীর ও শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু সুপ্তোত্থিত সিংহের মত যখন জাগিয়া উঠে, তখন সমুদায় নগরটি প্লাবিত হইয়া যায়, গৃহ প্রভৃতি ভাসিয়া যায়, এবং বহুসংখ্যক নগরবাসী বিনষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীতে এরূপ ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে শ্রীনগরের প্রায় ১৮ ফিট্ জল উঠিয়াছিল। এখানে এরূপ ঘন ঘন বন্যা হইবার বিলক্ষণ কারণ আছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমুদায় কাশ্মীর উপত্যকাটি একটি সুবৃহৎ হ্রদে পরিণত ছিল; কালক্রমে জল সরিয়া গিয়া বর্ত্তমান ঝেলাম নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সংকীর্ণ ও অগভীর বলিয়া অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হইলে, কিংবা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে তুষার গলিলে, এই নদীতে সহজেই প্লাবন উপস্থিত হয়। এই বিপত্তির প্রতিবিধানকল্পে ইহাকে গভীর করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ব্যয় যথেষ্ট হইলেও, ইহা দ্বারা সমগ্র কাশ্মীর যে বন্যার উপদ্রব হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নগরের গৃহগুলি প্রায় ইষ্টক অথবা কাষ্ঠে নির্ম্মিত। অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠের ছাদগুলি মৃত্তিকায় আবৃত হয়; এই সকল জীর্ণ মৃত্তিকার আবরণের উপর পোস্তর গাছ ও দীর্ঘ তৃণ বর্দ্ধিত হইয়া গৃহের জীর্ণ ছাদগুলির এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছে। সহরের পথঘাট সেরূপ উৎকৃষ্ট নহে। অধিকাংশ রাজপথই সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র। প্রধানতঃ নদীর সাহায্যেই লোকে গমনাগমন করে। নদীবক্ষে ছয়টি প্রশস্ত সেতু দেখিলাম। শ্রীনগরের সুন্দর সৌধ অট্টালিকার মধ্যে মুসলমান মসজিদগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নদীতীরস্থ 'শাহ হামাদান' নামক মসজিদটি ইহার সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। ইহার এমনই সৌন্দর্য্য ও গঠননৈপুণ্য যে, একবার-মাত্র দেখিলেই উপলব্ধি হয়, মোগলগণ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এরূপ হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে। বাস্তবিক, কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও মুসলমানের যে বিলাস ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি আগরা নগরীকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাব এই অট্টালিকায় মন্দীভূত হয় নাই। 'জুম্মা' নামক আর একটি মসজিদেরও এই প্রকার সৌন্দর্য্য; ৩০ ফিট উচ্চ এক একটি দেবদারু-স্তম্ভ ইহার ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল অট্টালিকা এখন উপেক্ষিত ও ধ্বংসপ্রায়।

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের বিষয় যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি; সংক্ষেপে ইহার দুই একটি দোষের কথা বিবৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কাশ্মীর-চিত্রের অপরাংশ।

কাশ্মীরে ভীষণ শীত পড়িয়া থাকে; শীতের সঙ্গে তুষারপাতও অল্প হয় না। শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে সময় সময় এত তুষারপাত হয় যে, সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গৃহের বাহির হইবার উপায় থাকে না। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থান-সমূহের ত কথাই নাই, সে সকল স্থান কখনও কখনও মাসাধিককাল তুষারাচ্ছন্ন থাকে। ইহাতে দেশবাসীর, বিশেষতঃ দরিদ্র লোকগণের (কাশ্মীরে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই অধিক) যে কত দূর ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্লাবনের প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা কখনও কখনও সমুদায় নিম্নভূমি গ্রাস করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী গো মহিষ ভাসাইয়া লইয়া যায়। বিসূচিকা প্রভৃতি প্রাণনাশক ব্যাধি ইহাদের নিত্যসহচর। দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য ত ইতিহাসের প্রথম হইতেই কাশ্মীররাজ্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দেশের অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে খাদ্যাভাবে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া গোমাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সমুদায় কাশ্মীরের প্রায় অর্দ্ধাধিক লোক রোগ ও অনশনে জীবন দিয়াছিল। কিছু দিন হইতে ঝেলম নদীর পার্শ্ব দিয়া রাজপথ প্রস্তুত হওয়ায় খাদ্যাদির আমদানীর সুবিধা হইয়াছে; ভবিষ্যতে ইহা হইতে দুর্ভিক্ষের একটু উপশম হইবে, আশা আছে। কিন্তু এই রাজপথ প্রস্তুত হইবার পর হইতে কাশ্মীরের আর একটি বিপদের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে; বিসূচিকা সময় সময় ভীষণভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। 'ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলী-ভবন্তি'—সংসারের ইহাই নিয়ম।

এখন কাশ্মীরের অনেক বিষয়েরই উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। উলার হ্রদ হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। হয় তো ভবিষ্যতে কাশ্মীর অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইবে; হয় ত দেশবাসী শিক্ষিত ও সভ্য হইবে; অবিচ্ছিন্ন অরণ্যানী বিলুপ্ত হইবে; শৈলে শৈলে কন্দরে কন্দরে খনির অনুসন্ধানে মানুষ ছুটিবে। হয় ত এই কঙ্করময় উষরপ্রদেশে সুগম রাজপথ নির্ম্মিত হইবে; পাষাণগাত্র ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ও বাষ্পীয়যান একদিন হিমালয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইবে। হয় ত শ্রীনগর একদিন এসিয়ার লুসারন্ (Lucerne) নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, চিন্তাশীল ও প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্যপ্রিয় ভ্রমণকারীর চক্ষে ভবিষ্যতের কাশ্মীর বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে না, ইহা স্থির। এখনকার মত এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য থাকিবে না জানি, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে একটা পার্থক্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। বিলাস-স্রোত প্রবাহিত না থাকিলেও এই শৈলময় নির্ঝর-ঝঙ্কারিত ক্ষুদ্র দেশটির এই স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা, এই পরিপূর্ণ উদার শান্তি বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শিনী।

উপসংহার।

ধর্ম্ম কি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইতেছে ?

১৫ই এপ্রিল, ১লা ও ১৫ই মের "মার্কার ডি ফ্রান্সে" "আমরা ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিতেছি, কি বিনষ্ট করিতেছি ?' এই প্রশ্ন লইয়া ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি ধর্ম্মচিন্তা অর্থে ঈশ্বরচিন্তা ধরিয়া লওয়া যায়, এবং ঈশ্বর বলিলে কোনও অলৌকিক বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস, এইরূপ ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে ও হওয়াই উচিত।

ধর্ম্মই মনুষ্যকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র করিবার মূল। তাঁহার মতে, নাস্তিকতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত ঈশ্বরে অবিশ্বাস মন্দ নয় ; কারণ, তাহাতে একটা ভীষণ ভ্রম অপসারিত হইয়া যায়।

সিগফ্রেড ওয়াগনার বলেন, যে ধর্ম্মে র‍্যাফেল, দান্তে, ব্যাক্, রিচার্ড ওয়াগনার প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে ধর্ম্ম কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।

ডাক্তার ম্যাক্স নরড্ বলেন, ধর্ম্ম ও 'পাপ-স্বীকার', এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা দেখান নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, ধর্ম্ম মানবজাতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়, কিন্তু Confessionalism-এর সেরূপ ক্রমোন্নতি নাই।

চন্দ্রের জন্ম।

চন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর অংশ ছিল ; পরে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—এই মতটি বিগত জুন মাসের 'হারপারস্ ম্যাগাজিনে' অধ্যাপক পিকারিং পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর কোন অংশ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই নির্ণয়ে তিনি সচেষ্ট আছেন। তিনি আরও বলেন যে, চন্দ্রের জন্মের সময় যদি ধরিত্রীর স্তর কঠিন হইত, তাহা হইলে ইহার উৎপত্তিস্থানে সম্ভবতঃ একটী খাত থাকিয়া যাইত।

চন্দ্রের জন্মস্থান।

তাঁহার মতে, যে স্থানে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি রহিয়াছে, সেই স্থানেই চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তনের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান নিউজিলাণ্ডের নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাস্তর স্ফীত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে, নিউজিলাণ্ডের ঠিক বিপরীতদিকস্থ স্তর ফাটিয়া গিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই গভীর ফাটল দুই সহস্র মাইলের অধিক বিস্তৃতিলাভ করিবার পূর্ব্বেই কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির এতই প্রাবল্য হয় যে, সমস্ত পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ আয়তনের বর্ত্তুলাকার এক খণ্ড মৃত্তিকা উহার মধ্যস্থল হইতে স্খলিত হইয়া যায়, এবং চন্দ্ররূপে পরিণত হয়। এইরূপে প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে দুইটি মহাদেশ রহিয়া যায়।

কেন আমরা চন্দ্রের নিকট ঋণী ?

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাদেশ ও মহাসাগরের জন্য আমরা চন্দ্রের নিকট ঋণী। কিন্তু সমগ্র মনুষ্য জাতির নিমিত্ত এই উপগ্রহের নিকট আমরা আরও ঋণী। অধ্যাপক পিকারিং বলেন, যদি আদৌ চন্দ্রের উৎপত্তি না হইত, কিংবা যদি পৃথিবীর সমস্ত কঠিন ভাগ লইয়া

চন্দ্রের জন্ম হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের শুক্র গ্রহের ন্যায় পৃথিবীও জলমগ্ন থাকিত, এবং মৎস্যের যতটুকু বুদ্ধিশক্তি আছে, মনুষ্যকেও ততটুকু বুদ্ধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত! কিংবা চন্দ্রের আকার যদি উহার বর্ত্তমান আকার অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইত, তবে আমাদের মহাদেশগুলি আকৃতিতে সুবৃহৎ হইয়া যাইত, এবং ফলে আমাদের লোকসংখ্যা অনেকাংশে কমিয়া যাইত। আর যদি চন্দ্রের আকার উহার বর্ত্তমান আকার অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইত, তাহা হইলে স্থলভাগ কমিয়া যাওয়ায় লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কর্ম্মভোগ।

যন্ত্রণাময় সংসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সান্ত্বনা অনেক সময় রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মবাদ তাহার মধ্যে একটি। কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বদ্ধ জীবের মধ্যে মধ্যে তাহার পুনরালোচনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ মনে থাকে না। কথাটা এই। ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। অকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক। "রাম ঘুমাইতেছে"। এ স্থলে অকর্ম্মক ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। "রাম শ্যামকে প্রহার করিতেছে"। এ স্থলে ক্রিয়া সকর্ম্মক।

এক জনের অস্তিত্বই অকর্ম্মক ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দুই জন না থাকিলে সকর্ম্মক ক্রিয়া হয় না। অতএব ক্রিয়ার দুইরূপ; অদ্বৈত ও দ্বৈত।

শাস্ত্রমতে আত্মা অকর্ম্মা পুরুষ। যেমন উদীয়মান কবিগণ, কিংবা পত্রিকার সম্পাদকগণ। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও সাহিত্য-জগতের মনস্বিগণ প্রায়ই অকর্ম্মা। কবিতা লেখা, সমালোচনা করা, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া, ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া বিচার করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রভৃতি কর্ম্ম একাকীই হইতে পারে। অন্য লোক থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কবিতা কেহ না পাঠ করিলেও কবিগণ লিখিয়া থাকেন; ছাত্রগণ সুনিদ্রায় বশবর্ত্তী হইলেও অধ্যাপকগণ বকিয়া থাকেন; এবং উকীল, মোক্তার, সাক্ষী ও আসামী না থাকিলেও নির্ব্বিবাদে আসনে বসিয়া রায় লেখা চলে। অদ্বৈত অবস্থাই অকর্ম্মক ক্রিয়ার উপযোগী। কর্ত্তব্যের কল্পনাই অকর্ম্মক ক্রিয়ার মূল। কল্পনাকে

"ধ্যান" বলিলেও চলে। ধ্যান করিতে করিতে সমাধিগ্রস্ত হইলে ক্রিয়ার শেষ হয়। শাস্ত্রের কথায়, "ক্রীয়াশক্তি লীন হইয়া যায়।" ছোট কথায় লোকটা বেকার হইয়া পড়ে। বেকারের চরম অবস্থা সমাধিস্থ শিব। মধ্যম অবস্থা বিষ্ণু (ধারণা), এবং উত্তম অবস্থা ব্রহ্মা (ধ্যানস্থ)। ইহাই আত্মার সচ্চিদানন্দ অবস্থা।

অতএব শাস্ত্র বলেন, আত্মা (পুরুষ) কোনও কর্ম্ম করেন না। কিংবা করিয়াও করেন না। কারণ, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অকর্ম্মক ক্রিয়া। ইহা নিরীহ। ইহাতে কোনও দোষ নাই। ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যদি কেহ আপত্তি করিতে আসে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে একটা চড় মারিতে পারা যায়। তবে চড়টা কল্পনায় মারিতে হইবে, নচেৎ সকর্ম্মক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং সকর্ম্মক হইয়া গেলেই তাহা কর্ম্মভোগে পরিণত হয়।

শাস্ত্রের মতে স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রকে কল্পনায় চড় মারা যায়, গালি দেওয়া যায়, ভালবাসাও যায়। ইহাতে কোনও ফলাভিসন্ধি হইতে পারে না।

এইরূপ চিরকাল যদি আত্মার সদানন্দ ভাবের খেলা অন্তর্জগতে চলিত, তবে কোনও গোল থাকিত না। কিন্তু এবংবিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা থাকা না না থাকা সমান। এরূপ কর্ত্তা জরদ্গব, অসাড়, গুলিখোর। সুতরাং কর্ম্মের মহিমা সাব্যস্ত করিতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অবতারণা।

প্রকৃতির দাপট অসাধারণ। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন যে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন। তিনিই (অর্থাৎ প্রকৃতিই) কর্ত্তা। "আমি কর্ম্ম করি বটে", কিন্তু "প্রকৃতের্বশাৎ"। প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান যদি স্বয়ং এই কথা বলেন, তবে আমরা ছেলেপুলের ঘর লইয়া যাই কোথায়?

"প্রকৃতের্বশাৎ" অনেকটা 'গৃহিণীবশাৎএ'র' মত। যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে মহাশয় প্রবীণ পুরুষ, নচেৎ ন্যাড়াকান্ত। ভগবান্ অনেক দেখিয়া শুনিয়া গীতার নোটবহি লিখিয়াছিলেন, এবং নরলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহা ইঙ্গিতে সারিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে যদি এ কথা সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রচারিত হইত, তবে ভয়ানক কাণ্ড হইয়া যাইত।

কুরুক্ষেত্রের কর্ম্মবাদের সার সত্য এই যে, যুদ্ধ করিবে। কাহার সহিত, তাহা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লউন। কিন্তু ফলের দিকে দৃষ্টি যেন না থাকে। সেটা কি, তাহা ক্রমশঃ জ্ঞাতব্য।

সংসার-কুরুক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় কলরব, দ্বন্দ্ব, ও আস্ফালন অপরিহার্য্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে ঘোর চীৎকার করিয়া সংসার-প্রাঙ্গনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিই ইহার কারণ। প্রকৃতিই কর্ম্মের মূল।

বিশ্বব্যাপ্ত আত্মকল্পনা প্রকৃতির গুণবিভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া অন্দর মহলের সৃষ্টি। দেহ একটা অন্দরমহল। কল্পনা তাহার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

পশু পক্ষী ইতর জাতির কল্পনা নাই। তাহারা কবিতা লিখিতে পারে না। চিত্র টানিতে পারে না। সমালোচনা করিতে পারে না। হস্তীর শুণ্ড আছে। কল্পনা থাকিলে, বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া বালুকার উপর অন্ততঃ সরল রেখা অঙ্কিত করিতে পারিত। কিন্তু তাহা কখনও শুনা যায় নাই। তাহারা সহজাত-সংস্কার-বদ্ধ হইয়া সকর্ম্মক ক্রিয়া করে।

কিন্তু মানুষ সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয় ক্রিয়াই করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মভোগ ও ফলের দিকে দৃষ্টিপাত। মানুষ যদি কেবল সকর্ম্মক ক্রিয়া করিত, তবে কোনও দোষ থাকিত না। কোনও কথাই উঠিত না। কিন্তু অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত সকর্ম্মক যুক্ত হইয়া ঘোরতর কলরবের সূত্রপাত। ইহার কারণ, সকর্ম্মক ক্রিয়া ছাড়িয়া সকর্ম্মক কল্পনা।

শুনা গিয়াছে যে, কোনও আদিম যুগে অশ্বের স্কন্ধে মানুষের মস্তক সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্কেত এই যে, মানুষের মস্তক আত্মার পরিচায়ক। অশ্ব প্রকৃতির পরিচায়ক। মস্তক অকর্ম্মক; অশ্বরূপী দেহ সকর্ম্মক। । উভয়ে একত্র হইয়া "জীব"।

অর্থাৎ, অশ্বের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি মানুষের মস্তকে গেল। মস্তকে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। গোলাকার মুণ্ডমাত্র। যুক্তাবস্থার গুণে মুণ্ড অহঙ্কার হইল, মন হইল, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তবে মুণ্ডে কল্পনা ছিল। মুণ্ড পূর্ব্বে মুণ্ডের মধ্যেই কল্পনা করিত। দেহে সংযুক্ত হইয়া কথা কহিতে লাগিল। মুণ্ডের অন্দরমহল পদ নখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। পূর্ব্বে অশ্ব ঘাস খাইত। এখন মুণ্ড ঘাস খাইতে লাগিল।

মুণ্ড ঘোরতর বক্তৃতা আরম্ভ করিল। মুণ্ড স্বামী, দেহ স্ত্রী। মুণ্ডের সহিত দেহের সপ্তপদী বিবাহ। বরের সহিত কন্যার অন্তরে শুভদৃষ্টি! এবংবিধ প্রকারে মুক্তমুণ্ড বদ্ধমুণ্ড হইয়া গেল। মুণ্ড দেহের যন্ত্রবিধানে,

দেহের সুখের নিমিত্তে, দেহের পরিচর্য্যায় বদ্ধ-কল্পনা আরম্ভ করিল। কল্পনা অন্দর মহলে গেল। পূর্ব্বে কল্পনার কোনও কল ছিল না; এখন মুণ্ডের মধ্যে কল গজাইতে লাগিল। মুণ্ডের সুখ-কল্পনা অতঃপর দুঃখে পরিণত হইল। দেহের কষ্টে মুণ্ডের দুঃখ, দেহের সুখে মুণ্ডের সুখ।

মুণ্ড বুঝিতে পারিল যে, দেহের জন্যই তাহার এ দুর্দ্দশা। সে ভাবিতে লাগিল যে, এবংবিধ গৃহিণী না থাকাই শ্রেয়ঃ। তাহার বদ্ধ-কল্পনার পুত্র, কলত্র ও সংসার নিতান্ত জঞ্জালময়। মুণ্ড ঘোরতর বক্তৃতা আরম্ভ করিল। মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিল। কিন্তু বিশেষ কোনও উপায় না দেখিয়া চাঁটি মারিতে আরম্ভ করিল। দেহ ব্যথা পাইয়া হ্রেষা-রব ছাড়িয়া দিল। মুণ্ড কাতর হইয়া পড়িল।

এইরূপ বিষণ্ণ বদ্ধমুণ্ডের পরিত্রাণার্থ ও সাধুদিগের হিতার্থ গীতার টীকা প্রশস্ত। মুণ্ডের বিষাদ হইতে গীতার আরম্ভ। সাংখ্যযোগে দেখান হইয়াছে যে, এবংবিধ মুণ্ড-জীব বহু। তাহারা পরস্পরের বক্তৃতা শুনিয়া থাকে, এবং পরস্পরকে ধরিয়া খায়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। ফলে বহু দেহের উৎপত্তি, এবং বহু মুণ্ডের আবির্ভাব। দেহের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেহ বীজ-ক্রমে প্রসারিত হইতেছে। মুণ্ড অলক্ষ্যে থাকে। দেহ ব্যবহারিক রূপে জন্মে ও মরে। মুণ্ড কল্পনা লইয়া চিরকাল অমর। কল্পনায় বদ্ধ-ভাব থাকিলেও সে অমর, মুণ্ড হইলেও অমর। তবে বদ্ধ-ভাব থাকিলে মুণ্ড সুখ-অন্বেষণার্থ জলৌকার ন্যায় এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যায়। নিজ দেহের জীবদ্দশায় যদি মুণ্ড লম্ফ দিয়া অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারিত, তবে অবিলম্বে ধনধান্যপূর্ণ স্থানে রাজা প্রভৃতির ঘাড়ে গিয়া চাপিত। কিন্তু ইহাতে বিষম বাধা আছে। জীবদ্দশায় দেহ মুণ্ডকে ছাড়ে না। গৃহিণী কর্ত্তাকে ছাড়ে না। কর্ত্তা পুনর্জ্জন্মের চেষ্টা করেন। কিন্তু পুনর্জ্জন্মেও আবার সেই গৃহিণী।

আবার সেই? কি জঞ্জাল! আমি ত চাহি নাই। গৃহিণী বলেন, "আমিও তোমাকে চাহি নাই, তুমি নিজেই ডাকিয়াছিলে!" কর্ত্তার স্মরণ না হইতে পারে, কিন্তু আইনটা নাকি অতি দড়। যেমন কর্ত্তার কল্পনা, সেইরূপ তাঁহার-দেহ গৃহিণী। কল্পনা না হইলে কর্ম্ম হয় না।

এইরূপে পুনর্ব্বার হ্রেষারবের পুনরাবৃত্তি, এবং পুনর্ব্বার কর্ত্তার বক্তৃতা ও বিষাদ।

অতএব গীতা করুণস্বরে বলিয়া থাকেন যে, "হে জীব, কল্পনা তোমার, কর্ম্ম তোমার নয়। কল্পনা, বদ্ধ হইয়া গেলে, বৃক্ষ ও ফলের উৎপত্তি। তুমি অকর্ম্মক ক্রিয়া করিয়া যাও। ফললাভার্থ সকর্ম্মক কল্পনা করিও না। সকর্ম্মক কল্পনা করিলে গৃহবিবাদ ও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সে যুদ্ধ অপরিহার্য্য। খুনখারাপি জগতের নিয়ম। যুদ্ধ করিতে গেলেই খুনখারাপি হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধ করিতেই হইবে। যুদ্ধ নহিলে মুক্তি নাই।"

অর্থাৎ, পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপে কল্পনা করেন, তাহাই তোমার করা উচিত। ইহা যজ্ঞবিশেষ।

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন, "তুমি জীব নহ।" তোমার ভাবমাত্র জীবভাব। ভাবে তুমি বদ্ধ, ভাবেই তুমি মুক্ত। যে কল্পনায় তুমি বদ্ধ হইতেছ, তাহা করিও না। যে কল্পনায় তুমি মুক্ত হইবে, তাহাই কর। দেহ—অশ্ব, মুণ্ড—কল্পনার দাস। মুণ্ডের যে দিকে দৃষ্টি, অশ্বের সেই দিকে গতি। পূর্ব্বে অশ্ব স্বভাবজ ভাবে, পিতামহের বিশ্বকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিত; এখনও যে চলিতেছে না, তাহা নয়; তবে পৌত্রের বদ্ধকল্পনার সহিত তাহার আর একটি সম্বন্ধ হইয়াছে। জীবভাবে কল্পনার অপব্যবহার হয়, এবং বিরক্ত হইয়া চাঁটি মারিলে সে নিজেরই পদাঘাত খাইয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা মানিতেন না; চক্রবর্ত্তীর নাস্তিক ভাব পিতামহের আস্তিক ভাবের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া কালক্রমে একটি জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই নিস্তারিণী দেবী। চক্রবর্ত্তীর খাস গৃহিণী।

চক্রবর্ত্তীর দুই গৃহিণী হইল। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দেহ আধিভৌতিক গৃহিণী। নিস্তারিণী দেবী আধিদৈবিক গৃহিণী।

আধিভৌতিক হিসাবে গৃহিণী "মেয়ে মানুষ"; চক্রবর্ত্তী "ব্যাটা ছেলে"। গৃহিণী যুবতী, চক্রবর্ত্তী যুবক। পূর্ব্বকালের বন্দোবস্তে চক্রবর্ত্তীর দেহ হইতেই চক্রবর্ত্তীর পুত্রের দেহ জন্মিতে পারিত, নূতন বন্দোবস্তে গৃহিণীর দেহই তাহার জন্য উপযোগী। বিজ্ঞান ইহার কৈফিয়ৎ দিতে পারেন।

কিন্তু কেবল আধিভৌতিক দেহের যুদ্ধ দেখিলে চলিবে না। ইহার মধ্যে

অন্যান্য কথা আছে। অন্তঃসংগ্রাম ও বহিঃসংগ্রাম—উভয়ের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যথা,—

জীব নং ১		জীব নং ২
চক্রবর্ত্তী মহাশয়		নিস্তারিণী দেবী
(১) চক্রবর্ত্তীর আত্মা	⟶	নিস্তারিণীর আত্মা (আধ্যাত্মিক)
(২) ঐ মুণ্ড	⟷	ঐ মুণ্ড (আধিদৈবিক)
(৩) চক্রবর্ত্তীর মুণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার দেহ	⤨	নিস্তারিণীর মুণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার দেহ (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ)
(৪) চক্রবর্ত্তীর দেহ	⟷	নিস্তারিণীর দেহ (আধিভৌতিক) (জীবনসংগ্রাম)

(১) আত্মার সহিত আত্মার কোনও সংগ্রাম নাই। অতএব, চক্রবর্ত্তীর সহিত নিস্তারিণী দেবীর প্রেম অনিবার্য্য। আত্মা আত্মার সখা। এক আত্মা বহু আত্মাকে জীবরূপে ধারণ করিয়া জগদ্ধাত্রী ভাব। ইহার নাম দৈবী প্রকৃতি। মাতৃরূপে, সখারূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, স্ত্রীরূপে একই মধুর ভাবের প্রসারতা।

(২) আত্মার ভাবে মুণ্ডের সহিত মুণ্ডের কোনও সংগ্রাম হওয়া উচিত নহে। মুক্ত মুণ্ড আধিদৈবিক। সকলেরই কল্পনার এক লক্ষ্য। মুণ্ড দেহের মধ্যে 'বদ্ধ' না হইলে, চক্রবর্ত্তী ও নিস্তারিণীর কল্পনায় কোনও ঘাত প্রতিঘাত হইতে পারে না। চক্রবর্ত্তীর অপত্যস্নেহ গৃহিণীর অপত্যস্নেহের পরিপোষক। চক্রবর্ত্তীর সংসারে আত্মোৎসর্গ ও কর্ত্তব্যপালনের স্পৃহা গৃহিণীর তথৈব ভাবের পরিপোষক। ইহারই মধ্যে সোনার সংসার।

(৩) কিন্তু যদি প্রত্যেক মুণ্ড স্বীয় দেহে বদ্ধ হইয়া যায়, এবং আত্মসুখ কল্পনা করে, তবেই অন্তঃসংগ্রামের উৎপাত। অবশ্য (৪) সংজ্ঞা অনুসারে জীবদেহের মধ্যে জীবনসংগ্রাম বহির্দ্দিকে আছে; তাহা কেবল বিজ্ঞানই দেখিয়া থাকে।

কিন্তু সেটা আত্মার নিকট কিছুই নহে। (১) ও (২) সংজ্ঞা অনুসারে বদ্ধ মুণ্ডগণ-তাহা সহিয়া যায়। পিতা পুত্রের জন্য দেহ উৎসর্গ করে। সমাজ সমাজের জন্য করে। দেশ দেশের জন্য করে। যেখানে যজ্ঞ, সেখানে বিবাদ নাই; যেখানে স্বার্থফলাকাঙ্ক্ষা, সেখানেই বিবাদ।

অতএব বদ্ধমুণ্ড, বদ্ধমুণ্ডের বিরুদ্ধে অন্তঃসংগ্রামে চিরন্তন বদ্ধপরিকর।

ঈশ্বর-ভাবের কল্পনার অপব্যবহার জীব সহিতে পারে না। চক্রবর্ত্তী যদি মনে করেন, "আমি গৃহিণীর কর্ত্তা"; গৃহিণী মনে করেন; আমি চক্রবর্ত্তীর কর্ত্তা। একটি অপরের প্রতিবিম্ব। চক্রবর্ত্তী বলেন, "আমার জন্য কর্ম্ম কর"; গৃহিণী বলেন, "আমার জন্য কর।" গৃহিণী "দাঁতে মিশি দিয়া অপরের বাড়ী গেলে চক্রবর্ত্তী চটেন; চক্রবর্ত্তী কেশের পারিপাট্য বিস্তার করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেলে গৃহিণী চটেন। চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মফলভোগে গৃহিণী খুসী; গৃহিণীর কর্ম্মফলভোগে চক্রবর্ত্তী খুসী।

গৃহিণীর মতে, চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মফল তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হইবে; চক্রবর্ত্তীর মতে, গৃহিণীর কর্ম্মফল তাঁহাতেই বর্ত্তিয়া যাওয়া উচিত। চক্রবর্ত্তীর কল্পনার বিরুদ্ধে গৃহিণীর যৌবন চলিয়া যায়; গৃহিণীর কল্পনার বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তীর কেশ পাকিতে থাকে। বদ্ধ-জীবের বিরুদ্ধে ঈশ্বর; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বদ্ধ-জীব। অথচ, উভয়ের হৃদয়েই করুণা থাকে, উভয়েই প্রেম সম্বন্ধে একাধারে, এক বৃন্তে বর্ত্তমান। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়া উভয়েই কাঁদে; কাঁদিলে উভয়ে উভয়কে সান্ত্বনা করে।

বৃদ্ধা কাঁদিলে বৃদ্ধ চকিতভাবে অশ্রুজল মুছায়। উভয়েই তখন মুক্ত। তখন তাহারা চিরকুমার!

এ স্থলে ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলেও অকর্ম্মক, এবং অকর্ম্মক হইলেও সকর্ম্মক। "চক্রবর্ত্তী চক্ষের জল মুছায়।" এ স্থলে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। বৃদ্ধার চক্ষুর্জলে স্বীয় চক্ষের জলের ভাব আসিতেছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়েই কাঁদিয়া আকুল। ইহারই নাম কর্ম্মভোগ।

এইরূপে বৃদ্ধ ঈশ্বরের সহিত তাঁহার বৃদ্ধা প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ। দ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব অশ্রুকণা। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, সবই বিড়ম্বনা; অতএব চক্ষু মুদিয়া মুণ্ড উড়াইয়া দাও।—ইতি।—